মুতাকাল্লিমে ইসলাম আল্লামা ইলিয়াস ঘুম্মান

ইবাদুর রহমান

অনূদিত

লেখকের জীবনী

মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিযাহুল্লাহ ১২-০৪-১৯৫৯ সালে ৮৭ দক্ষিণ সারগোধায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য বয়সে তিনি ভুড়ওয়ালী জামে মসজিদে হিফজুল কুরআন সম্পন্ন করেন।

শিক্ষাজীবন

প্রথমে তিনি জামিয়া বিন্নুরী টাউনে পড়াশোনা করেন। তারপর জামিয়া ইসলামীয়া ইমদাদীয়া ফয়যাবাদ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা জীবন সমাপ্তি করেন।

তরজমা-তাফসীর

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম হযরত মাওলানা সারফরায খান সাফদার হাফিযাহুল্লাহ এর সান্নিদ্ধে নুসরাতুল উলূম মাদ্‌রাসায় কুরআনুল কারীমের তরজমা এবং তাফসীর পাঠ সমাপ্ত করেন।

শিক্ষকতা

আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র শায়েখ যাকারীয়া ইনস্টিটিউটসহ সারগোধার মারকাজে ইসলাহুন নিসা মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি প্রতিবছর ৪০ দিন ব্যাপী একটি "সীরাতে মুস্তাক্বীম" কোর্সের আয়োজন করতেন।

জিহাদী কার্যক্রম

খোস্ত, গারদীয, জালালাবাদ, কাবুল ও বামিয়ানসহ বিভিন্ন রনাঙ্গনে তিনি বীরত্ব এবং বাহাদুরীর স্বাক্ষর রেখেছেন।

বন্দি জীবন

১৯৯৬ সালের ৫ই আগস্ট থেকে ১৯৯৮ সালের ৫ই আগস্ট পর্যন্ত মোট দুই বছর তিনি সারগোধা, ফয়যাবাদ এবং মিয়ানওয়ালীর বিভিন্ন জেলে কারা বন্দি ছিলেন। তারপর ১৯৯৯ সালের ২৯ সে আগস্ট থেকে ২৯ সে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক মাস তিনি চুহাঙ্গ জেলে বন্দি থাকেন। তারপর আবার ৩০ সেপ্টেম্বর

বাকী অংশ অপর ফ্ল্যাপে দ্রষ্টব্য

আপনার প্রশ্ন আমার জবাব
তর্ক করে কি লাভ?

আপনার প্রশ্ন আমার জবাব

তর্ক করে কি লাভ?

পুণ্যের সন্ধানে

মূলঃ

মুতাকাল্লিমে ইসলাম আল্লামা ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিযাহুল্লাহ

খলীফা আরেফ বিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব রহ.

ইবাদুর রহমান

অনূদিত

সম্পাদনা

আহমদ সারফরায

আপনার প্রশ্ন আমার জবাব
তর্ক করে কি লাভ?

وما علينا إلا البلاغ

وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سئل عن علم فكتمه ، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ، ومن قال في القرآن بغير علم ، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار.
قلت : رواته ثقات محتج بهم في الصحيح ، روى الطبراني في الكبير والأوسط منه الشطر الأول فقط.

হাদিয়াঃ ৩২০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

আজ সারা পৃথিবীতে চলছে কাফের ও তার মিত্রদের আস্ফালন। চলছে মুসলিম হত্যার মহাউৎসব। তাগুত ও মুরতাদ বাহিনীরা আজ সম্বলিত জোট গঠন করেছে মুসলিমদের নিরস্ত্র করতে! পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুসলিম জাতিসত্তাকে মুছে ফেলতে! এ মিশন বাস্তবায়নের লক্ষে তারা নানারকম কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কাফেরদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে স্বীয় রক্তের শপথ করে একদল মুজাহিদ প্রতিরোধ অভিযানে জিহাদে অবতির্ণ হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানরা আজো গাফলতীর ঘুমের ঘোরে পড়ে আছে। তারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। জিহাদ শব্দ উচ্চারণ করাটা তাদের কাছে যেন অপরাধ। শুধু তাই নয়; বরং তারা রীতিমত জিহাদ এবং মুজাহিদদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জিহাদের অর্থ বিকৃত করছে। তারা এক ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে মুজাহিদ এবং জনসাধারনের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে বিভিন্ন ধরনের আপত্তি প্রকাশ করছে।

মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে আপত্তির কোন শেষ নেই। অভাব নেই আপত্তিকারীরও। লোকেরা সাহাবায়ে কেরামের উপর আপত্তি করেছে। এমনকি নবী-রাসূলদেরকেও ছাড়েনি। পরিশেষে আল্লাহ তা'য়ালার উপরও আপত্তির ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। জিহাদ ও মুজাহিদীনদের উপর আপত্তি তোলা নতুন কিছু নয়। বরং তা যুগযুগ ধরেই চলমান। আমি মনে করি, আপত্তির কোন অভাব নেই। আর সব আপত্তির উত্তর দিতে আমরা বাধ্যও নই। যারা ভাগ্যবান তাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার একটি বাণী এবং নবীজীর একটি হাদীসই যথেষ্ট। আর হতভাগাদের হাজার আপত্তির জবাব দিয়েও কোন লাভ নেই।

কাফের মুরতাদ এবং খেলাফত বিরুধী শক্তিরভ্রান্ত ও মিথ্যা ধূম্রজালের মুখোশ উন্মোচিত করে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়ার লক্ষে কলম হাতে নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান হাফিযাহুল্লাহ। বক্ষমান বইটিতে নিয়ে এসেছেন সেই সব বিভ্রান্তিকর সংশয়ের সমাধান। আশাকরি বইটিপাঠকদের জিহাদ বিষয়ক সকল প্রকার সংশয় সমাধানে সহায়ক হবে এবং অচেতন মানুষকে জাগ্রত করে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রমী সংগঠনে যোগ দানে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। আল্লাহ তা'য়ালাএর দ্বারা লিখক, পাঠক, সুভাকাংক্ষিএবংপ্রতিটি মুসলমানকে উপকৃত করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

بسم الله الرحمن الرحيم

হৃদয়ের আকুতি

আজ ২৬শে জুমাদাল উখরা ১৪২২হিজরী মোতাবেক ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০১ খৃষ্টাব্দ, রোজ শনিবার। সময় বিকাল ৩টা। রাউলপিণ্ডি শহরের আড়াইয়ালা জেলের 8 নাম্বার চৌকির তিন নাম্বার সেলে বসে বান্দা ইলিয়াস এক আরজু পেশ করছি। হে মুসলিম উম্মাহর কর্ণধারগণ! হে উলামা, খুতাবা, মুদাররিসীন, মুবাল্লিগীন ও মাশায়েখে কেরাম! আমি এক ব্যাথাতুর হৃদয় নিয়ে আপনাদের খিদমতে এক ফিকরী দাওয়াত পেশ করছি। আপনাদের সকল ব্যস্ততাই দ্বীন ইনশা আল্লাহ! এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি দ্বীনের বুলন্দি এবং দ্বীনদারদের জান, মাল, ইজ্জত ও ঈমানের সংরক্ষণ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশনাবলীর মর্যাদা রক্ষা ও ইসলামের বিধানাবলীর প্রচলন এবং খিলাফতে ইসলামিয়ার পূণর্জাগরণ ও স্থায়ীত্ব আপনারা চেয়ে থাকেন; তাহলে বর্তমান খিদমাতগুলোর পাশাপাশি নিজেদেরকে জিহাদের জন্যও পেশ করুন। অন্যথায় নিজেদেরও মিটে যেতে হবে এবং পুরো মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম নিশ্চিহ্ন হবার অপরাধ কাঁধে নিয়ে হাজির হতে হবে ঐ আদালতে যেখান থেকে ঘোষনা হচ্ছে-

"إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ" "নিশ্চই তোমার রবের পাকড়াও বড় কঠিন।"

অমূল্য বাণী

হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী দা.বা. বলেন, "আল্লাহ তা'য়ালা সকল মুসলমানকে বিশেষ করে উলামাগণকে জিহাদের বুঝ দান করুন! কারণ, জিহাদ-বিমুখতা এবং উদাসীনতার লাঞ্ছনা ও শাস্তি আলেমগণের উপরই আসবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন :

"وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ"

'নিশ্চয় তারা নিজেদের বোঝার সাথে অন্যদের বোঝাও বহন করবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে নিজেদের মনগড়া কথাসমূহের ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[সূরা আনকাবুত :১৩]
[জাওয়াহেরে রশীদিয়া খ:১ পৃ:১৭]

একটি স্বপ্ন

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপর আমেরিকা হামলা করার প্রায় এক বছর পূর্বের কথা। আমি তখন ভাওয়ালপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি। একটি স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলাম, আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের ইমাম শাইখুল হাদীস ওয়াত তাফসীর মাওলানা মুহাম্মদ সারফরায খান সাফদার দা.বা. এর কাছে। হযরত ব্যাখ্যা দিলেন। কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে ও হযরতের নির্দেশে মুসলিম উম্মাহর প্রতি মহা সুসংবাদ হিসাবে ব্যাখ্যাটি এখানে পেশ করছি।

উস্তাদে মোহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সারফরায খান সাফদার সাহেব দা.বা. আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আপনার পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী সুস্থতা কামনা করছি এবং আমাদের মত অযোগ্যরা আপনার মহান সত্তা থেকে বরাবর উপকৃত হবার তাওফকী চাচ্ছি।

হযরত ! আমি ভাওয়ালপুর জেলে থাকা অবস্থায় সামান্য বিরতি দিয়ে পরপর দুটি স্বপ্ন দেখলাম। হযরতের কাছে উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার আবেদন জানাচ্ছি।

এক.

আমি দিনের বেলা দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখলাম। অত:পর গ্রেনেড দ্বারা তার উপর আক্রমণ করলাম। কিন্তু আমার গ্রেনেড হামলা থেকে সে বেঁচে গেল। আর আমার নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডটি যমীনের একটি গর্তে ঢুকে গিয়ে মহিষের জন্য খুঁটা গাড়ার স্থান তৈরী করে দিয়েছে।

দুই.

পরবর্তিতে দেখলাম,হযরত ওমর রা. সামনে বেড়ে গ্রেনেডটি বের করতে লাগলেন কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবার রা. তাঁকে এ থেকে বিরত রাখলেন। এবং একটি ফ্লাশের মাধ্যমে গ্রেনেডটি বের করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে আমি তাৎক্ষণিক মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। গ্রেনেডটি বের করতেই তা বিস্ফোরিত হলো। আমার মনে হলো, এর আঘাতে আমি শাহাদাত বরণ করলাম।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ তা'য়ালাই প্রকৃত সমাধান দাতা। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি। সেখানে আমেরিকা দাজ্জালের ভূমিকায় রয়েছে। কিছু সংখ্যক মুজাহিদ শহীদ হবে। কিন্তু শেষ পরিণতিতে ইন্‌শাআল্লাহ তালেবানরাই বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বজ্ঞ।

আবু যাহেদ মুহাম্মদ সারফরায খান

শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর সুযোগ্য খলীফা শাইখুল মাশাইখ **আল্লামা আব্দুল হাফিয মক্কী**[হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أمابعد"

স্নেহাস্পদ মুহতারাম মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব তাঁর কিতাব"জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" এর পান্ডুলিপি অধমের কাছে পেশ করলেন। যাতে এই গুনাহগার নিজ অভিমত প্রকাশ করে। তাঁর এই কিতাবে আকাবিরে উলামা ও বহু মাশায়েখের অভিমত ছিলো। তাঁদের অভিমত থাকা অবস্থায় এই গুনাহগারের অভিমত নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তাঁর মুহাব্বত ও ভালোবাসা, অধিকন্তু অভিমত লিখাকে আপন সৌভাগ্য মনে করে বরকতের জন্য কয়েক লাইন লিখলাম।

"জিহাদ ও কিতাল" কুরআনুল কারীমের শত শত আয়াত ও হাদীসে নববীর সহস্রাধিক ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। যার ভিত্তিতে পূর্বাপর সমস্ত উলামায়ে কেরাম এর অস্বীকারকারীকে কাফের ও ইসলামের গন্ডি থেকে বহির্ভূত ফতোয়া দিয়েছেন।

কাদিয়ানীরা কাফের হওয়ার কারণ সমূহের মাঝে একটি মৌলিক কারণ হলো, জিহাদ অস্বীকার। সকল আলেম এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ।

আবার অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় জিহাদের জন্যও রয়েছে কিছু শর্ত, কিছু আদব। যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি লক্ষ্য না রাখবে বাহ্যত তার জিহাদ আল্লাহর দরবারে মাকবুল হবে না।

কুফুরী ও তাগুতী শক্তি সর্বদাই জিহাদ বন্ধ বা জিহাদের দূর্নাম রটানোর জন্য সর্বদা প্রচেষ্টা করছে। উলামায়ে ইসলামও বিভিন্নভাবে সর্বদা এর মুকাবিলা করছেন। ইলমী দলীল-প্রমাণ দ্বারা জিহাদের বাস্তবতা ও উপকারিতা তুলে ধরছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মাওলানা ইলিয়াছ ঘুম্মানকে আপন শান মোতাবেক জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি অত্যন্ত হৃদয় আগ্রহী হয়ে ও প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর বাস্তবতা, প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারীতা তুলে ধরেছেন। নিজেদের এবং অন্যদের পক্ষ থেকে জিহাদ সংক্রান্ত যে সকল অভিযোগ ও সংশয় উত্থাপন করা হয় তার সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এই মহান প্রচেষ্টাকে স্বীয় অনুগ্রহে কবুল করুন। মুসলিম উম্মাহকে তাঁর এই কিতাব দ্বারা উপকৃত করুন। আমীন!

"وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيد رسله وخاتم أنبيائه ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلّم تسليما كثيرا كثيرا "–

রব্বে কারীমের রহমত প্রত্যাশী

আবদুল হাফিয মক্কী

শুক্রবার ৪শাবান, ১৪২৬হিজরী

আপনার প্রশ্ন আমার জবাব
তর্ক করে কি লাভ?

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যাহ পাকিস্তানের সম্মানিত মহা পরিচালক জামিয়া ফারুকিয়া করাচীর সুযোগ্য মুহতামিম হযরত মাওলানা সালীমুল্লাহ খান সাহেব[হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

জিহাদ প্রসঙ্গে উর্দূ ভাষায় অনেক কিতাব লেখা হয়েছে। প্রত্যেক লেখকের সামনেই একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যেগুলো তিনি সুস্পষ্ট করতে চান।

আলোচ্য কিতাবের মধ্যে মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব জিহাদ বিষয়ে উত্থাপিত নতুন পুরাতন অনেক আপত্তি ও সংশয়ের সমাধান পেশ করেছেন। তিনি কুরআন-সুন্নাহর ঐতিহাসিক প্রমাণাদীর আলোকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। তাঁর লিখনীর মাঝে এক ধরনের বিশেষত্ব ও আকর্ষণ রয়েছে যা কিতাবের শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে আগ্রহ বজায় রাখবে।

আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থণা, তিনি যেন এই কিতাবকে তার সৃষ্টির জন্য উপকারী ও মকবুল বানান। আমীন !!

সালীমুল্লাহ খান

০৬-০৬-১৪২৬ হিজরী

১৪-০৭-২০০৫ ইং

দারুল উলূম হক্কানিয়ার মুহতারাম শাইখুল হাদীস মুরশিদুল মুজাহিদীন হযরত মাওলানা ডা. শের আলী শাহ [হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

"الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد"

লাহোরের কতিপয় ফুযালার মাধ্যমে আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের পত্র পৌঁছেছে। এতে মাওলানা তার অনবদ্য সংকলন "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" এর উপর কিছু অভিমত লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েক দিন যাবৎ আমি বিছানায় শায়িত। কিছু পড়া ও লেখা কোনটাই সম্ভব নয়। কিন্তু হযরত মাওলানা আমাদের সাবেক আফগান জিহাদ ও জিহাদি কাফেলাসমূহের উজ্জল নক্ষত্র। যারা সাওর, বাড়ি, তোরগোর, খোস্ত ও গরদীজ ইত্যাদী এলাকার ভয়াবহ অভিযানসমূহে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আমার অন্তরপৃষ্ঠে আজো গেঁথে আছে সেই আলোকিত চেহারাগুলো। সেই পবিত্র গুণাবলির অধিকারী বীর-বাহাদুর নওজোয়ান আর বৃদ্ধদের স্মৃতিগুলো।

বিশেষ করে হরকাতুল জিহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ মুজাহিদের কথা আজও মনে পড়ে। যখন রাশিয়ান একঝাঁক যুদ্ধ বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করছিল তখন সে বৃদ্ধ বড় আনন্দ ও উদ্দীপনার সাথে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে যাচ্ছিল। আর বলছিল,দেখুন মাওলানা! আমাদের বাদ্য বাজানো শুরু হয়ে গেছে। তখন আমি একটি কবিতা আবৃতি করলাম-

আসছে স্মরণ আজকে আমার স্মৃতিময় সেদিন

সাওর প্রান্তে হরকত নীড় বেঁধেছিল যেদিন।

চার দিকে দেখ আত্মা জাগানিয়া ঈমানের পরিবেশ

সুরে সুরে আজ ইসলামীগীত গেয়ে যাই বড় বেশ।

কোথায় পাবো খোদা, বীর গাজীদের এ মানযার সু-মধুর

জীবন যাদের তাকওয়ায় ভরা চেহারায় ছিল পূর্ণ নূর।

মুহতারাম মুহাম্মদ ইলিয়াছ ঘুম্মান সাহেবের সাথে জিহাদী সম্পর্কের মাধ্যমে এই কিতাব অধ্যায়ন করার তাওফীক হয়। ফলে এ বিষয়ে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হয়েছে।

মুহতারাম মাওলানা ঘুম্মান সাহেব দা.বা. জেল জুলুমের সংকীর্ণ ও তমসাচ্ছন্ন এক পরিবেশে বসে আযীমুশ শান এই জিহাদী খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে ফক্বীহুল উম্মত আল্লামা সারাখসী রহ. এর ইতিহাস তাজা করে দিয়েছে। [দেখুন-আল-মাবসুত লিস সারাখসী খন্ড:১ পৃ:৫] আল্লামা সারাখসী রহ. অন্ধকার কুয়ার নির্যাতন ক্লীষ্ট পরিবেশের মাঝে "আল-মাবসুত" এর মত এক মহাগ্রন্থ সংকলন করেছেন। যা ৩০ খন্ডে সমাপ্ত। চাঁদনী রাতের আবছা আলোতে তাঁর শাগরেদরা মধ্যরাতে এসে কুয়ার আশপাশে জমা হত। আর আল্লামা সারাখসী রহ. গভীর কুয়ার মধ্য হতে তাদের দিয়ে লেখাতেন।

মাশাআল্লাহ! অধ:পতনের এ যুগেও এমন মহামানব পাওয়া যায়, যারা জেলখানার নির্যাতনক্লীষ্ট পরিবেশে বসেও "কলমী জিহাদ" আঞ্জাম দিয়ে যায়। জিহাদ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহ. এর যমানা হতে আজ পর্যন্ত হাজারের অধিক কিতাব লেখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের গৌরব মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের কিতাব এক বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী আন্দাযে লেখা হয়েছে, যা পাঠ করলে হৃদয় মনে এক ভিন্ন অনুভূতি ও তৃপ্তীময় আনন্দ উপলব্ধি হয়। যেমন কবি তার ভাষায় বলেছেন-

প্রতিটি ফুলেই রয়েছে ভিন্ন রুপ, ভিন্ন ঘ্রাণ।

বক্ষমাণ কিতাবটি এমন এক বিপদসংকুল অবস্থায় লেখা হয়েছে যখন চারদিকে চলছে শুধু অত্যাচার-নির্যাতন, হিংস্রতা আর বর্বরতা। কুফুরী ফেৎনা ও তাগুতী শক্তির ঘুটঘুটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমগ্র ইসলামী জগত। দিকে দিকে শুধু হতাশা আর হতাশা। ভালো ভালো নির্ভীক বক্তা যারা জিহাদের উদ্দমতা সৃষ্টিকারী বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের মুখ হতে "আল জিহাদ" "আল জিহাদ" "আল কিতাল" "আল কিতাল" এর শ্লোগান বের করে আনতেন; আজ তারাও "জিহাদ" শব্দ উচ্চারণ করতে ভয় পাচ্ছেন। কিছু কিছু ছাত্র তাদের উস্তাদগণের খেদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগের সুরে আরজ করে যে, হযরত! আমরা এমন কোন কবিরা গুণাহে লিপ্ত হয়ে গেলাম কিনা যে কারণে আগের মত আমরা আর

আপনাদের মোবারক সাক্ষাতে ধন্য হতে পারি না এবং আমাদের সাক্ষাতভীতি আপনাদের এতটাই গ্রাস করেছে যে, এক ধরণের "لا مساس"'তাদেরকে কাছে ঠাঁই দেয়া যাবে না।' এর ভূমিকা নিয়ে আপনারা চলতে থাকেন। এমন থমথমে পরিস্থিতিতে জিহাদ বিষয়ে হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের লেখনীর মত এমন একটি আত্মাজাগানিয়া কিতাবের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যা দ্বারা মৃত অন্তর ও আশাহত হৃদয়গুলোতে প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসবে এবং তাতে জিহাদের জযবা ও প্রেরণা উদ্বেলিত হবে।

দোয়া করি আল্লাহ তা'য়ালা এই আযীমুশ শান দ্বীনি, ইলমী ও জিহাদী খিদমতকে কবুল করুন। এই অমুল্য তোহফা দ্বারা বিশিষ্ট, সাধারণ সকলকে উপকৃত করুন।

আমীন-আমীন একবার নয় বল বার বার,

তৃপ্ত নহে আত্মা আমার যদি না হয় হাজার বার।

শের আলী শাহ
খাদিমুত ত্বলাবা দারুল উলূম
হক্কানিয়া
আকুড়া, খটক।
১৭ জুমাদাল উলা, ১৪২৬ হিঃ

রঈসুল মুনাযিরীন হযরত মাওলানা আবুদস সাত্তার সাহেব তিউনুসুয়ী[হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

মুহতারাম হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" এই বিষয়ে যে বিশ্লেষণধর্মী কিতাব লিখেছেন আমার ধারণায় তা একটি নযীরবিহীন কিতাব। আশা করি কিতাবটি পাঠকের জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মাওলানার মেহনত কবুল করুন। আমীন! ছুম্মা আমীন!

মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার

তিউনুসুয়ী

১৩ জুমাদাল উলা ১৪২৬ হিজরী

আপনার প্রশ্ন আমার জবাব
তর্ক করে কি লাভ?

হযরত মাওলানা মুফতী হামীদুল্লাহ জান সাহেব[হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

"نحمده ونصلي علي رسوله الكريم"

কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে শত শত আয়াত ও হাজার হাজার হাদীস এবং রাসূলে কারীম ﷺ এর দশ বৎসরের মাদানী জীবনে এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলির-প্রমাণ রয়েছে যা অস্বীকার করা প্রখর রোদ্রে দাঁড়িয়ে সূর্যকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং এটা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুফরের শক্তি বৃদ্ধি বৈ কিছু নয়। মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামে কিতাবটি এমন এক সময়ে রচনা করেছেন যখন একদিকে কুফুরি শক্তির বর্বরী তাণ্ডবের ফলে এ বিষয়ে কলম ধরাই মহাপাপ। অপরদিকে মুসলিম ঘরাণার কিছু লোক জ্ঞানগত ও রাজনৈতিক বিভিন্ন দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করে জিহাদের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। মাওলানা ঘুম্মান সাহেব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দুধারী কলমের তলোয়ার ব্যবহার করে উভয় পক্ষের উত্তম মোকাবেলা করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তার এই মেহনতকে কবুল করে উম্মতে মুসলিমার জন্য পথের দিশা বানিয়ে দিন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

হামিদুল্লাহ জান

খাদিমুল হাদীস ওয়াল ইফতা

জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর

৭/১২/২৫ হিজরী

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ জাঈ [হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام علي من لا نبي بعده"

এক. প্রথম শতাব্দী তথা নববী যুগ ও সাহাবা যুগের প্রতি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে এ বাস্তবতা দোদিপ্যমান হয় যে, পৃথিবীতে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে। আর সুপ্রতিষ্ঠ ও স্থির থেকেছে মসজিদ, মাদ্রাসা ও উলামাগণের মাধ্যমে।

দুই. যখন থেকে মুসলমানরা জিহাদ বিমুখ হয়েছে তখন থেকেই ইসলামের সম্প্রসারণ থেমে গিয়েছে। আর যে ভূখণ্ড থেকে মাদারিস, মাসাজিদ ও উলামাগণ হারিয়ে গেছেন, সেখান থেকে ধীরে ধীরে ইসলাম ও বিদায় নিয়েছে। স্পেনের ইতিহাস আজো আমাদের সামনে। এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা যেমনিভাবে ইসলামকে কিয়ামত অবধি শ্বাশত দ্বীন হিসাবে নির্ধারিণ করছেন তেমনিভাবে জিহাদকেও শ্বাশত বিধানরুপে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিন. জিহাদ হলো মুসলমানদের ইবাদত, মুয়ামালা, মুআশারাহ ও ইয্যত-আব্রু সহ সকল ধর্মীয় শি'য়ারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা। তাগুত ও কুফুরী বাহিনী এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিতে চায়। আল্লাহ না করুন যদি এ ব্যবস্থা ভেঙ্গেই যায় তাহলে মুসলমানরা তাদের মর্যাদার উপর আর টিকে থাকতে পারবেনা। এমনকি ইসলামের স্বচ্ছ পরিচয়টুকুও দুনিয়া থেকে মুছে যাবে।

চার. জিহাদ আর সন্ত্রাসের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। যারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে তারা হয়তো কাফের, না হয় মুনাফিক। প্রকৃত পক্ষে জিহাদ সকল বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের বিলুপ্তি ও অবসান ঘটায় এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে উঁচু মর্যাদায় পৌঁছায়। মুসলমানদের ১৪শ' বছরের ইতিহাস এর জলন্ত সাক্ষী।

পাঁচ. কুরআন অবতীর্ণের সময় কালে যারা জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে রেখেছে বা জিহাদ প্রসঙ্গে দ্বিধা সংকোচ ও আপত্তি তুলেছে মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রাসূলের যবানে মুনাফিক আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃত মুমিন আর ভেজাল মুমিন নিরূপণের কষ্টিপাথর হলো জিহাদ।

ছয়. কুরআন-হাদীস ও মুসলমানদের ইতিহাসের মাধ্যমে জিহাদ আমাদের সামনে দ্বিপ্রহরের ন্যায় ভাস্বর। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যেহেতু জিহাদ মানে জীবনের বাজী লাগানো। বিপদসংকুল কন্টকাকীর্ণ পথে নিজেকে সপে দেয়া। এ কারণে হীনমন্য আর কাপুরুষের দল সর্বদা জিহাদ থেকে পালানোর চেষ্টা করে থাকে। আর "নিজে বদলে কোরআন বদলাও" এ মূলনীতির আলোকে জিহাদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। **যদি তাদের দিলে জিহাদের সামান্য জযবাও থাকত তাহলে তারা সংশয় সৃষ্টির পরিবর্তে সৃষ্ট সংশয়ের জবাব খুঁজতো।** কিন্তু এমনটা তাদের থেকে কখনোই হয়নি। এ কারণে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল কোন এক মর্দে মুমিন এই ময়দানে আসবে এবং 'লাওমাতা লাইম' এর আশংকা ঝেড়ে ফেলে এই মহান ফরয বিধানকে সংশয় সৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করবে। আলহামদুলিল্লাহ! এই মহান খেদমতের তাজ আল্লাহ তা'য়ালা মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মানের মাথায় পরিয়েছেন। যিনি এই ময়দানেরই শাহ্‌সওয়ার এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামে অত্যন্ত মূল্যবান একটি সংকলন উম্মতের সামনে পেশ করেছেন। মাশাআল্লাহ! সুস্পষ্ট এবং সাবলীল ভাষায় দলীল ভিত্তিক আলোচনার দ্বারা তিনি এ বিষয়ের হক আদায় করেছেন। আল্লাহ তাঁর এই কারনামাকে কবুল করুন এবং আখেরাতে নাজাতের উসীলা বানান। আমীন!

ফজল মুহাম্মদ বিন নূর মুহাম্মদ ইউসুফ জাঈ
উস্তাদ, জামিয়াতুল ইসলামীয়া
বিননূরী টাউন, করাচী,
পাকিস্তান।
৯-১০-১৪২৫ হিজরী

মুফতী আবু লুবাবাহ শাহ মানছুর দা.বা. এর অভিমত।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্টা করা মুসলমানদের একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ এর কাফন দাফনের উপর অগ্রগণ্য করেছেন। অতীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা একমাত্র জিহাদের মাধ্যমেই হয়েছে। আর ভবিষ্যতেও জিহাদের মাধ্যমেই হবে। সৌভাগ্যবান মুজাহিদ বাহিনীই হযরত ঈসা ও মাহদী আ. এর সাথে মিলিত হয়ে কুফুরী শক্তিকে পরাস্ত করবে এবং একচ্ছত্র ইসলামী খিলাফত কায়েম করবে। এ কারণে কেউ মানুক বা না মানুক জিহাদই হলো নির্যাতিতদের নিরাপত্তা ও অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ের একমাত্র মাধ্যম। কুরআন-সুন্নাহ, আকল-নকল এবং অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস এর সাক্ষী। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যখন থেকে মুসলমানদের ইতিহাসে অধঃপতনের ধ্বস নামল তখন থেকে ইসলামের নেতৃত্বদানকারী ব্যাক্তিবর্গ গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তির জন্য শাশ্বত জিহাদের পথ ছেড়ে বিভিন্ন কর্মপন্থা ও তন্ত্র-মন্ত্র অবলম্বন করতে লাগলেন। অপর দিকে মুসলিম উম্মাহর জ্ঞানীগুণীজন ইসলামী জিহাদকে কেন্দ্র করে এমন সব অভিযোগ-আপত্তি এবং ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে লাগলেন, যার ফলে জিহাদের গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তার কথা আর কি বলব? জিহাদের বৈধতাই এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে।

আফগান জিহাদের সৌভাগ্যবান বীর মুজাহিদগণ জিহাদের এ মৃতপ্রায় বৃক্ষটির গোড়ায় সঠিক সময়ে রক্ত সিঞ্চন করলেন। অত:পর তালেবানদের নজীরবিহীন কুরবানীর বরকতে যেই গাফলতীর পর্দা বিদীর্ণ হলো যা জাতিকে সঠিক বিষয় জানা থেকে আড়াল করে রেখেছিল। ফলে আপনারা সরলতার কারণে না বুঝে জিহাদের অপপ্রচার করে যাচ্ছিলেন। আর অন্যরা করে যাচ্ছিল তাদের ধূর্ততার কারণে। তখন প্রয়োজন ছিল আমলী কোরবানীর মাধ্যমে এ ময়দান পরিস্কার করা। কিন্তু এর সাথে সাথে এও প্রয়োজন ছিল যে, একটি ইলমী ও গবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে এই কাঁটাগুলো বের করা। এবং এই বিষাক্ত আগাছাগুলো পরিস্কার করা, যা মুজাহিদগণের রক্তে সিঞ্চিত এই পবিত্র বৃক্ষের আশপাশে জন্ম নিয়েছে।

বিশিষ্ট, সাধারণ সবাইকে এই কিতাবের প্রকাশক, পাঠক থেকে শুরু করে এর সাথে যৎসামান্যও সংশ্লিষ্ট সবার আনন্দ বোধ করা উচিৎ যে, আমাদের বন্ধুবর মুহাম্মদইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব এই "অতি প্রয়োজন" কাজটাকে অত্যন্ত সুন্দর রুপে আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর এ কর্মের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য দেখে মনের অজান্তে প্রশংসা বাণী বের হয়ে আসছে। অধম বান্দা একাধিক কারণে কোন কিতাবের উপর কিছু লেখা থেকে সর্বদাই দূরে থেকেছে। কিন্তু জনাব মাসউদ আযহার (হাফিযাহুল্লাহ) এরপর এটাই হলো ২য় কিতাব যার জন্য এই নীতি ভঙ্গ করতে

হয়েছে। প্রথম কিতাব ছিল খিলাফত সংক্রান্ত। লাহোরের এক নওজোয়ান আলেমের লেখা। এখন তার নাম স্মরণ নেই। আর বক্ষমান কিতাবটি তো আপনাদের হাতেই রয়েছে। উভয় কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য কাছাকাছি।
প্রথমত এই বিষয়বস্তুটি এমন যে এর স্বপক্ষে কিছু লেখা থেকে বিরত থাকা "فرار من الزحف" "জিহাদ থেকে পলায়ন" এর মত মনে হয়। **দ্বিতীয়ত** লেখকের অজস্র কুরবানী ও এই মিশনের সাথে আন্তরিক সম্পৃক্ততা এবং জিহাদ ও তাসাউফ এর যৌথ মেহনত, রিয়ামুক্ত বিনয় ও নম্রতা, সুউচ্চ আখলাক ও অনন্য ব্যক্তিত্ব দু'এক কলম লেখা থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিচ্ছিল না। তৃতীয়ত অধম নিজে যখন কিতাবখানা দেখলো তখন এক বিস্ময়কর আনন্দ দিল ও দেমাগে ছেয়ে গেলো। ফলে নিজের অনিচ্ছায়ই যেন কিছু লিখে দিতে বাধ্য হলোাম। পৃথিবীতে হাজারো কিতাব লেখা হয়েছে, তবে ঘুম্মান সাহেব এ কিতাব লিখে আমাদের সমাজে অবহেলিত একটি অতি জরুরী দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। যুগের বড় একটি চাহিদা পূরণ করেছেন। সাথে সাথে তার আলোচনার ভাবভঙ্গি ছিল পূর্ণ। সাহিত্যের মানদণ্ডে পূর্ণ অধিষ্ঠিত। শুধু কি তাই? তিনি তার এ লিখনীতে প্রতিটি আপত্তির জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে বিতর্কের পন্থা অবলম্বন করার পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন একজন দরদী কল্যাণকামী দায়ীর পন্থা। কোথাও কোথাও একটু "খোঁচা" অবশ্য আছে। তবে তাও এতটা কোমল ভাবে যে, প্রতিপক্ষের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্তে ভালবাসা সৃষ্টি হবে। শঠতা দূর হয়ে দেমাগের বাধন খুলবে; ইনশাআল্লাহ! "বর্শার আঘাতের মাঝেও কোমল ছোঁয়া" এ গুণটি সেই রূহানী নিসবতেরই ফসল যা সম্মানিত লেখক আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে অর্জন করেছেন। কিতাবের শুরুতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে তার প্রকৃত অর্থে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা এবং শুরুতে "দুআ" নামক কবিতা উভয়টাই বড় আকর্ষণীয়।
আমাদের আকাবিরগণের যে সকল খিদমাত 'বন্দী জীবনে' সম্পাদিত হয়েছে বাস্তবতায় দেখা গেছে তার সবগুলোই বড় মাকবুল হয়েছে। জেলখানার ব্যারাকসমূহ যেখানে ইলমী কোন উপকরণ নেই, চারদিকে শুধু অস্থিরতার জঞ্জালে ভরা সেখানে বসে এমন একটি জটিল ও অস্পৃশ্য বিষয়ের এত সুন্দর ও সফল সংকলন তৈরী করা শুধুই ইখলাস, কোরবানী আর মিশনের সাথে আন্তরিক সম্পৃক্ততারই বরকত। আল্লাহ তা'য়ালা লেখকের ন্যায় সকল পাঠককে এই বরকতের অংশীদার বানান। এই কিতাবকে তাহরীকে জিহাদ ও ইহ্য়ায়ে খিলাফত এর প্রচেষ্টা সমূহের মোবারক ও মাকবুল অংশ বানান যা গাযওয়ায়ে ফিলিস্তিনের জন্য মুজাহিদ তৈরীর কাজ আঞ্জাম দিবে।

আসসালাম
আবু লুবাবাহ শাহ মানছুর
২১ শাওয়াল, ১৪২৫হিজরী

শাইখুল কুরআন উস্তাজুল উলামা মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী [হাফিযাহুল্লাহ] এর অভিমত।

বেরাদার মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মানকে আল্লাহ তা'য়ালা বহু গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছেন। তিনি একদিকে যেমন যোগ্য আলেম তেমনি যোগ্য মুদাররিস। তেজস্বীবক্তা, আবেগ উত্তালকারী কবি। যোগ্য সমাজসেবক। ওফাদার দোস্ত এবং আনুগত্য প্রবণ শাগরেদ। এ ছাড়াও তিনি এমন মুজাহিদ যিনি ময়দানে জান-মাল, শরীর-মন সব কিছুর বাজী লাগাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না। আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব রহ. এর ইজাযত প্রাপ্ত খলীফা। প্রাণহীন কাগজ-কলমেও বক্তৃতার প্রাণ সঞ্চার করার যোগ্যতা তার অতুলনীয়। কিন্তু সবচে বড় ও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তিনি তার সিনায় লালন করেন একটি দিলে দরদমান্দ ব্যাথাতুর হৃদয়।

দরদে দিল এমন একটি মহান দৌলত যা থেকে এই উম্মত আজ বঞ্চিত। ধন-দৌলতের প্রাচুর্য, আসবাব-উপকরণের আধিক্য, রোড ভর্তি গাড়ী, সুউচ্চ ভবন, নিত্য নতুন সামগ্রী উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরী কোন কিছুতেই কমতি নেই। আর বাস্তবেও এ সকল বিষয়ের কমতি উম্মতের অধঃপতনের কারণ নয়। আসল কারণ হলো দরদে দিল না থাকা। অন্তরে দ্বীনের দরদ না থাকা।

শব্দের ফুলঝুড়ি দিয়ে মনোমুগ্ধকারী কবি, হাজার হাজার জনতার মাঝে জয়বার উত্তাল সৃষ্টি কারী বক্তা, ক্ষুরধার লিখনী দিয়ে অন্তর বিজয়কারী কলামিষ্ট আর ভিতর বাহিরে সাজুয্যহীন বড় বড় মুসলিম নেতা বেশুমার একজন খুঁজতে গেলে হাজারও পাওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই বিপুল সংখ্যক নামধারী 'মহান' ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে চায়ের কাপ, রকমারী খাবার ভর্তি দস্তরখান, হোটেল, ক্লাব আর আড়ম্বরপূর্ণ অফিস ও হলোরুমগুলোতে বিপ্লব আসতে পারে কিন্তু এই উম্মতের মাঝে কোন বিপ্লব আসবে না। এই ইনকিলাবের জন্য প্রয়োজন এমন হিম্মত ওয়ালা জিম্মাদার যার দরদে দিল তাকে এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও জিহাদের মত একটি অস্পৃশ্য বিষয়ে কলম তুলতে উৎসাহিত করে।

এই মহান লিখনী কর্মের উপর অভিমত লেখার নির্দেশ এমন ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে যার অগ্নিবর্ষণকারী আকাশ আর গুলিবৃষ্টির পরিবেশে এক মুহূর্ত কাটানোরও তাওফীক হয়নি।

অধম অল্প সময়ে মোটামুটি ভাবে কিতাব খানা দেখেছি। আশা করি এই কিতাব শুধু মুজাহিদ নয় বরং তার আশপাশের লোকেরাও পড়বে। বার বার পড়বে। যাতে দ্বিধা সংশয় দূর হয়ে যায় এবং জিহাদের ব্যাপারে বক্ষ উন্মোচিত হয়।

মুহতাজে দোয়া

মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী

জামেয়া ফারুকীয়া করাচীর উস্তাযুল হাদীস এবং প্রকাশনা বিভাগের প্রধান, মাসিক বেফাকুল মাদারিস এর সম্পাদক **হযরত মাওলানা ইবনুল হাসান আব্বাসী[হাফিযাহুল্লাহ]** এর অভিমত।

নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, এই কিতাবটি জিহাদ এবং তদসংক্রান্ত আপত্তি ও সংশয় নিরসনে লেখা। কিতাবখানা এমন এক আলেমের সংকলন যিনি আমলী জিহাদের ময়দানসমূহের একজন সফল ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ। তিনি আমার মত শুধু "মসী যোদ্ধাই নন, অসির যোদ্ধাও বটে"। জিহাদ আর সন্ত্রাসকে নিয়ে ইসলামের দুশমনরা এমন ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছে যে, উভয়ের মাঝে পার্থক্য করাই অনেকের জন্য মুশকিল হয়ে গেছে। অথচ সন্ত্রাস হলো পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো সে বিপর্যয় খতম করে ধরণীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র শরয়ী ব্যবস্থা। এই কিতাবের মধ্যে উভয়ের মাঝে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে শ্রদ্ধেয় মাওলানা সে সকল আপত্তিসমূহের জবাব দিয়েছেন যা অমুসলিমদের পক্ষ হতে উত্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে এর আগেও আরবী-উর্দূ ভাষায় কিতাব লেখা হয়েছে এবং ছাপাও হয়েছে। তা সত্ত্বেও বক্ষমান কিতাবটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এতে এমন কিছু অভিযোগ ও সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে যা ইদানিং কালের সৃষ্ট।

ইবনু হাসান আব্বাসী

২৫ শাওয়াল ১৪২৫ হিজরী

হযরত মাওলানা আবদুল হামীদ[হাফিযাহুল্লাহ] শাইখুল হাদীস ও নাযেমে তালিমাত জামেয়া বিননূরী সাইট, করাচী এর অভিমত।

চক্রান্তবাজ ধূর্ত ইংরেজরা যেদিন থেকে তাদের অপবিত্র পা হিন্দুস্তানের বুকে রাখল সেদিন থেকে অত্যন্ত চাতুরতার সাথে তারা ইসলামের উপর হামলা চালাতে লাগল। ইসলামের বিধি বিধানের উপর বিভিন্নমুখী খোঁড়া আপত্তি উত্থাপন করে মুসলমানদের স্বচ্ছ ধর্মীয় অনুভূতিকে কলুষিত করতে লাগল। ফলে ঐক্যের প্রতীক মুসলিম জাতি দুটি প্লাটফর্মে বিভক্ত হয়ে গেল। একগ্রুপ, ঐ সকল অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের অকাট্য বিধানগুলোর মাঝে মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে লাগল এবং সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যা করল যা ইংরেজদের মনঃপুত হয়। এদেরই অগ্রভাগে ছিলেন স্যার সৈয়্যদ আহমাদ খান। ২য় গ্রুপে ছিলেন ঐ সকল উলামায়ে কেরাম যারা এ সকল অভিযোগের জ্ঞানগর্ভ জবাব দিয়েছেন এবং আহকামে ইসলামের উপর কোন আঁচড় লাগতে দেননি। এই জামাতের মধ্যমণী ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ.। যিনি এ সকল অভিযোগের বিপক্ষে ইলম ও যুক্তি নির্ভর এমন জবাব ও দলীল-প্রমাণ পেশ করে গেছেন যা থেকে আগামী একশত বছর পর্যন্ত আমরা উপকৃত হতে পারবো।

ইংরেজদের অভিযোগের থাবায় আক্রান্ত হওয়া আহকামগুলোর মাঝে জিহাদ হলো সবচে বেশী নির্যাতিত। ভালো ভালো দ্বীনদার শিক্ষিত শ্রেণীও এ ক্ষেত্রে পদস্খলনের শিকার হয়েছেন।

কবির ভাষায়-

"নিজের বদলানোর ইচ্ছা তো ভাই নাই;

এসো সবাই মিলে কুরআনটা বদলাই।"

আমার উস্তাযে মুহতারাম পীর ও মুর্শিদ ইমামুল মা'কুলাত ওয়াল মানকুলাত হযরত মাওলানা আব্দুল কারীম কোরায়শী [মৃত-১৪১৯] এ ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি অধিকাংশ মজলিসে জিহাদের প্রকৃত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি জিহাদ বিষয়ে দুইটি কিতাব লিখেছেন। এগুলো

ছাপাও হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! সেগুলো আমাদের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা।

শ্রদ্ধেয় ভাই ইলিয়াস ঘুম্মানকে আল্লাহ তা'য়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি আলোচ্য বিষয়ের স্পর্শকাতরতা উপলব্ধি করে কলম তুলেছেন এবং "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামে একটি বিশ্লেষণধর্মী কিতাব সবার সামনে পেশ করেছেন। যার দ্বারা সাধারণ লোকদের উপকার তো হবেই সাথে সাথে উলামায়ে কেরামও উপকৃত হবেন। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি কিতাবখানাকে ব্যাপকভাবে কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে যেন ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেন।

আবদুল হামীদ
২০ শাওয়াল ১৪২৫
হিজরী
জামিয়া বিননূরী সাইট, করাচী।

জামিয়া বিননূরী সাইট করাচীর সুযোগ্য মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা **মুফতী শহীদ আতিকুর রহমান** সাহেবের দোয়া ও অভিমত।

"الحمد لله رب الشهداء والمقاتلين والصلوة والسلام علي امام الأنبياء والمجاهدين وعلي اله الطيبين الطاهرين وازواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين وعلي كل من حذا حذوهم إلي يوم الدين وبعدُ"

ইসলাম ধর্মের মূল শক্তি ও স্থিতির চাবিকাঠিই হলো জিহাদ। এর মাধ্যমে যেমনিভাবে ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ পায় তেমনিভাবে ইসলামের শত্রুরাও ভয়ে তটস্থ থাকে। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড করা থেকে বিরত থাকে। এ কারণেই প্রত্যেক যুগের বাতিল গোষ্ঠিই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে চেষ্টা চালিয়ে গেছে, যাতে জিহাদের দূর্নাম করা যায় এবং জিহাদের সাথে মুসলমানদের সম্পৃক্ততার অবসান ঘটানো যায়। নিকট অতীতে এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যেই কাদিয়ানী ধর্মমত নামে এক অপবিত্র বৃক্ষের গোড়ায় ইংরেজ কর্তৃক পানি সিঞ্চন করা হয়েছে। ফলে মির্জা কাদিয়ানী মিথ্যা নবুয়্যতের উপর ভর করে ঘোষণা করে ছিল-

যুদ্ধ-জিহাদ হারাম এ যুগে সন্দেহ নেই তাতে
দিলটাকে তাই মুক্ত করো জিহাদ ভাবনা হতে।

কিন্তু মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করাই ছিল তার সবচে বড় দুর্বলতা। মুসলিম সমাজে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক করতে সে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। হক্কানী আলেমদের অনবরত প্রচেষ্টার বরকতে কাদিয়ানীদের জিহাদ বিরোধী আন্দোলন হাওয়ায় মিশে গেছে এবং জিহাদ অস্বীকৃতিই তাদের শবাধারে সর্বশেষ কীলক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।

বাতিল নতুনভাবে পাঁয়তারা শুরু করল। মুসলমানদের কাতারে এক নতুন গোষ্ঠির জন্ম দিল। এদের পরিচয় হলো, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুক্ত চিন্তার অধিকারী, মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী ইত্যাদি চমকপ্রদ উপাধীসমূহ। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এই লোকগুলো জ্ঞান বহন করার পরিবর্তে জ্ঞান বিক্রিকারী আর দেমাগ ব্যবহার করার পরিবর্তে উদর পূর্ণকারী হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিনিময়ে তারা নিজেদের জ্ঞান আর ইলমকে সওদা করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ফলে একটি স্বচ্ছ ও শাশ্বত বিধান জিহাদের পথে বড় ধরণের বাধা সৃষ্টি করতে না পারলেও সংশয়

সন্দেহের ধূলা উড়িয়ে সহজ সরল মুসলমানদের মনে দুর্বোধ্যতা ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পিছিয়ে থাকেনি।

ইসলামের শত্রুদের আশির্বাদে সকল প্রকার প্রচার মাধ্যম ছিল এসব 'জ্ঞানীগুণীদের' সহজ বাহন। ফলে পর্দা বেষ্টিত নারী সমাজও তাদের চক্রান্তের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। এত কিছুর পরও সবচে বড় দুঃখজনক বিষয় হলো তাদের এ নোংড়া দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর প্রভাব শুধু আম সাধারণের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং পৃথিবীর সবচে পবিত্র ও সুউচ্চ স্থান মিম্বার ও মেহরাব অলংকৃতকারী উলামাগণও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। এমনকি কতিপয় জুব্বা পরিহিত পাগড়ীধারী ব্যক্তি এতটুকু পর্যন্ত বলতে লাগলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামের সুরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আত্নহত্যার নামান্তর। আর এই আত্মঘাতিরা মুসলিম সমাজে উগ্রতা ও বাড়াবাড়ির জন্ম দিচ্ছে। আরো বলছে যে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া জায়েয নেই যতক্ষণ না রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এর অনুমতি দেয়। যাদের পরিচয় হলো ব্যাভিচারী, শরাবখোর, লম্পট, চরিত্রহীন ও নামেমাত্র মুসলমান। তারাও এ সকল বিষয়ে বড় বড় 'ফতোয়া' ছাড়ছে; কিন্তু একথা বলতে রাজি নয় যে, এই নাযুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় কী?

তাই বর্তমান সময়ের নিতান্ত প্রয়োজন যে, হকানী উলামায়ে কেরামগণ আগে বেড়ে উম্মতের রাহনুমায়ী করবেন। বাতিল পূঁজারীদের দ্বিধা সংশয়ের কালো পর্দা বিদীর্ণ করে জিহাদের প্রকৃত ও বাস্তব চিত্র দুনিয়ার সামনে তুলে ধরবেন।

মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব [হাফিযাহুল্লাহ] একজন আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও প্রসিদ্ধ গাযী। বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হক কথা বলার দ্বায়ে কারা নির্যাতনও ভোগ করেছেন। তিনি জিহাদ প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও সংশয় সমূহের বড় চমৎকার জবাব দিয়েছেন এবং পেট পূঁজারী আর অর্থলোভীদের সমুচিত শিক্ষাও দিয়েছেন।

আশা করি কিতাবখানা অনেক পথহারা "বিজ্ঞজনের" জন্য আলোক মিনার হবে। ব্যক্তি স্বার্থের বেড়াজালে অবরুদ্ধদের জন্য স্বাধীনতার পয়গাম হবে এবং সাধারণ জনগণের জন্য হবে উত্তম পথ প্রদর্শক। আল্লাহ তা'য়ালা কিতাবখানাকে ব্যাপকভাবে কবুল করুন। লেখক ও পাঠক সকলের নাজাতের ওসীলা বানান।

মুফতী আতিকুর রহমান

২৪শে শাওয়াল ১৪২৫হিজরী

বার্মার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেবের খলীফা হযরত **মাওলানা মুফতী ইদরীস**[হাফিযাহুল্লাহ] এর দোয়া ও অভিমত।

"الحمد لله وكفي وسلامٌ على عباده الذين اصطفى أما بعدُ"

১৪২৫ হিজরীর রমজানুল মোবারকের শেষ দশকটি আমার শাইখ আরেফ বিল্লাহ হযরত শাহ হাকী মুহাম্মদ আখতার সাহেব (রহ.) এর খানকায় কাটানোর তাওফীক হয়েছে। এই সময়ে এক মর্দে মুজাহিদ বিজ্ঞ আলেম হযরত মাওলানা ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। তিনিও হযরত ওয়ালার খলীফা। তাঁর ব্যক্তিত্বের দিকে তাকালে সাহাবাদের স্মরণ তাজা হয়। সর্বদা ভাবনায় ডুবন্ত। বিশেষ করে মজলুম মুসলিম জাতির জন্য দিনরাত চিন্তামগ্ন। তিনি "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা" নামক একটি কিতাব সংকলন করেছেন। কিতাবের পাণ্ডুলিপি বান্দাকে দেখিয়ে অভিমত স্বরুপ কিছু কথা লিখে দেয়ার আবেদন করলেন। বান্দা পাণ্ডুলিপি পড়ে তো অবাক। এখানে সব অভিযোগ আপত্তির এমন এমন আকলী (যৌক্তিক), নকলী (কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক) জবাব দেয়া হয়েছে যা কোনদিন অধমের কল্পনাতেও আসেনি।

আজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র প্রকৃত অর্থ না বুঝার কারণে অপাত্রে এর ব্যাবহার ঘটিয়ে এই মহান সাফল্যের পথ থেকে অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। (এরচেয়ে বড় আফসোস হলো কিছু মানুষ তো ঐ সকল মুজাহিদগণকেও নিন্দার পাত্র বানাচ্ছে যারা সকল অভিযোগ-আপত্তি পিছনে ফেলে আপন জান-মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। তাই আল্লাহর দরবারেই সকল অভিযোগ।

"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق."

এসকল নিন্দুকরাই এই হাদীসের উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র। যে মুসলিম দুনিয়া ত্যাগ করলো কোন দিন জিহাদে গেল না, যাওয়ার আকাংখাও পোষণ করল না সে এক প্রকার নেফাকীর উপর মৃত্যুবরণ করলো। সুতরাং জিহাদের মাসআলা বুঝা এমন জরুরী যেমন ঈমানের মাসআলা বুঝা জরুরী। কেননা ফুক্বাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদ অস্বীকার করে সে কাফের। ছোট্ট একটা সুন্নত নিয়ে

ঠাট্টাকারী কখনও মুসলমান থাকতে পারে না। তাহলে জিহাদ যা সরাসরি আল্লাহর কালামে বর্ণিত তা অস্বীকারকারী কীভাবে মুমিন থাকতে পারে?

দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা এই কিতাবের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে জিহাদের সঠিক অর্থ বুঝার তাওফীক দান করুন এবং মুসলিম জাতিকে এই মহান কাজে জানমাল খরচ করার সৌভাগ্য নসীব করুন। সাথে সাথে লেখকের দিলের আশা পূরণ করে একে উভয় জাহানে সফলতার মাধ্যম বানান।

মুহাম্মদ ইদরীস

উস্তাযুল হাদীস,

দারুল উলুম রেঙ্গুন, বার্মা।

অর্পণ

- হক্বের ঝাণ্ডা তুলে যুদ্ধরত সেসব মুজাহিদগণের নামে যারা কুফুরী শক্তির ব্যারাকসমূহে সর্বদা বজ্রপাত ঘটাচ্ছেন।
- জিহাদের ময়দান থেকে গ্রেফতার হওয়া সকল মুজাহিদের নামে যারা পৃথিবীর যে কোন তাগুত বাহিনীর কারাগারে বসে সাহায্যের প্রহর গুণছেন।
- আল্লাহর পথের ঐ সকল মুজাহিদদের নামে যাদের দাস্তান শুনে অধঃপতনের এ যুগে খানসা ও খাওলার ঘটনা স্মরণ হয়ে যায়।
- জিহাদের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি অর্জনকারী ঐ সকল শুহাদায়ে কেরামের নামে যারা ইসলামের সোনালী ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের বর্তমানকে বিসর্জন দিয়ে জান্নাতে চলে গেছেন।

–মুহাম্মদ ইলিয়াস ঘুম্মান

কিছু আবেদন

এ কিতাব লেখার উদ্দেশ্য একটাই যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর উপর উত্থাপিত আপত্তি সমূহের যৌক্তিক ও ইতিবাচক জবাব প্রদান করা। যাতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রকৃত অবস্থান ও আপন চিত্র উম্মতের সামনে ফুটে উঠে এবং কুফুরীচক্রসমূহ নস্যাৎ হয়। সাধারণ জনগণ ও ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন এ সকল দ্বিধা-সংশয়ের শিকার হয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত না হয়। হঠকারীতা ও গোঁড়ামীর চশমা নয়; বরং প্রকৃত বিষয় বুঝার নিয়তে কেউ যদি বই খানা পড়ে তাহলে ইনশা-আল্লাহ সে উপকৃত হবে। অন্যথায় হঠকারীতার চিকিৎসা তো আমার কাছে নেই। হ্যাঁ, আমি শুধু দোয়া করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমি কোন কার্পণ্য করবো না।

হৃদয়ের আকুতি

এ বইয়ে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলের যুক্তি খণ্ডন করা হয়নি। বরং জিহাদ সংক্রান্ত মৌলিক আপত্তিসমূহের খণ্ডন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি এ বইয়ের কারণে কোন ব্যক্তি বা দলের সদস্যদের মনে আঘাত লাগে তাহলে ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকলেও আমি অগ্রীম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সংক্ষেপণ

আমি কিতাবটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট খেয়াল রেখেছি, যাতে কোন আলোচনা অতি দীর্ঘ না হয়ে যায়। যা পাঠকবর্গের বিশেষত আমার হৃদয়মনি মুজাহিদ ভাইদের মহা মূল্যবান সময় নষ্টের কারণ হয়। বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি দু'একটি দলীলের মাধ্যমে প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার। আর বাকী দলীল গুলো নিজেই খুঁজে নেবে কিংবা জিহাদের ময়দানে কর্মরত উলামায়ে কেরাম থেকে জেনে নিয়ে আমলে লেগে যাবে।

এই সংক্ষেপনের কারণেই এ বইয়ে জিহাদের ফাযায়েল, মাসায়েল ও জিহাদ না করার উপর দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতিসমূহ আলোচনা করা হয়নি। অধিকন্তু এ সকল বিষয়ে বাজারে আলহামদুলিল্লাহ অনেক বই ছাপা হয়েছে। যদিও কোন কোন জায়গায় কিছু ফাযায়েলের আলোচনাও এসে গেছে কিন্তু তা কিতাব সংকলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

স্বীকারোক্তি

ইসলামের স্বার্থে কারাবন্দী জীবনে এ কিতাব লেখা হয়েছে। তাই প্রয়োজনীয় সকল কিতাবে হাতের কাছে পাওয়া সম্ভম ছিলো না। আর জেলের অবস্থাও ছিল এমন যে, দীর্ঘ সময় কাজ করার সুযোগ নেই। কারণ, যে কোন সময় তল্লাশীর নামে সব কিছু বাজেয়াপ্ত হতে পারে। যে কয়েকটি কিতাব আমার সামনে ছিল তা এখানে উল্লেখ করছি:-

তাফসীরে উসমানী, তাফসীরাতে আহমাদীয়্যাহ, মাআরেফুল কোরআন, মুজিহুল কোরআন, কানযুল উম্মাল, আল জামেউস্‌সগীর, যাদুত তালিবীন, মেশকাত শরীফ, মুখতাসারুল কুদুরী, উসুলুশ শাশী, মানশুরুল কোরআন।

নিচে আমার আকাবিরগণের যে সকল কিতাব ও রিসালা থেকে উপকৃত হয়েছি তাঁদের নামও তুলে ধরছি:-

হযরত মাওলানা মুফতী রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী রহ.

উস্তাযে মুহতারাম মুফতী আবদুর রহীম সাহেব রহ.

উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ আসলাম শেখপুরী [হাফিযাহুল্লাহ]

উস্তাযে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মদ যাহেদ আর রাশেদী [হাফিযাহুল্লাহ]

মুফতী মুহাম্মদ রফী উসমানী [হাফিযাহুল্লাহ]

মুফতী মুহাম্মদ মাসুম আফগানী [হাফিযাহুল্লাহ]

মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাদেকাবাদী [হাফিযাহুল্লাহ]

মুফতী মুহাম্মদ আবু রায়হান কাশ্মিরী [হাফিযাহুল্লাহ]

মাওলানা ফযল মুহাম্মদ ইউসুফ জাই [হাফিযাহুল্লাহ]

সুফী মুহাম্মদ ইকবাল [হাফিযাহুল্লাহ] মদীনা মুনাওয়ারা, সাউদী আরব।

শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী রহ.

শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল করীম কুরাইশী [হাফিযাহুল্লাহ] এ ছাড়াও অনেক আগের বিশেষত ছাত্র জামানার মোতাআলা থেকে যা কিছু স্মরণে ছিল তা দ্বারাও বিশেষ উপকৃত হয়েছি। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই।

আবেদন

এ জন্য আমার আবেদন হলো, এ কিতাবের যে কথাটি উপকারী ও ভাল মনে হবে, তা আমার আকাবিরগণের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি কোন কথা অর্থহীন ও ভুল সাব্যস্ত হয়, তার সম্পর্ক হবে আমার সাথে। এই কিতাব দ্বারা যদি কেউ সামান্যও উপকৃত হয় তাহলে সে যেন আকাবির ও আমার জন্য মঙ্গলের দোয়া করে। পক্ষান্তরে কারো যদি সামান্যও আঘাত লাগে তাহলে সে যেন এতে শুধু আমাকেই অভিযুক্ত করে। আর আমি তো আমার পূর্বোক্ত ওযরখাহীর ভিত্তিতে ক্ষমার যোগ্য। কেউ যদি ক্ষমা করে তবে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।

অপেক্ষা

বাস্তবেও যদি এ বইয়ে কোন ভুল কথা এসে যায় তাহলে আমি অপেক্ষায় থাকলাম। যাতে এ বিষয়ে আমাকে অবগত করা হয়। আমি নিঃসংকোচে ভুল মেনে নেবো এবং তাওবা করতঃ পরবর্তী এডিশনে তা শুধরিয়ে নেবো ইনশা-আল্লাহ। তবে শর্ত হলো, যে আপত্তিই হবে তা দলীল ভিত্তিক হতে হবে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমি সর্ব প্রথম আমার মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে জিহাদ বিষয়ে কলম ধরার তাওফীক দিয়েছেন।

"وما توفيقي الا بالله العلي العظيم"

হাদীসে শরীফে এসেছে

"من لم يشكر الناس لم يشكر الله"

"যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করলোনা সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করলো না।"

এ হাদীসের উপর আমল করতঃ সকল কল্যাণকামী বন্ধুবর্গের শুকরিয়া আদায় করছি; যারা বন্দী জীবনে এ কিতাব লেখা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য হলেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে দুনিয়া-আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাই বলছি:-

"جزاهم الله تعالي أحسن الجزاء في الدنيا والاخرة"

দোয়া

আল্লাহ তা'য়ালা এ কিতাবকে আমভাবে এবং খাসভাবে কবুল করুন। একে ধর্মীয় কল্যাণের মাধ্যম বানান। আমার নিজের বাবা-মা, ভাই-বেরাদার, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, উস্তাদ-মাশায়েখ, দোস্ত-আহবাব সকলের জন্য এ কিতাবকে আখেরাতের সম্বল বানান। আমীন!

ভূমিকা

ইসলামী শরীয়ত মানবতার সফলতার জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিধান দিয়েছে। এ বিধানগুলো এতটাই পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট যে, তাতে অতিরিক্ত কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, কোন কোন সময় কারো কাছে শরয়ী জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে আগের বিধানগুলোকে যুগের বর্তমান অবস্থার উপযোগী মনে হয় না। তখন কিছু হতভাগা নিজের অজ্ঞতা ও জ্ঞানদৈন্যের স্বীকার না করে শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আপত্তি তুলতে থাকে। আর এক বিঘত লম্বা জিহবাটা বের করে উদরস্থ মন্দ কথাগুলোর উদ্গীরণ করতে থাকে। এর মোকাবেলায় প্রতিটি যুগের উলামায়ে কেরাম "العلماء ورثة الأنبياء"এর মানসাবে বসে সে সকল আপত্তিসমূহের আকলী-নকলী কুরআন, সুন্নাহ ভিত্তিক জবাব দিয়ে আসছেন এবং এর খণ্ডনে অত্যন্ত জোরালো ও যুক্তিনির্ভর কিতাবাদী রচনা করে আসছেন। "جزاهم الله أحسن الجزاء" "আল্লাহ তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন" পবিত্র শরীয়ত প্রতিটি ইবাদতের জন্য পৃথক

নাম, পৃথক হুকুম নির্ধারণ করেছে। শুধু ইবাদতই নয় পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়েও প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথক নাম ও হুকুম বর্ণনা করেছে। যাতে একটা আরেকটার সাথে মিশে না যায়। হুকুমের মাঝে কোন জটিলতা ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি না হয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা যে ইবাদতের জন্য যে নাম নির্বাচন করেছেন সে ইবাদতের ক্ষেত্রেই সে নামটি ব্যবহার করা জরুরী হবে। আসুন! এই নীতিমালার আলোকে আমরা কয়েকটি ইবাদত নিয়ে পর্যালোচনা করি।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি আপনাকে আবারও আবেদন করছি আপনি সব ধরণের হঠকারীতা, গোঁড়ামী, কূধারণা ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত হয়ে আমার আলোচনা পড়ুন। এক একটি শব্দ গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। আমার লক্ষ্য তো একটাই যে, সাধারণ মুসলমানরা যেন নাম সর্বস্ব "চিন্তাবিদদের" প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হয়ে বাস্তবতা থেকে দূরে সরে না যায়।

আমাদের জন্য এটা কতবড় সৌভাগ্য যে, শরীয়ত কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে সকল ইবাদতের নাম, আহকাম, ফাযায়েল, মাসায়েল এবং এগুলো পালনের ক্ষতি ও শাস্তির দিকগুলো পৃথক পৃথক বর্ণনা করে দিয়েছে। যেমন-

নামাজ

নামাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যার জন্য শরীর, কাপড়, নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া এবং কিবলামুখী হওয়া শর্ত। এর মধ্যে রয়েছে তাকবীরে তাহরীমা, কিয়াম, রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদ ইত্যাদী। কুরআন-সুন্নায় নামাজের জন্য যে সকল ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে তা কেবল ঐ ইবাদতের জন্যই প্রযোজ্য হবে যার মাঝে এ সকল শর্তাবলী পাওয়া যাবে অন্যথায় সেটা নামায বলে গণ্য হবে না।

রোজা

সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়তসহ খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম। রোযার যে সকল ফাযায়েল বর্ণিত হয়েছে তা শুধু সব বিধান ও শুশর্তের সাথেই সীমাবদ্ধ। এসব বিধান উপেক্ষা করলে রোজা হবে না।

হজ্জ

ইহরাম, তালবীয়া, তাওয়াফ, আরাফা-মুযদালিফায় অবস্থান, মিনায় প্রস্তর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন, সাফা-মারওয়ায় সাঈ ইত্যাদি আমল দ্বারা সম্পাদিত একটি ইবাদতের নাম। এ সংক্রান্ত ফাযায়েলগুলোও এর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এগুলো ছাড়া হজ্জ আদায় করা যায় না।

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

শারীরীক কষ্ট, তীর-তরবারী চালানো, বর্শা-বল্লম নিক্ষেপ, বর্ম পরিধান, ঘোড়া ব্যাবহার আর বর্তমান যমানাহিসাবে মেশিনগান, পিস্তল, ক্লাশিনকোভ, গ্রেনেড, ট্যাংক, বোমা, ক্ষেপনাস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদি চালানোর মাধ্যমে সম্পাদিত একটি আমল। যার মধ্যে মুসলমান কাফেরকে হত্যা ও পরাজিত করলে গাজী হয় আর কাফের কর্তৃক নিহত হলে শহীদ হয়। কাফেরের মাল ছিনিয়ে আনতে পারলে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত কাফের বাহিনীর সম্পদলব্দ হলে সবচে পবিত্র রিযিক তথা গনীমত হিসাবে গণ্য হয়। কাফেরদের বন্দি সৈন্য পুরুষ হলে গোলাম আর মহিলোা হলে বাদী হয়। বিবাহ ব্যতীত এদের সাথে সঙ্গম বৈধ। এ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ দান। এ সকল বিষয় যেখানে পাওয়া যাবে তাকেই বলে ইসলামের ভাষায়, কুরআনের ভাষায়, হাদীসের ভাষায় এবং দেড় হাজার বছরের মুসলমানদের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসের ভাষায় 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

এমনিভাবে যে সকল ইবাদত ইসলামের রুহ যা ব্যতীত ইসলাম কল্পনা করাই অসম্ভব সে সকল ইবাদতের মাঝে শরীয়ত স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক ইবাদতকে আরেকটির উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যদিও প্রতিটি ইবাদত আপন অবস্থানে সঠিক সময়ে ও নির্ধারিত ক্ষেত্রে আদায় করাই হলো মূল ফযীলতের বস্তু ও কামালিয়্যাত অর্জনের মাধ্যম। কিন্তু এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কোন ইবাদতের সওয়াব কম বেশী হবার সাধারণ মাপকাঠি হলো ঐ ইবাদত সম্পাদনে কষ্ট কম-বেশী হওয়া। অর্থাৎ যে ইবাদতে যে পরিমাণ কষ্ট মোজাহাদা হবে তার সওয়াবও সে পরিমাণ বেশী হবে। আর দুনিয়াতে সবচে' মূল্যবান হলো মানুষের জীবন, তারপর সম্পদ। এ কথা থেকে সুস্পষ্ট রূপে জানা গেল, যে আমলে জান-মাল উভয়টা উৎসর্গ করতে হবে সে আমলটাই অন্যান্য সকল আমলের থেকে মর্যাদা, ফযীলত ও সাওয়াবে বেশী হবে।

আসুন! আমরা একটু দেখি, কোন আমলের মধ্যে জান-মাল উভয়টা কোরবানী করতে হয়। আমাদের যদি ইনসাফের দৃষ্টি থাকে তাহলে দেখতে পাবো, সে আমল হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। এ আমল সম্পাদনে কোথাও জানের প্রয়োজন বেশী হয় কোথাও মালের প্রয়োজন বেশী হয়। অথবা এভাবে বলা যায়, মানুষের স্বভাব অনুযায়ী কারো কাছে জানের মুহাব্বাত বেশী। আবার কারো কাছে মালের মুহাব্বাত বেশী। কেউ সম্পদের খাতিরে জীবন লুটিয়ে দেয়। কেউ আবার প্রাণের মায়ায় সম্পদ লুটিয়ে দেয়। এই স্বভাবজাত পার্থক্যের কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদের আয়াতসমূহে কোথাও জানকে আগে উল্লেখ করেছেন আবার কোথাও মালকে আগে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি জিহাদ সম্পাদনে যেহেতু জান-মাল উভয়টাই উৎসর্গ করতে হয় তাই শরীয়তে এ মহান ইবাদতকে "ذروة سنام الاسلام"'ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া' বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেমনিভাবে উটের সকল অঙ্গ হতে তার কুজ্বটাই সবচে উঁচু তেমনিভাবে ইসলামের সকল আহকাম হতে জিহাদের হুকুমটি সবার উচ্চে। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে একদিন একরাত বরং এক সকাল বা এক বিকাল সময় কাটানো দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু হতে উত্তম।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :"لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها"

- الصحيح للبخاري:١/٣٩٢ باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة. رقم الحديث: ٢٧٩٢ ،- الصحيح لمسلم :٢/١٣٤ باب فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. رقم الحديث:٤٨٣٦ ، - سنن الترمذى:١/٢٩٤ باب باب في الغدو و الرواح في سبيل الله. رقم الحديث:١٦٤٠ ، - المصنف لإبن أبي شيبة:١٠/٢٢٧باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه. رقم الحديث:١٩٦٤٩

অপর হাদীসে এসেছে,

عن سلمان قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان".

-الصحيح لمسلم: ١٤٢/٢ باب فضل الرباط فى سبيل اللّهِ عز وجلَّ. رقمالحديث:٤٩٠١

-المسند للإمام أحمد : ٢١٢/٦ رقم الحديث:٦٦٥٣ - المعجم الكبير للطبرانى : ٦١٧٨

'আল্লাহর পথে একদিন একরাত পাহারাদারী করা মাসভর সিয়াম পালন ও কিয়াম সাধন থেকে উত্তম। আর সে যদি মারা যায় তবে তার আমল অব্যাহত রাখা হয় এবং তার উপর রিযিক চালু করে দেয়া হয় এবং কবরের ফেৎনা থেকে নিরাপদ রাখা হয়!'

অপর হাদীসে এসেছে-

عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله" .

-سنن الترمذى:٢٩٣/١ باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله . رقم الحديث:١٦٣١ - شعب الإيمان للبيهقى:٧٩٦ باب في الخوف من الله تعالى -

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ও জিহাদের ময়দানে পাহারাদারী করে জাগ্রত থাকা চক্ষুদ্বয়কে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না। আরো বর্ণিত হয়েছে-

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إن الله عزوجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله"

-سنن أبي داؤود:٣٤٠/١ باب في الرمي. رقم الحديث:٢٥١٣ - سنن النسائى: ٤٩/٢ باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله . - المسند للإمام أحمد : ٣٣٢/١٣ رقم الحديث:١٧٢٣٣

আল্লাহ তা'য়ালা একটি তীরের বিনিময়ে তিনজনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রস্তুতকরী। যে ভালো নিয়তে তীর প্রস্তুত করে। তীর নিক্ষেপকারী ও তীর সরবরাহকারী।

অন্য হাদীসে এসেছে-

عن سالم أبي النصر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبه قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما : "أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"

صحيح البخارى : ٣٩٥/١ باب الجنة تحت بارقة السيوف رقم الحديث : ٢٧١٨ – المصنف لإبن أبي شيبة ٣٤٢/١٠ ما ذكر في فضل المجاهد رقم الحديث : ١٩٨٥٦

জেনে রাখ! নিশ্চই জান্নাত হলো তরবারীর ছায়াতলে।
এই মোবারক আমলে এক মুহূর্ত অংশগ্রহণকারীর জন্যও জান্নাত প্রস্তুত করে দেয়া হয়।

"من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة"

-سنن الترمذى:٢٩٤/١ باب في الغدو والرواح في سبيل الله . رقم الحديث: ١٦٤٣- السنن لأبي داؤود: ٣٤٤/١ باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة . رقم الحديث:٢٥٤١ - سنن النسائى: ٤٨/٢ باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة.

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক মুহূর্তও লড়াই করবে তার জন্য জান্নাত অবশ্যক। যুদ্ধের ময়দানের সামান্য সময় অবস্থানকে ঘরে বসে ষাট বছর রিয়ামুক্ত ইবাদতের থেকে উত্তম বলা হয়েছে।

عن أبي أمامة ...."ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة"

المسند للإمام أحمد : ٢٦١/١٦ رقم الحديث: ٢٢١٩٢ - المعجم الكبير للطبراني: ٧٨٦٨

তোমাদের কারো যুদ্ধের কাতারে দন্ডায়মান হওয়া ষাট বছর নামাজ পড়া থেকে উত্তম। এই মোবারক আমলে প্রবাহিত রক্ত থেকে কাল হাশরের মাঠে মেশ্‌কের সুঘ্রাণ ছড়াবে।

عن عبد الله بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لقتلى أحد زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك"

-سنن النسائي:٤٩/٢ باب من كلم في سبيل الله عز وجل ، - المسند للإمام الأحمد:٦٧/١٧ رقم الحديث:٢٣٥٤٧ ، -الصحيح لمسلم: رقم الحديث:٤٨٢٥ - المصنف لإبن أبي شيبة:١٩٥٠٦

এই মোবারক আমলে ব্যবহৃত তলোয়ার যেমন পৃথিবী থেকে কুফুরকে মিটিয়ে দেয় তেমনি মুজাহিদের গুণাহকেও মিটিয়ে দেয়।

عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان السيف محاء للخطايا"

-مسند أحمد: ٤٥٤/١٣ رقم الحديث:١٧٥٨٨ ، - الصحيح لإبن حبان: ٥١٩/١٠ رقم الحديث:٤٦٦٣ ، - الجهاد لإبن المبارك: ٦٢

শুধু গুণাহ থেকে পবিত্রই করে না; বরং হত্যাকারী মুসলিম আর নিহত কাফের উভয়কে চিরতরে পৃথক করে দেয়। এমনভাবে পৃথক করে যে, উভয়ে আখেরাতেও কোন দিন একত্র হবে না। কাফের তো নিহত হয়ে জাহান্নামে চলে যায়। আর মুজাহিদ কাফের হত্যা করে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যায়।
রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا يجتمع الكافر وقاتله من المسلمين في النار أبدا"

- مسند أحمد: ٧/٩ رقم الحديث:٨٨٠١ ، - صحيح لإبن حبان: ٥٢١/١٠ رقم الحديث:٤٦٦٥

কাফের এবং তার হত্যাকারী মুসলিম কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।

আর মুজাহিদ যদি নিজেই কাফেরের হাতে শহীদ হয় তাহলেও সে সফল। সুবহানাল্লাহ! কেমন সফলতা যে, রক্তের প্রথম ফোঁটা যমীনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল গুণাহ মাফ হয়ে যায়।

عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول "إن للشهيد عند الله تسع خصال أنا أشك يغفر الله ذنبه في أول دفعة من دمه"

হযরত মিকদাদ রা. বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি নিশ্চই শহীদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে নয়টি মর্যাদা। আমি নিশ্চত যে আল্লাহ তা'য়ালা প্রথাম রক্তের ফোঁটায় তাঁর গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

"ويرى مقعده من الجنة"

রুহ বের হবার আগেই জান্নাতের প্রাসাদসমূহ পরিদর্শন করান ।

"ويحلى بحلية الإيمان"

ঈমানের পোষাকে সুসজ্জিত করান।

"ويجار من عذاب القبر"

কবরের আযাব হতে মুক্তি দান করেন।

"ويزوج من الحور العين"

আয়না হুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

"و يؤمن من الفزع الأكبر"

হাশর মাঠের ভয়াবহ পেরেশানী থেকে নিরাপদ রাখেন।

"ويوضع على رأسه تاج الوقار كل ياقوته خير من الدنيا وما فيها"

তাঁর মাথায় সম্মানের মুকুট পরান; তাঁর প্রতিটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তারচে' উত্তম।

"ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من حور العين"

বাহাত্তরটি আয়না হুরের সাথে বিবাহ পরিয়ে দেন।

"ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه" .

নিজে তো জান্নাতের যাবেই। সাথে সাথে আত্মীয়দের মধ্য হতে সত্তর জনের ব্যাপারেও তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন।

- مصنف عبد الرزاق :٢٦٥/٥ رقم الحديث:٩٥٥٩ باب أجر الشهادة

- سنن الترمذي ٢٩٥/١ رقم الحديث:١٦٥٣، -باب ما جاء أي الناس أفضل ، - المسند للإمام أحمد:٢٩٣/١٣ رقم الحديث:١٧١١٦

সারকথা

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. তাঁর ভাষায় লিখেছেন-

"جهاد الكفار من أعظم الاعمال بل هو أفضل ما تطوّع به الإنسان"

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সবচে বড় আমল; বরং ফারায়েয ব্যতীত মানুষ যত আমল করে তার মধ্যে জিহাদই সর্বশ্রেষ্ট। [মাজমুউল ফাতাওয়া পৃ: ১৯৭ খ: ১১]

এসব ফাযায়েল ছাড়াও এ মোবারক আমলকে ঈমান ও নেফাকের মাপকাঠি বানানো হয়েছে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

"وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا"

[আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন] যাতে জানতে পারেন কারা মুমিন আর কারা মুনাফিক।

আর যে ব্যক্তি নিজে এই মোবারক আমলে শরীক হলো না, কোন মুজাহিদের পরিবারের খোঁজ রাখল না অথবা কোন মুজাহিদকে জিহাদের ব্যাপারে সহায়তা করল না তাকে মৃত্যুর আগে কোন না কোন কঠিন মুসিবতে আক্রান্ত হবার সতর্কবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে।

عن أبى أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيافي أهله بخير أصابه الله بقارعة " قال يزيد بن عبد ربه في حديثه :قبل يوم القيامة .

- سنن أبي داوود:٣٣٩/١ باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:٢٥٠٣ ، - السنن الكبرى للبيهقى:٩٢/٩ باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية . رقم الحديث:١٧٩٤٢،

যে যুদ্ধ করল না অথবা কোন যোদ্ধাকে সরঞ্জাম ব্যবস্থা করে দিল না কিংবা কোন যোদ্ধার অনুপস্থিতির কারণে তার পরিবারের খোঁজ খবর নিল না; আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বিপদে আক্রান্ত করবেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ কররো অথচ সে জিহাদ করেনি এবং জিহাদের জন্য তার অন্তর আকাংক্ষাও করেনি, সে যেন মুনাফিক হয়ে মৃত্যু বরণ করলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق".

- الصحيح لمسلم :١٤١/٢ باب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ . رقم الحديث:٤٨٩٤ - المسند للإمام أحمد :٢٩/٩ رقم الحديث:٨٨٥١ ، - سنن أبي داوود:٣٣٩/١ باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:٢٥٠٢

'যে ব্যক্তি জিহাদের কোন ক্ষত, আঘাত বা জিহাদের কোন কাজে শরীক হওয়া ছাড়াই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল তার ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে, সে হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে এমন ভাবে দাঁড়াবে যে, তার গায়ে এক ধরণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে বা তার দ্বীনদারিতে কমতি দেখা যাবে।'

عن أبی هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : "من لقى الله بغير أثر من جهاد لقى الله وفيه ثلمة" .

سنن الترمذی: ۲۹٦/۱ رقم الحديث:١٦٥٧- مستدرك للحاكم: ۷۹/۲ ،

'যে ব্যক্তি জিহাদের কোন চিহ্ন ব্যতিরেকে আল্লাহ তা'য়ালার সামনে উপস্থিত হবে সে আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে ত্রুটি যুক্ত অবস্থায়।'

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জিহাদের ফাযায়েল ও মর্যাদা বয়ান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে কয়েকটি ফাযায়েল ও সতর্কবার্তা উল্লেখ করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটা বুঝানো যে, এই মোবারক আমলটি শরীয়তের দৃষ্টিতে কত মহান। সুতরাং এই মোবারক আমলে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান মুজাহিদীনে কেরাম বরং সায়্যেদুল মুজাহিদীন নাবীয়্যুস্ সাইফি ওয়ার্ রাহ্মাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুপূত্রদের উপর যে পরিমাণই ঈর্ষা করা হবে তা পরিমানের চেয়ে কমই বলতে হবে। আল্লাহ! তা'য়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদেরকে এতে পূর্ণ অংশ গ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

জিহাদ এবং আরবী ভাষা

এতো ছিল বরকতময় আমল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহের হাক্বীকত। কিন্তু জিহাদ শব্দটি যেহেতু আরবী শব্দ আর আরবী ভাষায় এর অর্থ হলো চেষ্টা করা, খুব মেহনত করা । আমি এটাও সামর্থন করি যে, কুরআনে কারীমেও কোন কোন স্থানে এটা আভিধানিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে; বরং শরীয়ত অধিকাংশ সময় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর গুরুত্ব ও মহত্বের প্রতি লক্ষ্য করে উৎসাহ-উদ্দিপনা যোগানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য কিছু ইবাদতের উপর রূপক অর্থে জিহাদ শব্দটি প্রয়োগ করেছে। এতে কতেক স্বল্প জ্ঞানী বরং [আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে] কিছু সংখ্যক আহলে ইলম ও লেখক সাহেবানও ধোঁকায় পড়ে গেছেন। তারা

দ্বীনের যেসকল কাজের মধ্যে নূন্যতম চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা কষ্ট-মেহনত রয়েছে তাকেও জিহাদ বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। অথচ এটা সরাসরি বে-ইনসাফী ও বাড়াবাড়ি। কারণ, শরীয়ত যখন প্রতিটি আমল ও প্রতিটি ইবাদতের জন্য যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাহলে আমাদের কী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, আমরা খামোখা বিভিন্ন আমল-ইবাদতের নাম এবং আহকামের মধ্যে পরস্পরে গড়মিল করে ফেলবো।

দেখুন, যদি কোন মজদুর জুন মাসের গরমে অথবা আগষ্টের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে লোহার ফ্যাক্টরীতে বা ইঁটের ভাটায় কাজ করে অথবা কোন কৃষক তীব্র গরমের মৌসুমে ধান, গম ইত্যাদি কাটার কাজ করে এবং পিপাসার কাতরতা বরদাশত করে, ক্ষুধার যন্ত্রনা সহ্য করে। এতদসত্ত্বেও নামাজ কেন রমজানের রোযাকেও কাযা করা সমীচীন মনে করে না। অথবা কোন ব্যবসায়ী বেঈমানী ও সুদখোরীর সাগর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে আর বাজারের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার মধ্যে দৃষ্টির হেফাযত করে, প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার সময়ও যোহর বা আসরের আযান শুনেই দোকান বন্ধ করে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে উপস্থিত হয়। অথবা যে প্রচণ্ড শীত বা গরমের মৌসুমে কাঁধে বিছানা নিয়ে নিজ বাসস্থান ছেড়ে সফরে বেরিয়ে যায়। আল্লাহর দ্বীনের ফিকির নিয়ে এবং যবানে আল্লাহর যিকির করতে করতে প্রথভ্রষ্ট গুণাহগার মানবজাতির সম্পর্ক গুনাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেওয়ার কাজে সচেষ্ট, মানুষের তিক্ত কথাবার্তা ও অসহনীয় মন্তব্য, অপদস্থতার চরমসীমা পর্যন্ত বরদাস্ত করেও মদদ ও নুসরতের আশায় ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাচ্ছে।

অথবা কোন মুসলিম বোন ইউরোপের অশ্লীল, উলঙ্গ ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে পর্দা করছে এবং নিজের ইজ্জত আব্রুর হেফাজতের জন্য পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করছে। গুণাহের আগত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে এক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সারা দুনিয়ার নারাজি ও অসন্তুষ্টি সয়ে নিচ্ছে। তার এ কারনামাটি নি:সন্দেহে শত প্রশংসাযোগ্য ও ঈর্ষণীয়। বরং অনুসরণযোগ্যও বটে। এটা অনেক বড় কুরবানী ও লিল্লাহিয়্যাত। আর দ্বিগুণ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার কারণে তার সওয়াব নি:সন্দেহে সাধারণ নামাযীদের থেকে বেশী, সাধারণ রোযাদারদের থেকে বেশী এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে বেশী, সাধারণ মহিলোাদের পর্দার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী হবে। এই ব্যবসায়ী এ কাজের জন্য কিয়ামতের দিবসে আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে থাকবে বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য ও লিল্লাহিয়াতের উপর ভিত্তি করে তার সওয়াব

অনেক ক্ষেত্রে মুজাহিদ এবং গাজীদের চেয়েও বেশী হবে। এতদ্বসত্ত্বেও এই দিনমজুর ও কৃষকের ইবাদত, ব্যবসায়ীর নামায, দায়ীর দাওয়াত ও তাবলীগ অথবা উক্ত মহিলোার সতিত্ব ও পর্দাকে আমরা জিহাদ নামে আখ্যায়িত করব এটা কি সম্ভব? অসম্ভব! কখনো এগুলোকে জিহাদ বলা যাবে না।

এত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পর্দা-পর্দাই থাকবে, রোযা-রোযা, নামাজ-নামাজ, দাওয়াত-দাওয়াতই থাকবে। এ সকল ব্যক্তিদের এই বরকতময় আমলকে জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা শরীয়তের সাথে বাড়াবাড়ি ও বে-ইনসাফী এবং দ্বীনের মধ্যে বিকৃতিসাধন বলে সাব্যস্ত হবে। যা একজন মুসলমানের জন্য অসহনীয় বিষয়। বরং যার মৃত্যু, ধনোসম্পদ এবং দাওয়াতী মিশন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য সহায়ক হবে সেটাকে আমরা "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" বলব।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর পত্র

এটা আমার ব্যক্তিগত খেয়াল নয়। বরং আমাদের আকাবিরদের আদর্শ এবং শরীয়তের ফয়সালা। সর্বোপরি এটা স্পষ্টরূপে সবার সামনে আসার জন্য শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. এর একটি চিঠি পেশ করছি। এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি হলো এই, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসার এক উস্তাদ আবুল আলা মওদুদীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। হযরত শাইখুল হাদীস রহ. তার ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখলেন যার মধ্যে আবুল আলা মওদুদীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনা সবিস্তারে বর্ননা করেছেন। এই পত্রটি যদিও অনেক দীর্ঘ কিন্তু মওদূদীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য অত্যন্ত উপকারী। যারা পুরো পত্রটি দেখতে চান তারা শাইখুল হাদীস রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হুশিয়ারপূরী রচিত "مودودی اور انکے تحریرات کے متعلق چند مضامین" নামক কিতাবটি পড়ে নিন। বরং আমরা পরামর্শ হলো এই কিতাবটি অবশ্যই পড়া উচিত।

এতে হযরত শাইখুল হাদীস রহ. ইবাদত সম্পর্কে মিস্টার মওদূদী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করে এর উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আপনি নিজেই খেয়াল করুন যে, ইবাদতের মর্মার্থের গুরুত্ব মেনে নেওয়ার পরও যখন সে ইবাদতকে ইবাদত নয় এমন জিনিসের সাথে মিলিয়ে ফেলেন তখন ইবাদতের মর্মার্থের গুরুত্ব জামায়াতের মধ্যে কীভাবে বাকী থাকবে? আমার দৃষ্টিতে এই

বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যখন মানুষের দৃষ্টি থেকে ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র চলে যেতে থাকবে তখন নি:সন্দেহে ইবাদতের গুরুত্বও চলে যেতে থাকবে। এখন লক্ষ্য করুন যে, তিনি [মওদূদী সাহেব] ইবাদতের নতুন ব্যখ্যা কী করেছেন? তিনি লিখেছেন, "ঐ ব্যক্তি ভুল বলে যে বলে, ইবাদত শুধু তাসবীহ ও মুসল্লা এবং মসজিদ ও খানকাহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। নেককার একজন মুমিন ব্যক্তি শুধুমাত্র ঐ সময়ই ইবাদতরত থাকে যখন সে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বার মাসের একমাস রোযা রাখে, বৎসরে একবার যাকাত প্রদান করে এবং সারা জীবনে একবার হজ্ব করে। বরং তার সারাটা জীবন শুধু ইবাদতই ইবাদত যখন সে ব্যবসা বানিজ্যে হারাম ছেড়ে হালাল রুজীর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তখন কি তার এটা ইবাদত হয় না? যখন সে মুআমালাতে যুলুম ও মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোকাবাজি হতে বিরত থেকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ সম্পাদন করে তখন কি এগুলো ইবাদত হবে না?

চূড়ান্ত সত্য এটাই যে, আল্লাহ তা'য়ালার কানুনের পাবন্দী এবং তাঁর শরীয়তের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের যে কাজই করুক তা সারাসরি ইবাদত বলে গণ্য হবে। এমনকি বাজারে ক্রয়-বিক্রয়, পরিবার পরিজনের সাথে আচার-আচরণ এবং নিজের পার্থিব কর্মব্যস্ততায় মনোনিবেশও ইবাদত। এরপর শাইখুল হাদীস রহ. এর মন্তব্য লক্ষ্য করুন, "বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচনাটি অত্যন্ত সুন্দর এবং দ্বীনের গুরুত্ব সৃষ্টিকারী। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন, ইবাদতকে এমন জিনিসের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যা ইবাদত নয়। হাদীস পড়ুয়া সর্বনিম্নস্তরের একজন ছাত্রও এ পার্থক্য নিরুপণ করতে পারে যে, ইবাদত এবং মুআমালাত দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। হাদীস এবং ফিক্বাহের কিতাবসমূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পার্থক্য দ্বারা ভরপুর যে, ইবাদত ও মুআমালাত ভিন্ন দুটি বস্তু।

যদি আল্লাহর বিধি নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় তাহলে এই কাজ দ্বারা ইবাদতের মতো সওয়াব পেয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা আর নি:সন্দেহে সওয়াব পাবেও। এই আজর ও সওয়াবের কারণে নুসূস তথা শরীয়তের নির্দেশমালার কোন কোন জায়গায় ইবাদত শব্দটি রুপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু শুধু আজর ও সওয়াব পাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যে সরাসরি ইবাদতের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে এটা কিভাবে প্রমাণিত হয়?

বিষয়টি এমন যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عن زيد بن خالد الجهني : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال "من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا"

যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন মুজাহিদকে প্রস্তুত করে দিল সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের সাথে ভাল ব্যবহার করল সে যেন নিজেই জিহাদ করল।

-الصحيح لمسلم:٢/١٣٧ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير . رقم الحديث:٤٨٦٥- مسند أحمد-١٦/٦٠ رقم الحديث:٢١٥٧٧، - صحيح ابن حبان-١٠/٤٩٠ ذكر التسوية بين الغازي وبين من خلفه في أهله بخير في الأجر. رقم الحديث:٤٦٣١ ،

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুজাহিদের যুদ্ধ সরঞ্জাম ব্যবস্থা করে দিলো সে যেন নিজেই জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের ভাল-মন্দ খোঁজ খবর রাখলো এবং তাদের সহযোগীতা করলো সেও যেন জিহাদ করলো।

<u>হাদীস বুঝে এমন একজন সাধারণ ব্যক্তি কি এটা মনে করতে পারেন যে, কোন মুজাহিদকে সহযোগীতা করা বা তার পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর নেওয়াই প্রকৃত জিহাদ?</u>

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-"إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ" "নিশ্চই আল্লাহ মুমিনের জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন।"

উক্ত আয়াতে এটা স্পষ্ট, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা এখানে প্রকৃত ক্রয় উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। যেমনটি ইমাম সারাখসী রহ. মাবসূত নামক কিতাবের ২য় খ-রে ২৪৮ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে সে কোন সওয়াবের কাজের উপর রূপক অর্থে ইবাদত শব্দটির ব্যবহার তার শরীয়ত প্রদত্ত মৌলিক বিষয়কে পরিবর্তন করতে পারে না।

"مودودی صاحب اور انکی تحریرات کے متعلق چند اہم مضامین [" صفحہ ۲۱۳-۲۱۵]

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনারা গভীর দৃষ্টিতে শাইখুল হাদীস রহ. এর ইবারতকে বার বার পড়লে এ অধমের অবস্থান বুঝতে আপনাদের মোটেও দেরী লাগবে না। আমার আবদার হলো এই যে, আমার অবস্থানটি মাথায় রেখে শাইখুল হাদীস রহ. এর ইবারতের রেখা টানা অংশটুকু বার বার পড়ুন। আমি এটাই বলেছি যে, কোন দ্বীনি কাজে কষ্ট ও মেহনতের কারণে জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাওয়া অথবা রূপক অর্থে এর উপর শরীয়ত কর্তৃক জিহাদ শব্দ ব্যবহার করা আর এ সমস্ত আমলকে প্রকৃত জিহাদ হিসাবে গণনা করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কে সঠিক আমল ও শুভবুদ্ধি দান কর। আমীন!

দুটি স্তর

এক.

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টিকারীদের দুটি স্তর। এক স্তরের সদস্যরা তো প্রবৃত্তির ক্ষুধার্ত চাহিদার গোলাম, কাপুরুষতার শীর্ষে সমাসীন এবং অকর্মণ্য ও অলস। যারা নিজেরাও জিহাদের নাম শুনে ভয় পায়, অন্যদেরও ভয় দেখায়। এরা জিহাদের নাম শুনে এমন ভয় পায় যেমন শয়তান আযানের শব্দ শুনে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পলায়ন করে। এ সকল লোক ইসলাম এবং মুসলমানদের চরম শত্রম্ন। কুরআনে হাদীসে অপব্যাখ্যাকারী বেদ্বীন ও মুনাফিকদের ঐ গ্রম্নপ যারা ইসলামকে নি:শেষ করার জন্য ইসলামী পোশাক পরিধান করে ছদ্মবেশে মুসলমানদের কাতারে ঢুকে পড়েছে। এরা পারলে কুরআন-হাদীস থেকে জিহাদের আয়াত গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে পরিস্কার করে দিতো। কিন্তু শোকর শত শোকর যে, কুরআন ও হাদীসের শব্দ এবং এর ব্যাখ্যা সংরক্ষণের দায়িত্ব খোদ আল্লাহ তা'য়ালাই নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এদের কামনা এই যে, তাদেরকে ইসলামের হিরো, মুফাক্কিরে ইসলাম, মুদাক্কিকে ইসলাম ইত্যাদি নামে ডাকা হোক। তাদের অসৎ চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলোকে মুসলমানদের জন্য আলোর মিনার সাব্যস্ত করা হোক। যারা জুতার সমতুল্যও নয় তাদেরকে উম্মতের রাহবার মেনে নেওয়া হোক। তাদের ধংসাত্মক দুষ্কর্মগুলোকে তাজদীদি কারনামা তথা সংস্কার ও নবায়নমূলক কৃতিকর্ম হিসাবে স্মরণ করা হোক বরং তাদেরকে জিহাদের নেতা ও রাহবার মেনে নিয়ে মুসলিম বিজয়ীসেনাপতিদের মতো তাদের গলায় মালা পরিয়ে সব জায়গায় ইস্তেকবাল

করা হোক, অভ্যর্থনা জানানো হোক। কিন্তু তাদের এসব কামনা ও কল্পনা পাগলামী বৈ কিছু নয়। এদের ব্যাপারেই বলা যেতে পারে-

"این خیال است و محال است و جنوں"'এটা অসম্ভব কল্পনা আর পাগলামী।'

"لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"- (سورة آل عمران - ١٨٨)

'যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশি হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।' [আল ইমরান: ১১৮]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন যে, ইয়াহুদীরা মাসআলা বলতো, সুদ-ঘুষ গ্রহণ করতো, জেনে বুঝে পয়গম্বার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী এবং সুসংবাদসমূহকে লুকাতো আর এই ভেবে খুশি হতো যে, আমাদের চালাকী কেউ ধরতে পারে না। এমন আশা রাখতো যে, লোকেরা আমাদের প্রশংসা করে বলবে যে, সে অনেক বড় আলেম, দ্বীনদার এবং হক্বের পতাকাবাহী। অন্যদিকে মুনাফিকদের অবস্থাও ছিলো এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন কোন জিহাদের সময় আসতো তখন চুপচাপ ঘরে বসে থাকতো এবং নিজেদের এই কৃতকর্মের উপর এই ভেবে খুশি হতো যে, দেখ, কিভাবে জীবন বাঁচিয়েছি। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ থেকে ফিরে আসতেন তখন অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে মিথ্যা অজুহাত পেশ করে চাইতো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা নিজেদের প্রশংসা করিয়ে নিবে।

এদের সবাইকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের কথাবার্তা দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। প্রথমত এ ধরনের লোক দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত হয়। আর কোন কারণে দুনিয়াতে বেঁচে গেলেও আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোন রাস্তা নেই।

সাবধান! এই আয়াতে যদিও ইয়াহুদী এবং মুনাফিকদের কথা আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু মুসলমানদেরও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, খারাপ কাজ করে খুশি হয়ো না। ভাল কাজ করে অহংকার করো না। আর যে ভাল কাজ করো নি তার উপর প্রশংসা প্রাপ্তির অভিলাষ রেখো না।

[তাফসীরে উসমানী]

এদের এই ভ্রান্ত ফিকির এবং অসদুদ্দেশ্যের উপর মেহনতের পরিনতি এই হয়েছে যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তি মুজাহিদ হয়ে গেছে! যে ব্যক্তি দুই লাইন বক্তৃতা করেছে সে বলছে, আমি মুজাহিদ। যে ট্যাক্সি চালায় সে বলছে, আমিও মুজাহিদ। যে বাচ্চা লালন-পালন করে সে বলছে, এটাও জিহাদ। **বুঝে আসে না, গোটা উম্মত জিহাদে লিপ্ত এরপরেও উম্মতের লাঞ্চনা ও অপদস্থতা দূর হচ্ছে না কেন?** অথচ ইজ্জত-সম্মান তো জিহাদের অনিবার্য ফলাফল। জিহাদ হবে তো সম্মান আসবে। জিহাদ হবে তো খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আজ সবদিকে শুধু মুজাহিদ আর মুজাহিদ। কেউ নিজেকে জিহাদের নিম্নস্তরটিতে নিয়ে যেতে রাজি নয়। এরপরও উম্মত কেন জুলুমের শিকার? মুসলমানদের মস্তকগুলো কেন চুর্ণ-বিচুর্ণ? কুরআন শরীফগুলোকে কেন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে? মসজিদগুলো কেন মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে? বায়তুল মুকাদ্দাস কেন অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের হাতে? হারামাইন শরীফাইনের আশপাশে কেন মার্কিন-ইয়াহুদী সেনারা তাঁবু গেড়ে রেখেছে? মুসলমানরা নিজেদের দেশেও কেন স্বীয় ফয়সালা গ্রহনে স্বাধীন নয়? আসল আলোচনা এই স্তরের লোকদের সাথে নয়। কেননা এরা তো প্রবৃত্তির দাস এবং নফসের গোলাম। এদের বুঝানো আমার কলমের ক্ষমতার উর্ধ্বে। বাস্! আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে তার কুদরাতী পায়ে ললাট ছুঁয়ে [সিজদা করে] দোয়া করি, হে আল্লাহ! সবাইকে সত্যের পথ দেখাও এবং সে পথে চালাও।

দুই.

হ্যাঁ, একটি স্তর এমনও রয়েছে যারা মুখলিছ, দ্বীনের প্রতি মমতাশীল, জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি সুধারণা ও মুহাব্বাত পোষণ করে। যাদের ইখলাছের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করাটাও হয়তো নিজেকে ঈমানহারা করে ফেলার নামান্তর। এ সকল লোক যদিও জিহাদের ময়দান থেকে দূরে; কিন্তু তাঁদের অন্তর সব সময় মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। তাঁদের যদি ইলমী, ইসলাহী এবং দ্বীনি ব্যস্ততা না থাকতো তাহলে নি:সন্দেহে এসকল লোক প্রথম সারির বরং মুজাহিদদের সিপাহসালারের ভূমিকা পালন করতো। তাদের ইলমী এবং ইসলাহী চেষ্টা-প্রচেষ্টাগুলো নি:সন্দেহে ইসলামের প্রতিটি শাখার জন্য খুব জরুরী। খোদ জিহাদ এবং মুজাহিদদের জন্যও উপকারী।

আল্লাহ তা'য়ালা এ সকল হযরতদের ইখলাছ, তাক্বওয়া এবং ইলমী ও ইসলাহী চেষ্টা-সাধনা থেকে আমাকেও পরিপূর্ণ হিসসা দান করেন। আমীন! তাঁদের জুতাগুলো আমার মাথার মুকুট, তাঁদের পদধূলী আমার চোখের সুরমা, তাঁদের দোয়া এবং নেক নজরই পূঁজি-আমার জন্য এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য।

সুতরাং এই ধরণের লেখক ও আহলে ইলম হযরতদের অবস্থানকে ধাক্কা দিয়ে নাকচ করে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের মানসিক হতবুদ্ধিতাকে সামনে এনে দলীল এবং যুক্তির মাধ্যমে পরিস্কার করে দেওয়া জরুরী। আল্লাহর অনুগ্রহে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে স্বীয় অনুগ্রহে এই বিষয়টিকে পরিপূর্ণতায় পৌছানোর তাওফীক দান কর এবং আমাকে আমার মাকসাদে কামিয়াবী দান কর। আমার এই সামান্য মেহনতকে কবুল করে উম্মতে মুসলিমার জন্য উপকারী বানিয়ে দাও। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আমি সর্বপ্রথম নিজের দাবী উত্থাপন করব। এরপর দলীল ও প্রমাণসমূহ পেশ করব। অতপর ধারাবাহিকভাবে আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তারে এর উত্তর প্রদান করব। ইনশাআল্লাহ!

দাবী

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার নাম অথবা প্রত্যেক ঐ আমল যা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধকারী হয় এবং এর দ্বারা জিহাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। চাই তা মুখের দ্বারা হোক কিংবা কলম বা অর্থ দ্বারা। সুতরাং কেউ যদি কলম দিয়ে লেখা লেখী করে এই উদ্দেশ্য যে, এর দ্বারা হক-বাতিলের লড়াইয়ের চিত্র অংকন করবে, যুদ্ধের ময়দানের জন্য মুজাহিদ তৈরী হবে, মুজাহিদদের উৎসাহ প্রদান করা হবে আর কাফেরদের সাহস দমিয়ে দেওয়া হবে, গাজী এবং শহীদের অবস্থা সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত পৌছানো হবে। তাহলে এই কলমের চেষ্টা-প্রচেষ্টাও নি:সন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর সংজ্ঞাভুক্ত হবে। তদ্রম্নপ মুখের ভাষা যদি এ জন্য প্রয়োগ করা হয় যে, এর দ্বারা মুসলিম উম্মাহর অন্তরে আবেগ ও জযবার ঝড় সৃষ্টি করে যুবক শ্রেণীকে ময়দানে জিহাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করা হবে। পদ্য ও গদ্য, কাব্য ও কবিতা, ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদের রক্তকে উষ্ণ করা হবে তাহলে এটাও নি:সন্দেহে জিহাদেরই একটি শাখা। তদ্রম্নপ যদি অর্থের মাধ্যমে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করা হয়, মুজাহিদদের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়, গাজী ও শহীদদের পরিবার-পরিজনের দেখা-শোনা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এটাও জিহাদ বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো, এ সব কিছু আমীরের অনুসরণেই হতে

হবে। রূপক অর্থে এগুলোকে যদিও জিহাদ বলা যেতে পারে; কিন্তু এগুলোকে প্রকৃত জিহাদ গণ্য করা যাবে না। আর যদি কলম দিয়ে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে লিখে যাওয়া হয় এবং মুখের ভাষা উম্মতের ইসলাহ ও রাহনুমায়ীর জন্য ব্যবহার করে যাওয়া হয় অথবা মাদরাসার ভবন নির্মাণ ও উন্নতির জন্য অর্থ প্রদান করা হয় তাহলে এটাকে একটি নেককাজ তো বলা যাবে। আর নি:সন্দেহে এটা নেক কাজই। কিন্তু তই বলে এটাকে কস্মিনকালেও 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা যাবে না। হায় আল্লাহ! আদেরকে সহীহ বুঝ দান কর।

"اللهم ارنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه"

দলীল-১

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً - دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (سورة النساء- ٩٥ -٩٦)

'বসে থাকা মুমিনরা, যারা ওযরগ্রস্থ নয়; আর নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ কখনো এক সমান নয়। নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ তা'য়ালা বসে থাকা লোকদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকা লোকদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

[সূরায়ে নিসা: ৯৫-৯৬]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা দু'ধরনের লোকের আলোচনা করেছেন। এক. "قاعدون" ঘরে বসে থাকা লোক। দুই. "مجاهدون"'জিহাদকারী লোক।' আর এখানে "مجاهدون" কে "قاعدون" এর মোকাবেলায় উল্লেখ করাটা একথার দলীল যে, জিহাদ অর্থ শুধুমাত্র যুদ্ধ করা। কেননা, "قاعدون"এর মধ্যে রয়েছে ঐ সকল লোক যারা দ্বীনের কোন না কোন কাজ করে; কিন্তু জিহাদ করে না। চাই সে তাদরীসের কাজ করুক বা তাসনীফের কাজ করুক, খানকায় আত্মশুদ্ধির

দায়িত্বে নিয়োজিত থাকুক কিংবা নামাজ, রোযার দাওয়াত নিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াক।

এজন্য আমি বিশেষভাবে এসকল হযরতদের কাছে দরখাস্ত করব যারা দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছেন, আর মা-শা-আল্লাহ্! আপনারা অত্যন্ত পূণ্যময় কাজে লিপ্ত আছেন। কিন্তু তারা দাওয়াতী কাজকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বরং এর চেয়ে বড় মর্যাদা দিয়ে থাকেন আর দ্বীনের অন্য কোন কাজ সম্পাদনকারীকে এমনকি মুজাহিদদেরকেও আসল দ্বীনের জন্য মেহনতকারী মনে করেন না। আপনাদের কাছে আমার অনুরুধ, আপনারা এই আয়াতের তাফসীরের জন্য মাওলানা মুহাম্মদ ইহ্তেশামুল হাসান রহ. রচিত "مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج" কিতাবটি অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বপ্রথম আমীর হযরতজী মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর নির্দেশে তিনি এই কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এ পুস্তিকাটি এখন ফাযায়েলে আ'মাল এর অংশ হয়ে আছে।

হযরত মাওলানা ইহ্তেশামুল হাসান রহ. লিখেছেন, যদিও এই আয়াতে জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেরদের মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা যাতে ইসলামের বাণী সুউচ্চ থাকে আর কুফর ও শিরক পরাজিত ও অপদস্ত হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত আজ আমরা যদি এই মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকি তাহলে এই মাকসাদের জন্য যতটুকু চেষ্টা-স্বাধনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এতে কখনোই অবহেলোা করা উচিত নয়। আবার আমাদের এই সামান্য কাজ ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাই আমাদেরকে সামনে অগ্রসর করে দিবে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (سورة العنكبوت:٦٩)

"যে সকল লোক আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা-স্বাধনা করে আমি তাদের জন্য আমার রাস্তাসমূহ খুলে দেই" রেখা টানা বাক্যটি মনোযোগ সহকারে আরো একবার পড়ে নিন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুভবুদ্ধি দান করুন। মাওলানা ইহ্তেশামুল হক রহ. যেখানে জিহাদকে "মহা সৌভাগ্য" আর এই দাওয়াত ও তাবলীগের কাজকে "সামান্য প্রচেষ্টা" বলে আখ্যায়িত করেছেন আর আমরা সেটাকে গোটা দ্বীনের দাওয়াত, আসল কাজ, তারতীবে নবুওয়াত এবং আরো নানা উপাধিতে

ভূষিত করছি। তিনি যেটাকে মহা সৌভাগ্য বলছেন আমরা তা থেকেই পালিয়ে যাচ্ছি। এমনকি অন্যকেও এর কাছে যেতে দিচ্ছি না!

তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ" আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- অন্য একটি বিষয় আমাদের কাছে মাতলূব বা চাওয়া হচ্ছে তা হলো জিহাদ। আর মূলত জিহাদ যদিও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মোকাবেলার নাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জিহাদের মূল উদ্দেশ্য হলো; ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা। এবং খোদায়ী বিধান চালু করা এবং তা প্রয়োগ করা। আর এটাই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

দলীল-২

عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فقلت: "علام تبايعني؟ يا رسول الله! فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وتصلي الصلوات الخمس لوقتها، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله، قلت: يا رسول الله! كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما: الزكاة، والله مالي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فإني رجل جبان ويزعمون أنه من ولى فقد باء بغضب من الله وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها ثم قال: يا بشير! لا صدقة ولا جهاد فبم إذن تدخل الجنة؟ قلت: يا رسول الله! ابسط يدك أبايعك، فبسط يده فبايعته عليهن كلهن".

- كنز العمال: ٣٦٨٦٥ حرف الفاء ، - السنن الكبرى للبيهقى: ٤٠/٩ رقم الحديث:١٧٧٩٦ ، - المستدرك للحاكم:٨٠/٢

'হযরত বশির বিন খাসাসিয়াহ রা. বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য তাঁর খেদমতে হাযির হলোম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কোন্ কোন্ বস্তুর উপর বাইয়াত করাবেন? তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তুমি এ কথার সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'য়ালার বান্দা ও রাসূল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময় মত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, বাইতুল্লাহর হজ্ব করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। আমি বললাম; হে আল্লাহর রাসূল! আমি দুটি কাজ ছাড়া সবকাজ করতে পারবো। একটি হলো যাকাত। কেননা আমার নিকট দশটি উষ্ট্রি রয়েছে। এগুলোর দুধের মাধ্যমেই আমার পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো জিহাদ। কেননা আমি দুর্বল মনের অধিকারী, কাপুরুষ। আর লোকেরা তো বলে, যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি সাথে নিয়ে ফিরে যাবে। আমার ভয় হয় যে, যদি দুশমনদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আর আমি ঘাবড়ে গিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাই তাহলে তো আমি আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে আসবো। রাসূল ﷺ স্বীয় হাত পিছনে টেনে নিলেন এবং হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বললেন, হে বশির! তুমি যাকাত দিবে না আবার জিহাদও করবে না তাহলে কোন আমলের দ্বারা তুমি জান্নাতে যাবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন আমি বাইয়াত হব। অতএব, তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি এই সব আমলের উপর রাসূল ﷺ এর কাছে বাইয়াত হয়ে গেলাম।'

প্রিয় ভাই ও দোস্ত-বুযুর্গ! যদি জিহাদের অর্থ কিতাল তথা যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন কিছু হতো তাহলে বশির বিন খাসাসিয়া রা. কেন বললেন, আমি কাপুরুষ। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসার আশংকা তিনি কেন পেশ করলেন? নাউযুবিল্লাহ! সাহাবী যদি জিহাদের অর্থ না-ই বুঝে থাকেন তাহলে রাসূল ﷺ অবশ্যই বলে দিতেন যে, জিহাদের অর্থ শুধু যুদ্ধ করা নয়! তুমি দ্বীনের অন্য কোন কাজ কর যাতে কষ্ট-ক্লেশ রয়েছে এ সবগুলোই জিহাদ। মুহতারাম দোস্ত! রাসূল ﷺ এবং বশির রা. এর এই আমল এ কথার সাক্ষী যে, জিহাদের অর্থ শুধু কিতাল ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

দলীল-৩

রাসূল ﷺ এর যুগে মদীনা মুনাওয়ারায় যখন "حي على الجهاد"'হাইয়্যা আলাল জিহাদ' বলে জিহাদের প্রতি আহ্বান করা হতো তখন সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মুবারক আমল কি ছিল? তাঁরা কি ধরনের প্রষতী গ্রহণ করতেন? একটু ভালো করে দেখুন। তখন যদি নারী-শিশুসহ সকল সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের অর্থ যুদ্ধ করাই বুঝে থাকেন এবং এই ঘোষণারপর তরবারী ও তীর-কামান নিয়ে রাসূল ﷺ এর খেদমতে দৌড়ে আসতেন তাহলে তো জিহাদের অর্থ শুধুমাত্র যুদ্ধ করাই হতে পারে। অন্যথায় কোন একটি উদাহরণ তো এমন পাওয়া যেতো যে, রাসূল ﷺ এর মুবারক যমানায় যখন "حي على الجهاد"এর ঘোষণা হয়েছে তখন কোন সাহাবী তো দূরের কথা কোন মুনাফেকও একথা বলেনি যে, আমি স্ত্রীর হক আদায়ে লিপ্ত এটাও এক প্রকার জিহাদ। আমার ঈমান তো এখনো পরিপূর্ণ হয়নি; আমি স্বীয় ঈমানের মজবুতির জন্য মুজাহাদা করে যাচ্ছি আর এটাও এক প্রকার জিহাদ। আমি তো মদীনা এবং মদীনার আশ্পাশের লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছি; এটাও জিহাদ। যদি এ ধরনের অপব্যাখ্যা উদহরণ তাঁদের মাঝে পাওয়া না যায় আর আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তাঁদের মাঝে এমন পাওয়া যাবেও না তাহলে আপনাকে মানতেই হবে জিহাদের অর্থ একমাত্র যুদ্ধ করা।

অথচ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল এমন যে, কেউ পয়সা নিয়ে বাজারে গিয়ে বিয়ের প্রয়োজনীয় বাজার-সদাই করার জন্য কিন্তু এমতাবস্থায় "حي على الجهاد"'হাইয়্যা আলাল জিহাদ' এর ঘোষণা শোনামাত্রই সেই পয়সা দিয়ে তার তরবারী ও বর্শা কিনে নিয়েছেন। কেউ রাতের বেলা স্ত্রী সহবাস করার পর ভোরে গোসলের ইচ্ছা করেছেন; কিন্তু জিহাদের ঘোষণা শোনে এ অবস্থাতেই যুদ্ধের ময়দানে ছুটে গিয়েছেন।

দলীল-৪

ফুক্বাহায়ে কেরাম কর্তৃক জিহাদের সংজ্ঞা

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বলেন-

"بذل الجهد في قتال الكفار" (فتح البارى : ٤/٦

'কাফেরদের সাথে লড়াই করতে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করার নাম হচ্ছে জিহাদ।'

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেন-

"الجهاد شرعا بذل المجهود في قتال الكفار" (مرقات المفاتيح)

'কাফেরদের সাথে লড়াই করতে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করার নাম জিহাদ।'

শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা, আয়েশা সিদ্দীকা এবং আবু বকর রা. যুহরী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, মুজাহিদ, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, যায়েদ ইবনে আসলাম, ক্বাতাদাহ, মুকাতিল ইবনে হাইয়্যান এবং অন্যান্য আকাবির হযরত থেকে বর্ণিত যে, জিহাদের অনুমতি প্রদান করে যে আয়াত প্রর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে তা হলো এই-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (سورة الحج - ٣٩)

ঐ সকল লোকদেরকে জিহাদ এবং ক্বিতালের অনুমতি দেওয়া হলো যাদেরকে কাফেররা হত্যা করে। কারণ, তারা বড়ই নির্যাতিত-নিপীড়িত।[১]

সারকথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যশীল বান্দাগণ আল্লাহ দ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাঁর রাস্তায় জীবন কুরবানী করা এবং দু:সাহসীকতা দেখানোর নাম হলো জিহাদ। একটু অগ্রসর হয়ে তিনি আরো বলেন, সবকথার সারমর্ম হলো এটাই যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তার নাম জিহাদ।[২]

---

১. এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিহাদের অনুমতি দেওয়া এবং ক্বিতালের আয়াত নাযিল করা একথার দলীল যে, জিহাদের অর্থ কেবল যুদ্ধ করা।

২. শাইখুত তাফসীর ওয়াল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী রহ. এর এসকল উক্তির পরেও কি অন্য কিছু উদ্দেশ্য নেওয়ার সুযোগ থাকে? সর্বোপরি আরয এই যে, কোন একজন ফক্বীহও এমন অতিবাহিত হননি; যিনি জিহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা কিতালও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু করেছেন।

-লেখক

দলীল-৬

আমি সর্বশেষে ঐ দলিলটি পেশ করব যেটাকে প্রথমেই উল্লেখ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু এটা স্বয়ং ছাহেবে শরীয়ত ও সর্বশেষ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত জিহাদের ব্যাখ্যা। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ব্যাখ্যার পরে অতিরিক্ত অন্য কিছুর কোন অবকাশই বাকী থাকে না। এজন্য এটাকে আলোচ্য বিষয়ের চুড়ান্ত দলিল হিসাবে পেশ করছি।

عن عمرو بن عبسة قال قال رجل يا رسول الله..... "وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه".

-مصنف عبد الرزاق:١٢٧/١١ باب الإيمان والإسلام . رقم الحديث:٢٠١٠٧، - مسند أحمد : ٢٤٢/١٣ رقم الحديث:١٦٩٦٤

হযরত আমর ইবনে আবাসা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের অর্থ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে মুজাহিদের অশ্বকে হত্যা করা হয় এবং মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হয়।

আপনি একটু চিন্তা করুন! এতো স্পষ্টভাবে বলার পরেও কি জিহাদের অর্থ যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে? বরং জিহাদের অর্থে ব্যপকতা প্রদান করে অন্যান্য পূণ্যময় কাজগুলোকে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া জিহাদ আখ্যা দেওয়াটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর অর্থের সাথে বাড়াবাড়ি নয় কি? হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সঠিক বোধশক্তি দান কর। আমীন!

গাযওয়া এবং সারিয়া

গাযওয়াঃ যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন তাকে গাযওয়া বলে।

সারিয়াঃ যে যুদ্ধে রাসূল ﷺ স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেননি; বরং সাহাবায়ে কেরাম রা. কে প্রেরণ করেছেন তাকে সারিয়া বলে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে,

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول "والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل" .

- الصحيح للبخاري :٣٩٢/١ باب تمني الشهادة. رقم الحديث:٢٧٩٧ ، - مصنف عبد الرزاق: ٢٥٤/٥ باب فضل الجهاد. رقم الحديث:٩٥٣٢ - الصحيح لمسلم:١٣٣/٢ باب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ. رقم الحديث:٤٨٢٢

হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূল ﷺ বলতে শুনেছি- কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি এমন কোন মুমিন না থাকতো যাদের কাছে এটা কষ্টকর মনে হয় যে, আমি জিহাদে চলে যাব আর তারা পিছনে রয়ে যাবে। আর আমার নিকট এমন কোন বাহনও নেই যা দিয়ে তাদেরকে আমার সংগে নিয়ে যাব তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে কোন সারিয়া থেকে পিছনে রয়ে যেতাম না। বরং কসম ঐ সত্ত্বার যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার তো মন চায়, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবো। আমাকে আবার জীবিত করা হবে; আবার শহীদ হবো। আবার জীবিত করা হবে; আবার শহীদ হবো। আবার জীবিত করা হবে; আবার শহীদ হবো।

গাযওয়া গুলোর তালিকা

ক্রমিক নং	গাযওয়ার নাম	সন	সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা
১.	গাযওয়ায়ে আবওয়া	সফর ২ হিজরী	৬০ জন মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রা.
২.	গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব	রবিউল আউয়াল বা সানী ২ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩.	গাযওয়ায়ে উশাইরা	জুমাদাল উলা ২ হিজরী	২০০ মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪.	গাযওয়ায়ে সাফওয়ান	২ হিজরী	
৫.	গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা-বদর যুদ্ধ	রমযান ২ হিজরী	৩১৩ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৬.	গাযওয়ায়ে ক্বারক্বারাতুল কাদার	শাওয়াল ২ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
৭.	গাযওয়ায়ে ক্বাইনুকা	২ হিজরী	
৮.	গাযওয়ায়ে সাওয়ীক্ব	জিলহজ্ব ৩ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
৯.	গাযওয়ায়ে গাতফান	১২ই রবিউল আউয়াল ৩ হিজরী	৪৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম

			রা.
১০.	গাযওয়ায়ে নাজরান	রবিউস সানী ৩ হিজরী	৩০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১১.	গাযওয়ায়ে উহুদ	১৫ই শাওয়াল ৩ হিজরী	৭০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১২.	গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ	১৬ই শাওয়াল ৩ হিজরী	উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ৩১৩
১৩.	গাযওয়ায়ে বনু নাযীর	রবিউল আউয়াল ৪ হিজরী	
১৪.	গাযওয়ায়ে যাতুর রিক্বা	জুমাদাল উলা ৪ হিজরী	৪০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৫.	গাযওয়ায়ে বদরে মাওইদ	শাবান ৪ হিজরী	১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৬.	গাযওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল	রবিউল আউয়াল ৫ হিজরী	১০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৭.	গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক্ব	২ই শাবান ৫ হিজরী	
১৮.	গাযওয়ায়ে খনদক্ব	শাউয়াল ৫ হিজরী	৩০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৯.	গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযা	যিলক্বদ ৫ হিজরী	
২০.	গাযওয়ায়ে লিহইয়ান	রবি. আউয়াল ৬ হিজরী	২০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.

২১.	গাযওয়ায়ে ক্বারাদ	রবি. আউয়াল ৬ হিজরী	৫০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২২.	গাযওয়ায়ে খায়বার	মুহার্‌রম ৭ হিজরী	১৪০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৩.	গাযওয়ায়ে সুলেহ হুদাইবিয়া	৬ হিজরী	১৫০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৪.	গাযওয়ায়ে মূতা	জুমাদাল উলা ৮ হিজরী	৩০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.

ফায়েদা: মূতার যুদ্ধকে গাযওয়ার মধ্যে গণনা করা হয় অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর. কয়েকটি কারণ উল্লেখ করে থাকেন। তন্মধ্যে একটি কারণ এই যে, এই যুদ্ধটি আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সরাসরি দেখিয়েছেন এবং মাঝখানের সমস্ত পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি এমনটাই মনে হয়েছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

২৫.	গাযওয়ায়ে ফাতহে মক্কা	রমযান ৮ হিজরী	১০,০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৬.	গাযওয়ায়ে হুনাইন	শাউয়াল ৮ হিজরী	১২,০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৭.	গাযওয়ায়ে ত্বায়েফ	শাউয়াল ৮ হিজরী	১২,০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৮.	গাযওয়ায়ে তাবূক	রজব/শাবান ৯ হিজরী	৩০,০০০ সাহাবায়ে কেরাম রা.

নিম্নে সারিয়া গুলোর তালিকা দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	সারিয়ার নাম	সন	সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা
১.	সারিয়া হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.	রবিউল আউয়াল বা সানী ২ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২.	সারিয়া উবাইদা ইবনে হারেস রা.	শাউয়াল ২ হিজরী	৬০ বা ৮০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩.	সারিয়া সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.	যিলক্বদ ২ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.	১৪ই রবি. আউয়াল ৩ হিজরী	৪ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৫.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	জুমাদাল উখরা ৩ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.	জুমাদাল উখরা ২ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৭.	সারিয়া উমায়ের ইবনে আদী রা.	২৪শে রমযান ২ হিজরী	মাত্র ১জন অন্ধ সাহাবী। এ অভিযানে তিনি একাই ছিলেন
৮.	সারিয়া সালেম ইবনে ওমায়ের রা.	শাউয়াল ২ হিজরী	মাত্র ১জন অন্ধ সাহাবী। এ অভিযানে তিনি একাই ছিলেন

৯.	সারিয়া আবি মাসলামা রা.	মুহাররম ৩ হিজরী	১৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১০.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.	মুহার্‌রম ৩ হিজরী	মাত্র ১জন অন্ধ সাহাবী। এ অভিযানে তিনি একাই ছিলেন
১১.	সারিয়া আছেম ইবনে ছাবেত রা.	সফর ৩ হিজরী	১০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১২.	সারিয়া মুনযির ইবনে আমর আস সাঈদী রা.	সফর ৪ হিজরী	৭০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৩.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.	মুহার্‌রম ৩ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৪.	সারিয়া উকাশা মিহসান রা.	রবি. আউয়াল ৪ হিজরী	৪০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৫.	সারিয়া মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা.	রবিউল আউয়াল বা সানী ৪ হিজরী	১০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৬.	সারিয়া আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রা.	রবি. সানী ৪ হিজরী	৪০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৭.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	রবি. সানী ৪ হিজরী	
১৮.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
১৯.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	৫০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.

২০.	সারিয়া আবু বকর সিদ্দীক রা.	জুমাদাল উখরা ৪ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২১.	সারিয়া আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা.	রজব ৪ হিজরী	৭০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২২.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	৪ হিজরী	
২৩.	সারিয়া আলী রা.	৪ হিজরী	১০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৪.	সারিয়া যায়েদ ইবনে হারেসা রা.	রমযান ৪ হিজরী	
২৫.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা.	রমযান ৪ হিজরী	৫ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.	শাউয়াল ৪ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৭.	সারিয়া কুরয্ ইবনে জাবের ফাহরী রা.	৪ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
২৮.	সারিয়া আমর ইবনে ওমায়ের যমরী রা.	৪ হিজরী	
২৯.	সারিয়া আবান ইবনে সাঈদ রা.	মুহার্‌রম ৭ হিজরী	
৩০.	সারিয়া উমর ইবনে খাত্তাব রা.	শাবান ৭ হিজরী	
৩১.	সারিয়া আবু বকর সিদ্দীক রা.	শাবান ৭ হিজরী	

৩২.	সারিয়া বশির ইবনে সা'দ রা.	শাবান ৭ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৩.	সারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইছী রা.	রমযান ৭ হিজরী	১৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৪.	সারিয়া বশির ইবনে সা'দ রা.	শাউয়াল ৭ হিজরী	৩০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৫.	সারিয়া আখরাম সুলামী রা.	যিলহজ্ব ৭ হিজরী	৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৬.	সারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইছী রা.	৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৭.	সারিয়া গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ আল-লাইছী রা.	সফর ৮ হিজরী	২০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৮.	সারিয়া শুজা' ইবনে ওহাব রা.	রবি. আউয়াল ৮ হিজরী	২৪ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৩৯.	সারিয়া কা'ব ইবনে ওমায়ের রা.	রবিউল আউয়াল ৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪০.	সারিয়া কা'ব ইবনে ওমায়ের রা.	রবিউল আউয়াল ৮ হিজরী	১৫ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.

ফায়েদা: এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন সারিয়া। দ্বিতীয় সারিয়াটিতে হযরত কা'ব রা. ও তাঁর সকল সাথী শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র একজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। তিনিই মদীনায় আগমন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবগত করেছিলেন।

৪১.	সারিয়া আমর ইবনুল আস রা.	জুমাদাল উখরা ৮ হিজরী	৩০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪২.	সারিয়া আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.	রজব ৮ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪৩	সারিয়া আমর ইবনে মুররা আল জুহানী রা.	রজব ৮ হিজরী	
৪৪.	সারিয়া আবু ক্বাতাদা ইবনে হারেছ সুলামী রা.	৮ হিজরী	১৬ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪৫.	সারিয়া আবু ক্বাতাদা ইবনে হারেছ সুলামী রা.	শাবান ৮ হিজরী	৮ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪৬.	সারিয়া উসামা ইবনে যায়েদ রা.	রমযান ৮ হিজরী	
৪৭.	সারিয়া সা'দ ইবনে যায়েদ আলআশহালী রা.	রমযান ৮ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪৮.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.	রমযান ৮ হিজরী	৩০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৪৯.	সারিয়া আমর ইবনে আস রা.	রমযান ৮ হিজরী	
৫০.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.	রমযান ৮ হিজরী	৩৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৫১.	সারিয়া আবু আমের উবায়েদ আল আশআরী রা.	শাউয়াল ৮ হিজরী	
৫২.	সারিয়া তোফায়েল ইবনে উমর ওয়ায়েলী রা.	শাউয়াল ৮ হিজরী	
৫৩.	সারিয়া ক্বায়েছ ইবনে সা'দ রা.	যিলক্বদ ৮ হিজরী	৪০০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৫৪.	সারিয়া খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.	যিলক্বদ ৮ হিজরী	

৫৫.	সারিয়া উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারী রা.	মুহার্‌রম ৯ হিজরী	৫০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৫৬.	সারিয়া আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউসাজাহ রা.	সফর ৯ হিজরী	
৫৭.	সারিয়া কুতবা ইবনে আমের আনসারী রা.	সফর ৯ হিজরী	২০ জন সাহাবায়ে কেরাম রা.
৫৮.	সারিয়া যাহ্হাক ইবনে সুফয়ান ক্বিলাবী রা.	সফর ৯ হিজরী	

জান্নাতী দুলহা ও জাহান্নামের জ্বালানী-ইন্ধন

রাসূল ﷺ এর নবুওতীর সময়কালে সবগুলো যুদ্ধ মিলিয়ে উভয়পক্ষের সর্বমোট সৈন্য মারা গিয়ে মাত্র ১ হাজার ১৮ জন। তন্মধ্যে ২৫৯ [দুইশত উনষাট] জন সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে জান্নাতী হুরদের দুলহা হয়েছেন। আর ৭৫৯ [সাতশত উনষাট] জন কাফের মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে জাহান্নামের চিরস্থায়ী ইন্ধনে পরিণত হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর্‌ যুদ্ধাস্ত্র

রাসূল ﷺ এর নিকট বিভিন্ন সময় যে সমস্ত সমরাস্ত্র বিদ্যমান ছিলো তার বর্ণনা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

তরবারীর নামসমূহ-

১. মাছুর ২. আল আয্‌ব ৩. যুলফিক্বার ৪. আল-ক্বাল্‌ঈ ৫. আল বাত্তার ৬. আল হাত্‌ফ ৭. আল মিখযাম ৮. আররাসূব ৯. আল ক্বাযীব ১০. আছ ছামছামা ১১. আল লাহীফ।

লৌহবর্ম [বুলেট প্রুফ জ্যাকেট]

১. যাতুল ফুযুল ২. যাতুল বিশাহ ৩. যাতুল হাওয়াশী ৪. আস্‌সা'দিয়া ৫. ফিদ্দাহ ৬. আল বাতরা ৭. আলখারীক্ব।

কামানসমূহের নাম

১. আয-যাউরা ২. আর-রাউহা ৩. আস-সাফরা ৪. শাউহাত্ব ৫. আল-কাতুম ৬. আস-সাদাদ।

তুনীর

১. আল-কাফূর ২. আল-জাম্‌উ।

ঢালসমূহের নাম

১. আয্‌যালূক ২. আল ফুতাক ৩. আল মূজিয ৪. আয্‌যাক্বান।

বর্শাসমূহের নাম

১. আল মুছবী ২. আল মুছনী ৩. আল বাইদা ৪. আল আনযাহ ৫. আস্‌সাগা।

শিরস্ত্রান বা লৌহ নির্মিত টুপি-হেলো

১. যাস্‌সাবূগ ২. আল মূশাহ।

রাসূল ﷺ এর রক্ষীবাহিনী

রাসূল ﷺ আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসার সর্বোচ্চ স্তরে সমাসীন হওয়ার পরও পাহারার ব্যবস্থা করতেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী এ সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তাদের থেকে অল্প কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে যাদের এ সৌভাগ্য খুব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়েছে।

১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ২। উমর ফারুক ৩। আলী মুরতাজা ৪। যুবায়ের ইবনে আউয়াম ৫। আব্বাস ৬। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৮। আবু ত্বলহা ৯। বেলাল হাবশী ১০। আবু যর গেফারী ১১। সাআদ ইবনে মুয়ায ১২। হুযাইফা ১৩। আম্মার ১৪। আবু আইয়ুব আনসারী ১৫। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা ১৬। ক্বায়েস ইবনে সা'দ ১৭।

আব্বাস ইবনে বশীর ১৮। আনাস ইবনে মারছাদ ১৯। আবু রাইহানা ২০। যাকওয়ান ইবনে আবদে ক্বায়েস ২১। ইছমত ইবনে মালেক খিতমী ২২। আদরা আসলামী ২৩। মিহজান ইবনে আদরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

লোহা অবতীর্ণের রহস্যময় কথা

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ"

'নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণাদীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও [ন্যায়ের] মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচুর শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' [সূরায়ে হাদীদ:২৫]

"وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ"লোহা তো আল্লাহ তা'য়ালা যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আসমান থেকে নয়। সুতরাং বাস্তবতার দাবী ছিল এমন বলা "وَأَنْشَئْنَا الْحَدِيدَ" বা "وخلقنا الحديد"কিন্তু বলেছেন "وَأَنْزَلْنَا الحرديد" এর হেকমত বা দর্শন হলো এই যে, কিতাবুল্লাহর বাস্তবায়ন ও স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে লোহার কার্যকারীতা ও ভূমিকা এমন যেন এটাও কিতাবুল্লাহর মত আসমান থেকে নাযিলকৃত।

"فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ" লোহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যুদ্ধকে আগে উল্লেখ করা এবং মানুষের উপকারীতাকে পরে উল্লেখ করা একথার দলীল যে, লোহা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে একে অন্যান্য উপকারের জন্যেও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস!! আজ কুফরী শক্তিতো এর উপর আমল করেই যাচ্ছে; কিন্তু মুসলমানরা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি থেকে সম্পূর্ণ গাফেল ও বে-খবর। উল্লেখিত তাফসীরটি তখনই প্রযোজ্য

হবে যখন "مَنَافِعُ لِلنَّاس" দ্বারা লোহার অন্যান্য সরঞ্জামাদি উদ্দেশ্য নেওয়া হবে। যেমন দরজা, আলমারী, পাখা, ট্রেন ইত্যাদি। কিন্তু কাশশাফ গ্রন্থের লেখক বলেন, লোহার মাধ্যমে জিহাদ করা হয় এবং জিহাদের মাধ্যমে ফেতনা নির্মূল হয় ফলে জনগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবন যাপন করে। সুতরাং"مَنَافِعُ لِلنَّاس" এর উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে।

"وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ" আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- আমি দেখব কে লৌহ নির্মিত যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে আল্লাহর দ্বীনের সহযোগীতা করে অর্থাৎ জিহাদের ময়দানে গমন করে এবং এই লোহাকে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। "إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ" নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমতাশীল, মহা পরাক্রমশালী। তিনি নিজেই পারেন দুশমনদের ধ্বংস করতে; কিন্তু জিহাদের হুকুম এজন্য দিয়েছেন যেন মুসলমান এর উপর আমল করে দুনিয়া-আখেরাতের ফায়েদা হাসিল করে।

যুদ্ধাস্ত্র

১. অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষন নেয়ার জন্য পবিত্র কুরআন কুরআন অত্যাবশ্যক এবং ওয়াজিব বলে আখ্যা দিয়েছে।
২. যুদ্ধাস্ত্র কাছে রাখা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত।
৩. যুদ্ধাস্ত্রের সঙ্গে মুহাব্বত মানে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে মুহাব্বত।
৪. যুদ্ধাস্ত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এতই প্রিয় ছিলো যে, তিনি স্বীয় যুদ্ধাস্ত্রের হাতলে রুপা লাগিয়ে রেখেছিলেন।
৫. যুদ্ধাস্ত্রের গুরুত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এত বেশী ছিল যে, তিনি নিজের কাছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্ত্র রেখেছেন।
৬. যুদ্ধাস্ত্র নবী-চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
৭. অস্ত্র মসজিদে আনার আদব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে শিখিয়েছেন।
৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে অস্ত্র ছাড়া কিছুই রেখে যাননি।
৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র হিসাবে সর্বপ্রথম মিনজানীক বানিয়েছেন।
১০. অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার আব্বা-আম্মা তোমার উপর কোরবান হোক।"
১১. যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রান বানানো দাউদ (আ.) এর সুন্নত।
১২. সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্রকে কখনো দেহ থেকে পৃথক করতেন না।

১৩. মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্রের প্রশিক্ষন নিতেন ।
১৪. মসজিদে নববীতে যুদ্ধাস্ত্রের দান-অনুদান জমা করা হয়েছিল ।
১৫. অস্ত্রের জোরে জাযিরাতুল আরবকে কুফর এবং শির্‌ক থেকে পবিত্র করা হয়েছিল।
১৬. যে ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করলো সে যেন নিজেকে আল্লাহ তা'য়ালার হাতে বাইয়াত করে নিলো।
১৭. অস্ত্রের বিনিময়ে অর্জিত গণীমত পবিত্র এবং হালাল।
১৮. অস্ত্র ইসলামের মহত্ব ও দাপট।
১৯. অস্ত্র ইসলামের শক্তি ও ক্ষমতা।
২০. অস্ত্র ইসলামের ইজ্জত ও সম্মান।
২১. অস্ত্রের মাধ্যমে কাফেরদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।
২২. অস্ত্রের মাধ্যমে জুলুম এবং ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল হয়।
২৩. অস্ত্র থেকে অমনোযোগীতা কাফেরদের আন্তরিক চাহিদা।
২৪. অস্ত্র থেকে বিমুখতা কুরআন, সুন্নাহ এবং আমলেসাহাবা থেকে বিমুখতা।
২৫. অস্ত্রের প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ।

সারকথা

অস্ত্রের প্রতি মুহাব্বত মূলত: কুরআনের প্রতি মুহাব্বত, নবীর প্রতি মুহাব্বত এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বতের বাস্তব প্রমাণ। অস্ত্রের দ্বারাই সম্ভব কিতাবুল্লাহর আইন-কানুনের হেফাযত করা এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

ঘোড়া

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- الصحيح للبخاري: ٣٩٩/١ بَاب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رقم الحديث: ٢٨٥٢ ، - صحيح إبن خزيمة: ١٠/٤ باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة . رقم الحديث: ٢٢٥٢ ، - صحيح إبن حبان: ٥٢٤/١٠ باب الخيل ذكر إثبات الخير في ارتباط الخيل في سبيل الله جل وعلا. رقم الحديث: ٤٦٦٨

হযরত ওরওয়া রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-'কেয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে।'

আল্লাহ তা'য়ালার রাস্তায় যুদ্ধকারী মুজাহিদদের ফযীলত অসংক্ষ-অগনিত এবং স্বস্থানে স্বীকৃত।

কিন্তু মুজাহিদের সাথে সম্পর্কিত সাওয়ারী ও বাহনের মর্যাদা শরীয়তে কী পরিমাণ রয়েছে, সেটাও এক নজর দেখে নিই।

১. জিহাদের জন্য ঘোড়া পালনের নির্দেশ কুরআন দিয়েছে।
২. ঘোড়া রাখা রাসূল ﷺ এর সুন্নত।
৩. ঘোড়ার খাদ্য-পানি এমনকি পেশাব-পায়খানাও কিয়ামতের দিন মুজাহিদের আমল নামায় নেকআমলের সাথে মাপা হবে।
৪. ঘোড়ার পায়ের কসম খেয়েছে কুরআন।
৫. ঘোড়ার কপালে কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেওয়া হয়েছে।
৬. ঘোড়া উত্তম বস্তু হওয়ার নিদর্শন স্বয়ং রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন।
৭. জিহাদের জন্য যে ঘরে ঘোড়া থাকে সে ঘর জিনদের আশ্রয় থেকে নিরাপদ থাকে।
৮. ঘোড়ার জন্য খরচ করাকে সদকার সমতুল্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।
৯. রাসূল ﷺ বনু কুরাইযার গণীমতের মাল দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করেছেন।
১০. রাসূল ﷺ বনু নাযীর এর গণীমতের মাল দিয়ে ঘোড়া ক্রয় করেছেন।
১১. রাসূল ﷺ ঘোড়াকে স্ত্রীদের পরে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় বস্তু বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
১২. বদর যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর নিকট দুটি ঘোড়া ছিল।
১৩. বনু কুরাইযা যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর নিকট ছয়টি ঘোড়া ছিলো।
১৪. বনু মুসতালিক যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর নিকট (৩০) ত্রিশটি ঘোড়া ছিলো।
১৫. খায়বার যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর নিকট দুইশত ঘোড়া ছিলো।
১৬. তাবুক যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর নিকট দশ হাজার ঘোড়া ছিলো।
১৭. ঘোড়ায় আরোহী মুজাহিদ পদাতিক মুজাহিদের চেয়ে দ্বিগুণ গণীমত লাভ করে।
১৮. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সত্তেও আজো সারা বিশ্বে সকল যুদ্ধে ঘোড়ার গুরুত্ব অনুধাবন করা হয়।

জিহাদ

১. আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদ সম্পর্কে কুরআন শরীফে চারশরও বেশী আয়াত নাযিল করেছেন।
২. জিহাদ শিরোনামে ইমাম বুখারী রহ. দুইশত একচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৩. জিহাদ শিরোনামে ইমাম মুসলিম রহ. একশত পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৪. জিহাদ শিরোনামে ইমাম আবু দাউদ রহ. একশত ছিয়াত্তরটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৫. জিহাদ শিরোনামে ইমাম তিরমিযী রহ. একশত পনেরটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৬. জিহাদ শিরোনামে ইমাম ইমাম নাসায়ী রহ. আটচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।
৭. জিহাদ শিরোনামে ইমাম ইবনে মাজা রহ. ছিচল্লিশটি পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩]
৮. জিহাদ শিরোনামে ফেক্বাহ্র প্রতিটি কিতাব জিহাদের মাসআলা দ্বারা সুসজ্জিত।
৯. জিহাদ ইবাদত এবং জরুরত উভয়টাই।
১০. জিহাদ পর্যটনও আবার বৈরাগ্যতাও।
১১. জিহাদ মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম আবার ফরযও।
১২. জিহাদ ঈমানের নিদর্শন।
১৩. জিহাদের দ্বারা ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়।
১৪. জিহাদের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।
১৫. জিহাদের দ্বারা আল্লাহর রহমত হাসিল হয়।
১৬. জিহাদের দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
১৭. জিহাদের মাধ্যমে মুহূর্তে মুহূর্তে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় যা জিহাদ ব্যতীত কয়েক বৎসরের রিয়াযত-মুজাহাদার দ্বারা অর্জন হয় না।
১৮. জিহাদের জন্য হযরত সুলাইমান আ. একশত স্ত্রী বানিয়েছিলেন।

---

[৩]এখানে শুধু কুতুবে সিত্তাহর আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে অসংখ্য-অগনিত অধ্যায় রয়েছে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতেও অসংখ্য পরিচ্ছেদ রয়েছে।

১৯. জিহাদের দ্বারা এ উম্মতের ফেরআউন আবু জেহেলো ও রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর সর্ব প্রথম ফেতনা যাকাত অস্বীকৃতি ও ইরতিদাদ তথা ধর্ম ত্যাগ নির্মূল হয়েছে।

২০. জিহাদের দ্বারাই এ উম্মতের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ ফেৎনা দাজ্জাল ধ্বংস হবে।

২১. জিহাদের মাধ্যমে উলামায়ে কেরাম সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দানের দায়িত্ব আদায় করে আম্বিয়া কেরামের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

২২. জিহাদের দ্বারা উলামায়ে কেরাম বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত হন।

২৩. জিহাদের দ্বারা দ্বীন প্রচার প্রসারের পথ সুগম হয়ে থাকে।

২৪. জিহাদের দ্বারা উলামায়ে কেরামের আযমত এবং আমীর-উমারাদের অনুসরণ হয়ে থাকে।

২৫. জিহাদের দ্বারা উত্তম ও শরীয়ত সমর্থিত বিষয়াদির প্রচলন এবং উন্নতি সাধিত হয়। আর মন্দ এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ কার্যকলাপ বন্ধ হয়।

২৬. জিহাদের দ্বারা শরীয়তের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৭. জিহাদের দ্বারা ঈমান, জান, মাল এবং ইজ্জতের হেফাজত হয়।

২৮. জিহাদের দ্বারা কাফেরদের মুসলমানদের কাছে এসে ইসলাম ধর্মকে দেখা এবং বুঝার সুযোগ পায়।

২৯. জিহাদের দ্বারা কাফেরদের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক্ব হয় আর হঠকারী কাফেরদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়।

৩০. জিহাদের দ্বারা ইবাদতখানার সংরক্ষণ হয় যদিও সেটা কাফেরদেরই হোক না কেন।

৩১. জিহাদের দ্বারা পাপাচারী ও ফাসেকরা বেদআত, অন্যায় ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে ফিরে আসে।

৩২. জিহাদের দ্বারা মানুষের স্বভাবজাত হত্যা লণ্ঠনের যে, মনোভাব থাকে সেটা যোগ্যতা ও সঠিক স্থানে ব্যায় হয়।

৩৩. জিহাদের দ্বারা ধন সম্পদের প্রাচুর্য লাভ হয় এবং পরমুখাপেক্ষীতা দূর হয়।

৩৪. জিহাদের দ্বারা গোলাম-বাঁদীর নেয়ামত হাসিল হয়।

৩৫. জিহাদের কারণে ফেরেশতারা আসমান থেকে সহযোগিতা নাযিল করে।

৩৬. জিহাদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কাফেরদের জন্য শাস্তি এবং অপদস্ততা।

৩৭. জিহাদ মুসলমানদের হৃদয়ের আরোগ্যতা এবং অন্তরের আক্রোশ ও ক্রোধ দমনের মাধ্যম।

৩৮. জিহাদ আল্লাহর নুসরাত ও সাহায্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

৩৯. জিহাদের দ্বারা গোটা সৃষ্টিজীব মুসলমানদের অনুগত হয়ে যায়।

৪০. জিহাদে হাত ব্যবহার হয় মুসলমানদের; কিন্তু শক্তি ব্যবহার হয় স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালার।
৪১. জিহাদ আমাদের হেফাযতকারী, আমাদের প্রতিরক্ষাকারী এবং আমাদের দূর্গ।
৪২. জিহাদের কারণে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রও নস্যাৎ হয়ে যায়।
৪৩. জিহাদের দ্বারা জিম্মী কাফেরদেরও জান-মাল, ইজ্জত সংরক্ষিত থাকে।
৪৪. জিহাদের দ্বারা কাপুরুষতা থেকে বেঁচে থাকা যায় এটা পুরুষের জন্য অনেক বড় ক্রুটি।
৪৫. জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা সার্বক্ষণিক ওয়াজিব।
৪৬. কাফেরদের থেকেও জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বৈধ।
৪৭. জিহাদকারী মুসলিম মুজাহিদ যদি যুদ্ধ করতে থাকে তাহলে গাজী আর যদি নিহত হয়ে যায় তাহলে শহীদ।
৪৮. জিহাদে জন সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য শরীয়ত চার বিয়ে করাকে জায়েয করেছে।
৪৯. জিহাদ ছেড়ে দিলে অর্থনৈতিক দূরাবস্থা, ভয়-ভীতি, অনিরাপত্তা, হতাশা এবং নৈরাশ্যতার সৃষ্টি হয়।
৫০. জিহাদ ছেড়ে দিলে মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে আযাব আসে।
৫১. জিহাদ ছেড়ে দিলে দাসত্বের জীবন এবং কাপুরুষতা সুনিশ্চিত হয়ে যায়।
৫২. জিহাদ ছেড়ে দিলে দ্বীনি আহকাম প্রতিষ্ঠার বরকত থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।
৫৩. জিহাদ ছেড়ে দিলে জান-মাল এবং ইজ্জত দুশমনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর হয়ে পড়ে।
৫৪. জিহাদ ছেড়ে দিলে যমীনে ফেতনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
৫৫. যৌক্তিক কারণ ব্যতীত জিহাদ ছেড়ে দিলে ঐ ব্যক্তি ফাসেক হয়ে যায়।
৫৬. জিহাদের মধ্যে অপব্যাখ্যাকারী মুরতাদ ফিল আক্বীদাহ তথা খারাপ আক্বীদা পোষণকারী কাফের হয়ে যায়।
৫৭. জিহাদের মধ্যে তাহরীফকারী তথা অপব্যাখ্যাকারী সঠিক অর্থে বিকৃত সাধনকারী এবং জিহাদকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের।
৫৮. জিহাদ ছেড়ে দিলে অন্তর থেকে কুফুরী এবং পাপাচারের প্রতি ঘৃণা দূর হয়ে যায়।
৫৯. জিহাদ ছেড়ে দিলে মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই বিভিন্ন মুসীবতের সম্মুখীন হয়।
৬০. জিহাদ ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করা মুনাফেকীর উপর মৃত্যুবরণ করার নামান্তর।

মুজাহিদ

১. মুজাহিদ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি।

২. মুজাহিদ যখন যুদ্ধের ময়দানে স্বদম্ভে চলাফেরা করে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা এতে অহংকার গৌরব করেন ।

৩. যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদের একমুহূর্ত অবস্থান একজন আবেদের সত্তর বছর রিয়াবিহীন ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।

৪. মুজাহিদের রাতের বেলা পাহারা দেওয়া হজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

৫. মুজাহিদের একদিন একরাত আর যে মুজাহিদ নয় এমন ব্যক্তির মাসব্যাপী রোজা রাখা এবং রাতের আঁধারে নামায আদায়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

৬. মুজাহিদের পায়ের ধুলি এবং জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না।

৭. মুজাহিদের দিন অতিবাহিত হয় ঘোড়ার পিঠে আর রাত কাটে নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে।

৮. মুজাহিদের ইবাদতের উপর ফেরেশতারাও ঈর্ষা করে।

৯. মুজাহিদ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানাগুলো সংরক্ষণ করে গোটা উম্মতের আজর ও সওয়াব অর্জন করে।

১০. মুজাহিদের জন্য গর্তের কীট-পতঙ্গ, সমুদ্রের মৎসরাজী এবং শূণ্যে উড়ন্ত পাখ-পাখালীও দোয়া করে।

১১. মুজাহিদদের পক্ষে মাজলুমরা দোয়া করে।

১২. মুজাহিদের জন্য রাতের আঁধারে উম্মতের মা, বোন এবং কন্যাসন্তানরা অশ্রু প্রবাহিত করে।

১৩. মুজাহিদের হিম্মত, সংকল্প এবং সুদূর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আসমানও ঈর্ষা করে।

১৪. মুজাহিদের দৃঢ় মনোবল এবং স্থিরতার সামনে পর্বতও গর্দান ঝুকিয়ে দেয় ।

১৫. মুজাহিদের অনুনয় বিনয়ের সামনে যমীনও লজ্জিত হয়ে যায়।

১৬. মুজাহিদ বিভিন্ন মুসীবতের শিকার হয়েও মুচকি হাসে।

১৭. মুজাহিদ সর্বপ্রকার জটিলতা সহাস্য বদনে সমাধান করে থাকে ।

১৮. বীরত্ব এবং বাহাদুরীও মুজাহিদকে সালাম করে।

১৯. মুজাহিদ ধৈর্যশীল হয়ে থাকে।

২০. মুজাহিদ পরিশ্রমী হয়ে থাকে।

২১. মুজাহিদ অল্পেতুষ্ট, বৈরাগ্য এবং অনাড়ম্বরতার অনুপম দৃষ্টান্ত।

২২. মুজাহিদ স্বীয় কাজের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেয় ।
২৩. মুজাহিদ নীরব দাঈ হয়ে থাকেন।
২৪. মুজাহিদের জীবনাচার দ্বীনের নমুনা হয়ে থাকে।
২৫. মুজাহিদের অলংকার হলো তার অস্ত্র।
২৬. মুজাহিদের মূল যুদ্ধাস্ত্র হলো আল্লাহর উপর পূর্ণ ইয়াক্বীন।
২৭. মুজাহিদ অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও স্বীয় আমীরের অনুসরণ করে।
২৮. মুজাহিদ শক্তিশালী হয়েও দুর্বলদের উপর হাত তুলে না।
২৯. মুজাহিদের তাকবীর ধ্বনি কাফেরদের উপর এটম বোম হয়ে পতিত হয়।
৩০. মুজাহিদ মুসলমানের ঈমান, ইজ্জত এবং জান-মালের সংরক্ষক।
৩১. মুজাহিদ জেগে থাকে আর তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে গোটা উম্মত নিশ্চিন্তে ঘুমায়।
৩২. মুজাহিদ নিজের রক্ত ঢেলে দিয়ে উম্মতের রক্ত সংরক্ষণ করে।
৩৩. মুজাহিদ দ্বীন প্রচারের দুয়ার খুলে থাকেন।
৩৪. মুজাহিদদের সহযোগীতার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।
৩৫. মুজাহিদের স্ত্রীদের সম্মান মুসলমানদের কাছে মায়ের মত।
৩৬. মুজাহিদের আওয়াজে হিংস্র প্রাণীরাও জঙ্গল খালি করে দেয়।
৩৭. মুজাহিদের জন্য সৃষ্টিজীবের প্রতিটি জিনিস অনুগত হয়ে যায়।
৩৮. মুজাহিদ আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দা হয়ে থাকেন।
৩৯. মুজাহিদ আল্লাহ তা'য়ালার সত্যিকার প্রেমিক হয়ে থাকেন।
৪০. মুজাহিদ আল্লাহ তা'য়ালার প্রকৃত আনুগত্যশীল হয়ে থাকে।
৪১. মুজাহিদের জান-মালের ক্রেতা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা।
৪২. মুজাহিদের জান-মালের মূল্য জান্নাত।
৪৩. মুজাহিদকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আয়না হুর জান্নাত থেকে যমীনে অবতরণ করে।
৪৪. মুজাহিদের রক্তের প্রথম ফোঁটায় সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
৪৫. মুজাহিদের আত্মা শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই সে জান্নাতে নিজের বাসস্থান দেখে ফেলে।
৪৬. মুজাহিদরা কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'য়ালার আরশের ছায়া পাবে।
৪৭. মুজাহিদের জাগ্রত থাকা, ঘুমানো, পানাহার, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, জীবিত থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা সব ইবাদতই ইবাদত। বরং আবেদের জন্য ঈর্ষার বিষয়।

জিহাদের আদব

১. যখন জিহাদের জন্য বাড়ি থেকে বের হও আল্লাহর নাম নিয়ে বের হও।
২. অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে বের হয়ো না।
৩. পরস্পরে একে অন্যের সাথে ঝগড়া করো না।
৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকে মূল পূঁজি বানাও।
৫. নিজের মুজাহিদ সাথী ভাইদের বেশীবেশী খেদমত করো।
৬. শরীয়তের দণ্ড-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখ।
৭. প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালেও খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতে থাক।
৮. নিজের ক্ষমতার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর ভরসা রাখ।
৯. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চাহিদার বিপরীত হলেও আমীরের নির্দেশ মেনে চলো।
১০. মুকাবেলার সময় দৃঢ়পদ থাকো।
১১. যখন আরোহন করতে থাকবে তখন আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করতে থাকো এবং এই দোয়া পড়ো-

"سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ - وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ"(١٣-١٤)

১২. যখন উঁচু জায়গায় ওঠো তখন আল্লাহর আযমতের প্রতি খেয়াল করে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার পড়ো।
১৩. যখন নিচু ভূমির দিকে অবতরণ করবে তখন নিজের অসহায়ত্ব ও নিচুতা এবং আল্লাহর পবিত্রতার প্রতি খেয়াল করে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলো।
১৪. বিজয়ের উপর গর্ব করো না বরং আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে দাও।
১৫. বিজয় এবং গণীমতের যে মাল অর্জিত হয় তার উপর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। আর যে সমস্ত মুসীবত এবং যাতনার শিকার হও তার উপর ধৈর্য ধারণ করো।
১৬. কুকুর এবং ঘণ্টি সঙ্গে রেখো না। এতে ফেরেশতারা কাফেলার সঙ্গ দেয় না।
১৭. প্রত্যেক যুদ্ধকে জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ মনে করে লড়াই করো।
১৮. শাহাদাতের তামান্না রেখে এর তালাশে শুধু সামনেই এগিয়ে চলো।
১৯. যুদ্ধ যত তীব্রই হোক না কেন কোন ক্রমেই যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যেয়োনা।

২০. জিহাদের সফর থেকে ফিরে আসার সময় তাওহীদের বাণী সম্বলিত দোয়া পড়া সুন্নত। দোয়াটি হলো এই- لا اله الخ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

- السنن الكبرى للنسائي:١٠٣٧٤ ما يقول إذا أوفى على فدفد من الأرض صحيح إبن حبان:٤١٢/٦ رقم الحديث:٢٦٩٥ .

ইক্বদামী-আক্রমনাত্মক জিহাদ কি বৈধ?

সংশয়-১

ইক্বদামী-আক্রমনাত্মক জিহাদ সম্পর্কে একটি আপত্তি করা হয়ে থাকে। আপত্তিটি এই যে, শরীয়ত আমাদেরকে জিহাদের অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এ শর্তে যে, কাফেররা যখন আমাদের উপর আক্রমণ করবে তখন আমরা তা প্রতিহত করব। অন্যথায় অগ্রীম আক্রমনাত্মক হামলা করার অনুমতি নেই। এক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতকে দলীলরূপে পেশ করে থাকে।

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ"

'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ঐ সকল লোকদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে।'

[সূরায়ে বাকারা: ১৯০]

"فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"

'যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও তার বদলা নিয়ে নিতে পার তার বাড়াবাড়ির সমপরিমাণ।'

[সূরায়ে বাকারা: ১৯৪]

"فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ"

'হে নবী! আপনার দায়িত্ব হলো বাণী পৌঁছে দেওয়া আর তার হিসাব গ্রহণ আমার দায়িত্ব।' [সূরায়ে রা'আদ:৪০]

"وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ"

'আর যদি তোমরা চাও শাস্তি দিতে তাহলে যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তোমরাও [কাফেরদের] সে পরিমাণ শাস্তি দাও।'

[সূরায়ে নামাল:১২৬]

সমাধান

উত্তর বুঝার পূর্বে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কুরআনের অনেক আয়াত এবং আহকাম রহিত হয়ে গেছে। যেমন আগেকার যুগে রোজা রাখতে হয়েছে সারাদিন ও প্রায় সারারাত। কিন্তু এখন রোযা হয় শুধু দিনের বেলা। শুরুতে জিহাদের ময়দানে একজন ব্যক্তি দশজন কাফেরের মোকাবেলা করা বাধ্যতামূলক ছিলো। কিন্তু বর্তমানে একজনের দুইজন কাফেরের মোকাবেলা করা জরুরী-ইত্যাদি। কুরআন শরীফেও এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا"

'আমি যদি কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা বিস্মৃত করি তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমতুল্য কোন আয়াত নিয়ে আসি।'

[সূরায়ে বাকারা: ১০৬]

এই রহিত করণ চার প্রকার। এর মধ্যে এক প্রকার হলো এই যে, আয়াতের তেলাওয়াত বাকী থাকবে; কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে যাবে। যাকে "منسوخ الحكم دون التلاوة" বলা হয়। এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর মূল উত্তর লক্ষ্য করুন।

সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস এবং ফকীহ মোল্লা আহমদ জীউন মিরাঠী রহ. রচিত বিশ্ব সমাদৃত গ্রন্থ "تفسيرات أحمدية في بيان الآيات الشرعية" থেকে আমি আপনাকে ঐ সমস্ত আয়াত সম্পর্কে অবগত করব যেগুলোর তেলাওয়াত বাকী আছে; কিন্তু হুকুম রহিত হয়ে গেছে। "منسوخ الحكم دون التلاوة" আর আমি সেগুলো বিভিন্ন কিতাব ঘাটাঘাটি করে অর্জন করেছি।

যেসব আয়াতে শত্রুপক্ষকে ক্ষমা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন-

"فإنما عليك البلاغ" (سورة الرعد: ٤٠)

'নিশ্চই আপনার কাজ শুধু পোঁছে দেয়া।'

অথবা

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (سورة الكافرون: ٦)

আর যেসব আয়াতে আগে বেড়ে প্রথমে হামলা করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন:

"وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (سورة البقرة: ١٩٠)

'[তোমরা আগে বেড়ে আক্রমণ করে] সীমালংঘন করো না। নিশ্চই আল্লাহ সীমালংঘনকরীদের পছন্দ করেন না। এ ধরনের আয়াতগুলো জিহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। জিহাদের আয়াতগুলো হচ্ছে এই-

"وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً"

'তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে।'[সূরায়ে তাওবা: ৩৫]

"فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ"

'যখন হারাম মাসগুলো চলে যাবে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাবে হত্যা করবে।

ইমাম যাহেদ রহ. বলেন, জিহাদের আয়াত দ্বারা প্রায় সত্তরটি আয়াত রহিত হয়ে গেছে।' [সূরায়ে তাওবা: ৫]

ইতকান গ্রন্থ প্রণেতা-

"فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, এই আয়াতের দ্বারা একশত বিশটি আয়াত রহিত হয়ে গেছে।

(তাফসীরাতে আহমাদীয়া।)

এ ধরনের সকল আয়াতের হুকুম যেহেতু রহিত হয়ে গেছে তাই এগুলোকে দলীল বানিয়ে ইক্বদামী-আক্রমনাত্মক জিহাদের অস্বীকার করা মানে শরীয়তের একটি বিধানকে অস্বীকার করা যা কোনভাবেই জায়েয নেই।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ দুই প্রকার। এক প্রকার হলো আত্মরক্ষামূলক যাকে [দিফায়ী] জিহাদ বলা হয়। অর্থাৎ কাফেরদের কোন সম্প্রদায় যখন প্রথমে মুসলমানদের উপর হামলা করবে তখন মুসলমানরা তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য তাদের মোকাবেলা করবে। জিহাদের এই প্রকারকে আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ"

'আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'

[সূরায়ে বাকারা: ১৯০]

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ *الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ"

'যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তারা নির্যাতীত-নিপিড়ীত। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। যাদেরকে তাদের নিজ ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে- 'আমাদের রব একমাত্র আল্লাহ্'। [সূরায়ে হজ্জ:৩৯-৪০]

জিহাদের দ্বিতীয় প্রকারটি হলো 'ইকদামী বা আক্রমনাত্মক জিহাদ' অর্থাৎ যখন কুফুরীর শক্তি, দাপট আস্ফালনে ইসলামের স্বাধীনতার আশংকা দেখা দেয় তখন ইসলাম তার অনুসারীদের এই নির্দেশ দেয় যে, তোমরা ইসলামের দুশমনদের উপর অগ্রীমভাবে হামলা কর। কেননা যখন দুশমনদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার আশংকা দেখা দেয় তখন সতর্কতার দাবী এটাই যে, তোমরা তাদের উপর আক্রমনাত্মক হামলা কর। যেন ইসলাম এবং মুসলমানরা কুফুর শির্ক এর ফিতনা থেকে সংরক্ষিত থাকে এবং কোন প্রকার ভয় ও শংকা ছাড়াই নিরাপদে আল্লাহ তা'য়ালার বিধি-বিধান পালন করতে পারে। কোন আপ শক্তি ও ক্ষমতা যেন তাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে সরিয়ে দিতে না পারে। আর কোন পরাশক্তি যেন আল্লাহর কানুনের প্রচলন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে।

এমন পরিস্থিতির সময় দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী এটাই যে, আশংকা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই তার মূলোৎপাটন করে দেওয়া। যখন বিপদ মাথার উপর পতিত হবে তখনই প্রতিহত করবো এই অপেক্ষায় থাকা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমনিভাবে বাঘ ও সিংহকে হামলা করার পূর্বেই হত্যা করে দেওয়া এবং সাপ ও বিচ্ছুকে দংশন করার পূর্বেই তার মাথা থেঁতলে দেওয়া জুলুম নয় বরং সর্বোচ্চ চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তদ্রুপ কুফুর ও শির্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠার পূর্বেই মূলোৎপাটন করে দেওয়া বিচক্ষণতাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

চোর, ডাকাত এবং হিংস্রপ্রাণী যদি কোন জঙ্গল বা মরুভূমিতে জড়ো হয় তাহলে আকল ও বুদ্ধিমত্তার দাবী এই যে, এরা শহর অভিমূখে যাত্রার পূর্বেই এদেরকে নি:শেষ করে দেওয়া হোক। কারণ, হিংস্র প্রাণীকে আগে বেড়ে হত্যা করে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই ইরশাদ হয়েছে-

"فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ"

'তোমরা যেখানেই মুশরিকদের পাও সেখানেই পাও হত্যা কর।' [সূরায়ে তাওবা: ৫]

"أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا"

'এদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করা হবে এবং হত্যা করে ফেলা হবে।'

[সূরায়ে আহযাব: ৬১]

এই দুই আয়াতের মধ্যে ঐ ধরনের কাফেরই উদ্দেশ্য যাদের উপর ইক্বদামী-আক্রমণাত্মক হামলা পরিচালনা করা হবে।

হিংস্র প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে প্রতিহতের চিন্তা করা অথবা "যখন এ সকল হিংস্রপ্রাণী সম্মিলিতভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করবে তখন আমরা প্রতিহত করবো" এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা করা যে জ্ঞানহীনতা ও নির্বুদ্ধিতা সেকথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

আরো ইরশাদ হয়েছে-

"وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ"

'হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাক যাতে কুফুরীর ফিতনা বাকী না থাকে এবং আল্লাহর দ্বীন চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।'

[সূরায়ে আনফাল: ৩৯]

এই আয়াতের মধ্যেও আক্রমণাত্মক জিহাদই উদ্দেশ্য। এখানে ফিতনা দ্বারা কুফুরীর শক্তিমত্তা ও দাপটের ফিতনা উদ্দেশ্য । আর "وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ"এর দ্বারা দ্বীনের বিজয় ও প্রভাব বিস্তার উদ্দেশ্য। এরই বর্ণনা এসেছে অন্য এক আয়াতে-

"لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ"

'আল্লাহ তার দ্বীনকে অপরাপর ধর্মের ওপর বিজয় করবেন।' [সূরায়ে সা'ফ: ৯]

দ্বীনের যেন এতটুকু বিজয় সুনিশ্চিত হয় যে, কুফুরী শক্তিও দাপটের কারণে পরাস্ত হওয়ার আশংকা যেন না থাকে এবং ইসলাম যেন কুফুরীর ফিতনা ও সর্বপ্রকার আশংকা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

সংশয় -২

কুরআন শরীফে রাসূল ﷺ এর মক্কী জীবনের বর্ণনা, রাসূল ﷺ এর দাওয়াত ও তাবলীগ, মক্কার কাফের-মুশরিক কর্তৃক প্রদত্ত কষ্ট-ক্লেশ ও নির্যতন এবং এর উপর রাসূল ﷺ এর সবর ও ধৈর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা এই-

"فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" (سورة الفرقان-٥٢)

উক্ত আয়াতে রাসূল ﷺ এর দাওয়াত ও তাবলীগকে শুধু জিহাদই নয়; বরং বড় জিহাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ এতে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোন বিষয় নেই। বরং এটাতো ঐ সময়ের কথা যখন আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষনা করেছেন-

"كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ" (سورة النساء-٧٧)

"তোমরা নিজেদের হাতগুলোকে গুটিয়ে রাখো" এই সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ যদি শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহের নাম হয়ে থাকে তাহলে কুরআন শরীফ দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে কেন জিহাদ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছে? এর দ্বারা বুঝা যায় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করাটাও একপ্রকার জিহাদ।

সমাধান-১

উক্ত আয়াতে "جَاهِدْ" শব্দের অর্থ হলো কাফেরদের কাছে তাবলীগ করার ক্ষেত্রে খুব চেষ্টা করো, অক্লান্ত পরিশ্রম করো, মেহনত করো। আর এই মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত ও আহ্বান করাকেই জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কেননা আরবী ভাষায় কষ্ট ও মেহনত রয়েছে এমন প্রত্যেক কাজকেই

জিহাদ বলা হয়। চাই এটা কোন মন্দ কাজের ক্ষেত্রে হোক বা ভাল কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন একটা বিষয়কে জিহাদ নাম দেওয়ার কারণে সেটা শরীয়তের ফরয বিধান 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। বরং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সমতুল্য হওয়ার প্রশ্নও আসে না।

সমাধান-২

যে কোন কাজের জন্য জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করাটাই যদি 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' হওয়ার দলীল হয় তা তাহলে সুরায়ে লুকমান এর আয়াত সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যাতে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন যে, আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করে এবং আমার ও নিজের পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

"وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا"

তোমাদের পিতা-মাতা যদি অনেক [জিহাদ] চেষ্টা করে যে, তোমরা আমার সাথে শিরক কর তাহলে তাদের এ কথা কখনো মানবে না। [সূরায়ে লুকমান:১৫]

এখন লক্ষ্য করুন! উক্ত আয়াতে কুফুর ও শিরকের দিকে পিতা-মাতার দাওয়াত দেওয়াকে জিহাদ শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখন যদি কেউ বলে কুফুর ও শিরকীর দিকে দাওয়াত দেওয়াটাও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ! তাহলে আপনি তাকে কী বলবেন? নি:সন্দেহে আপনি তাকে এটাই বলবেন যে, এখানে জিহাদ শব্দটি-শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পারিভাষিক অর্থ বা শরীয়ত প্রদত্ত অর্থে নয়। আর আমাদের আলোচনা তো জিহাদের শরীয়তপ্রদত্ত অর্থ নিয়ে। শাব্দিক অর্থ নিয়ে নয়। সুতরাং আপনার প্রশ্ন অবান্তর।

সমাধান-৩

একথার উপর গোটা উম্মত একমত যে, 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' একটি ফরয বিধান যা মদীনায় নাযিল হয়েছে আর "وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا" মক্কী আয়াতের বিধান। সুতরাং যদি এই আয়াত দ্বারা জিহাদের শরীয়ত প্রদত্ত অর্থও উদ্দেশ্য

নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর বিধান মক্কায় নাযিল হয়েছে। অথচ কোন আলেম এমনটি বলেন না। অতএব মেনে নিতে হবে যে, এই আয়াত দ্বারা পারিভাষিক জিহাদ ও শরীয়তের বিধান জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ উদ্দেশ্য নয় বরং স্বাভাবিক চেষ্টা করা উদ্দেশ্য। আর আরবী ভাষায় চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও মেহনতকে জিহাদ বলা হয়। কিন্তু জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ তথা শরয়ী জিহাদ এক জিনিস আর আভিধানিক অর্থের জিহাদ ভিন্ন জিনিস।

সমাধান-৪

আরবী ভাষায় "صلاة"অর্থ হলো "تحريك الإليتين" নিতম্ব তথা শরীরের পিছনের অংশকে নাড়াচাড়া দেওয়া। আর "صلاة" কখনো রহমত ও শান্তি প্রেরণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আরবী ভাষায় সওম এর অর্থ হলো বিরত থাকা। আর হজ্ব অর্থ হলো ইচ্ছা করা। চাই ভাল কাজের হোক বা মন্দ কাজের। এখন যদি কোন ব্যক্তি এটা বলে যে, আমি তো সকালে উঠেই আমার নিতম্বকে নাড়াচাড়া দেই এবং রহমতের দোয়াও করি। সুতরাং এটাই আমার নামায। কারণ, আরবী ভাষায় এটাকেও নামায বলে।

কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমি এক ঘন্টা-আধ ঘন্টার জন্য পানাহার করা বা কথা বলা থেকে বিরত থাকব তাহলে আমার রোযা হয়ে যাবে এখন আর সারাদিন ক্ষুধর্ত ও পিপাসার্ত থাকা কিংবা পরম প্রিয় স্ত্রী থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, আরবী ভাষায় শুধু বিরত থাকাকেই রোযা বলা হয়।

অথবা কেউ যদি বলে যে, আমি বাইতুল্লাহ শরীফে যাওয়ার ইচ্ছা করে নিয়েছি। সুতরাং আমার হজ্জ হয়েগেছে; এখন লাখ-লাখ টাকা খরচ করার আর বাড়ী ঘর ছেড়ে তীব্র গরমে সফরের কষ্ট সহ্য করার। কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আরবী ভাষায় শুধু ইচ্ছা করাকেই হজ্ব বলা হয়। তাহলে এই ভয়ংকর নব্য গবেষককে এই বলে; জবাব দিতে হবে; বাবা! আরবী ভাষার দ্বারা শরয়ী পরিভাষা নির্ধারণ হয় না; বরং এটাতো শরীয়ত প্রণেতা আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্ধারিত। ভাষাকে পূঁজি করে শরীয়তের আমলের অবয়ব স্বরুপকে বিকৃত করা যায় না।

হ্যা! শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মাঝে মুনাসাবাত ও সামঞ্জস্যতা থাকে এটা ভিন্ন কথা। এজন্য আমি বলি, কুরআন ও হাদীসে কোন আমলের উপর জিহাদ

শব্দ ব্যবহার দ্বারা ঐ আমলকে শরয়ী ও পারিভাষিক জিহাদ আখ্যা দেওয়া ধর্মহীনতা, স্বল্পজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ বোধশক্তির পরিচায়ক। আমার অনুরোধ হলো, বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমার এ কিতাবের ভূমিকায় শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. এর লেখাটি আরো একবার অধ্যয়ন করুন।

সংশয়-৩

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْس الْمَصِيْرُ [سورة التحريم-٩]

এ আয়াতে কারীমায় جَاهِدْ শব্দটি এসেছে। এর দ্বারা ক্বিতালের অর্থ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ, আয়াতের নির্দেশ হলো মুনাফিকদের সাথে জিহাদ কর আর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও মুনাফিকদের সাথে স্বশস্ত্র জিহাদ করেননি। তাই যদি আয়াতে جاهد কে قتل এর অর্থে নেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা এমন একটা হুকুম উদ্দেশ্য হবে যে, স্বয়ং রাসূল ﷺও তার উপর আমল করেননি। নাউযুবিল্লাহ!!

সমাধান-১

আমরা বলব, অত্র আয়াতে "جَاهِدْ" অর্থ হলো"قَاتِلْ" লড়াই করুন। এর একাধিক দলীল রয়েছেঃ-

প্রথম দলীলঃ এ আয়াতটি কুরআনের দুই জায়গায় এসেছে। এক. সূরা তাওবায়। আর এটি হলো মাদানী সূরা। এতে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও জিহাদের বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুই. সূরা তাহরীমে। এটিও মাদানী সূরা। আর জিহাদের হুকুম মদীনায় যাওয়ার পরেই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে جَاهِدْ শব্দ দ্বারা যুদ্ধ-জিহাদ উদ্দেশ্য নেয়াতে কোন সমস্যা নেই।

দ্বিতীয় দলীল ঃ

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,"وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ"অর্থাৎ কাফের ও মুনাফিকদের উপর কঠোরতা করুন। কঠোরতা শুধু জিহাদের মধ্যেই হতে পারে। কারণ,

দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ হলো নমনীয়তা। ইরশাদ হচ্ছে-

"قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ"[سورة يوسف-١٠٨]

"ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"[سورة النحل-١٢٥]

"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة فصلت -٣٤]

দাওয়াত সংক্রান্ত এই তিনটি আয়াতের সারমর্ম হলো, আপনি এই কাফেরদেরকে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং উত্তম উপদেশবাণী শুনিয়ে আপনার রবের প্রতি আহবান করুন।

তৃতীয় দলীলঃ

প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে-

"وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ"[سورة التوبة-٧٣]

'তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম'। অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা কর। আর তাদেরকে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দাও। এ অংশ থেকে বুঝা যায় যে, আয়াতটি জিহাদ সংক্রান্ত; তাবলীগ সম্পর্কিত নয়। কারণ, দাওয়াত ও তাবলীগ সম্বলিত আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি এমন হয়না। বরং সেগুলোর শেষে হিদায়েতের প্রতি উৎসাহ প্রদানমূলক বা কুফুরীর প্রতি অসন্তোষজ্ঞাপনমূলক কোন কথা থাকে। কিন্তু এখানে তো এমন কথাই বলা হয়েছে যার সম্পর্ক হলো মৃত্যুর সাথে। আর জাহান্নাম তো মৃত্যুর পরেই আসবে। তাই আমরা বুঝতে পারি আয়াতের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর, তাদেরকে হত্যা কর। এভাবে তাদের আপন ঠিকানা জাহান্নামে পৌঁছে দাও।

দলীলের সমর্থনেঃ [সমাধান-২]

আমাদের এ আয়াতের সমর্থনে শাইখুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী রহ. এর অনুবাদ পেশ করা যেতে পারে। তাফসীরে উসমানীতে এ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, "হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করুন এবং তাদের উপর কঠোরতা করুন। তাদের ঠিকানা তো জাহন্নাম। আর তা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

সমাধান-৩

এ আয়াতে দুইটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক. কতল-হত্যা করা। দুই. কঠোরতা করা। তা আবার দুই প্রকার লোকের বিরুদ্ধে। কাফের ও মুনাফিক। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, প্রকাশ্য কাফের যারা তাদের বিরুদ্ধে কিতাল-যুদ্ধ করা হবে আর গোপন কাফের তথা মুনাফিক যারা তাদের উপর কঠোরতা করা হবে।

হে নবী আপনি চালান অবিরাম,

কাফের-মুনাফিকের সাথে সশস্ত্র সংগ্রাম।

তাদের উপর হন সবচে কঠোর;

দোযখের আযাব বড়ই নিঠুর।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, আয়াতের উদ্দেশ্য যদি যুদ্ধ-জিহাদ হয়ে থাকে তাহলে মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা হলো না কেন? তার জবাব হলো, মুনাফিক তো তাকেই বলা হয় যার কুফুরীটা প্রকাশ্য নয়। ভিতরে ভিতরে কুফুরী করে আর বাহিরে ঈমান প্রকাশ করে। তার বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করা হবে? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তো খুব কঠিন ব্যাপার।

আলেমগণ সুস্পষ্ট করে একথা বলেছেন যে, নববী যুগে যেহেতু ওহীর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে জানিয়ে দেয়া হত (কারা মুনাফিক) কিন্তু আভ্যন্তরীন কুফুরীর ব্যাপারে আমাদের কারো ফতোয়া দেয়ার অধিকার নেই। যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজের ভিতরে কুফুরী প্রকাশ করে তাহলে সে তো আর মুনাফিক থাকল না বরং সুস্পষ্ট কাফের হয়ে গেল।

কিন্তু এখনো একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাসূল ﷺ মুনাফিকদের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাদের সাথে জিহাদ তথা কিতাল করেননি কেন? তার জবাব হলো, মুনাফিক তো সেই হয় যার অন্তরে থাকে কুফুরী আর মুখে প্রকাশ করে ইসলাম। যার কারণে মানুষ তাকে মুসলমান মনে করে। সুতরাং রাসূল ﷺ যদি মুনাফিকদের কতল করেন তবে লোকেরা রাসূল ﷺ এর বিরুদ্ধে আপত্তি তুলবে যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজেই নিজের লোকদের হত্যা করছেন। এক্ষেত্রে নববী যুগের একটি ঘটনা দেখুন-

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সফরে মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলেছিল যে, মুহাজিররা আমাদের উপর প্রাধান্য পেয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ মদীনায় পৌঁছে সম্মানিত লোকেরা অসম্মানিত [মুহাম্মদ ও তার সাহাবী] লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। রাসূল ﷺ এ বিষয়ে অবগত হলেন। হযরত ওমর রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তখন রাসূল ﷺ ইরশাদ করলেন- ওমর! এমনটা করো না। লোকেরা বাস্তব অবস্থা না জানার কারণে বলাবলি করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ নিজের সাথীদেরকে হত্যা করে। [বুখারী-কিতাবুত তাফসীর]

এখন দেখার বিষয় হলো, রাসূল ﷺ এ কথা বলেননি যে, মুনাফিকদের হত্যা করা যাবে না। বরং এক বিশেষ কারণে হত্যা করেননি। যেহেতু রাসূল ﷺ মুনাফিকদের হত্যা করাকে পছন্দ করেছেন; কিন্তু কোন কারণ বশত: হত্যা না করাটা একথার প্রমাণ বহন করে যে, মূলত মুনাফিকদের হত্যা করাও জায়েয। এবং তা রীতিমত সুন্নত।

উদাহরণঃ

রাসূল ﷺ খন্দক যুদ্ধে উয়াইনা ইবনে হিস্ন ফাযারীকে মদীনার অর্ধেক খেজুর দিয়ে সন্ধি করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সা'দ ইবনে মুআয ও সা'দ ইবনে উবাদা রা. এর সাথে পরামর্শ করার পর রাসূল ﷺ এই ইচ্ছা মূলতবী করে দিয়েছেন। [ইবনে হিশাম]

এই ঘটনাটি একটি স্বতন্ত্র মাসআলা হয়ে গেছে, যদি কোন কারণ বশত: কাফেরদেরকে মাল দিয়ে সন্ধি করতে হয় তবে সেটা জায়েয আছে।

এমনিভাবে রাসূল ﷺ পায়জামা ব্যবহার করেননি। কিন্তু পছন্দ করেছেন। তাই তা ব্যবহার করাও সুন্নত হয়ে গেছে।

রাসূল ﷺ মুহাররমের দশ তারিখে রোযা রেখেছেন। কিন্তু এ কথাও বলেছেন যে, যদি আগামী বছর আমি জীবিত থাকি তাহলে আরো একটি রোযা বৃদ্ধি করে রাখব। তাই এখন নয় বা এগার তারিখে রোযা রাখা সুন্নত হয়ে গেছে।

সুতরাং এসব আলোচনার পর পরিপূর্ণ নির্ভরতার সাথে বলা যায় যে, মুনাফিকদেরকে হত্যা করাও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত।

আর সন্দেহাতীতভাবে একথা বলা যায় যে, আয়াতের মধ্যে جَاهِدِ শব্দ দ্বারা একমাত্র যুদ্ধ-জিহাদ উদ্দেশ্য; শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ নয়।

সংশয় -৪

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ"[سورة العنكبوت-٦٩]

যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।

এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে প্রকাশ্যভাবে দ্বীনের মেহনতকে জিহাদ বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, জিহাদের অর্থ শুধু কিতাল-সশস্ত্র যুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দ্বীনের জন্য যে কোন মেহনতকেই জিহাদ বলা যায়। আয়াতের মর্মবানী থেকে এমনটিই বুঝা যায়।

সমাধান- ১

এটা সূরা আনকাবূতের আয়াত। এ সূরাটি যদিও মক্কী কিন্তু এ আয়াতটি মাদানী। যারা মোটামুটি তাফসীর বিষয়ে ধারণা রাখেন তাদের জানা থাকার কথা মক্কী সূরায় মাদানী আয়াত এবং এর বিপরীত হওয়া একটি সাধারণ ব্যাপার। বাস্তব ব্যাপারটি যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। কেননা খোদার পথে কিতালকারীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথ খুব দ্রুত খুলে দেয়া হয়।

আর যদি এই আয়াতটি মক্কী হয় তাহলে এর অর্থও সুস্পষ্ট, যে বা যারা আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অন্তরগুলো আলোকিত করে দেন। তারা দ্রুততার সাথে আল্লাহর নৈকট্যের স্তরগুলো অতিক্রম করে ফেলেন। আমরা তো আগেই বলে এসেছি যে, আরবী ভাষায় সব ধরনের মেহনত বুঝানোর জন্য জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু এর দ্বারা পারিভাষিক জিহাদের ব্যাপকতা কিভাবে প্রমাণিত হয়?

সমাধান -২

"جاهد يجاهد"টা "فاعل يفاعل"এর ওযনে। এর মাসদার দুই রকম হয়ে থাকে,"مفاعلة" ও فعال। অত্র আয়াতে যে"جاهدوا" বলা হয়েছে সেটা"مجاهدة"থেকে এসেছে;"جهاد" থেকে নয়। আমাদের আলোচনা হলো"جهاد" [জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ] নিয়ে; مجاهدة নিয়ে নয়। তাই এই আয়াত পাঠ করে কোন ধরনের সংশয় সৃষ্টি হবার প্রশ্নই থাকে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এখানে "جاهدوا" যে "مجاهدة"থেকে এসেছে তার প্রমাণ কি? এর জন্য তাফসীরে উসমানী দেখা যেতে পারে। এতে শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এ আয়াতের অধীনে লিখেন-

"যেসব লোক আল্লাহর জন্য কষ্ট স্বীকার করে ও মেহনত বরদাশত করে এবং বহুবিধ মোজাহাদায় নিজেকে মাশগুল রাখে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এক বিশেষ নূর দান করেন এবং সন্তুষ্টির পথসমূহ প্রদর্শন করেন। মেহনত-মোজাহাদার ময়দানে সে যত অগ্রসর হতে থাকে খোদা প্রদত্ত সেই নূর ও নৈকট্যের স্তরসমূহেও প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। দেখতে দেখতে তার সামনে দ্বীনের জটিল থেকে জটিলতর বিষয়ের এত সহজ সমাধান প্রকাশ পেতে থাকে যা অন্যদের কল্পনায়ও আসে না।

কবির ভাষায়ঃ-

কষ্টের পাহাড় মাড়িয়ে বন্ধু চলছ তুমি ধীরে

জান-মাল সব খোদার পথে ত্যাগ-কোরবানী করে।

তবু কেন ফের আসবে না তার দয়ার জোয়ার ভাই

পাবে তুমি প্রতি কদমে রাহনুমা বলে যাই।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে কুরআনে কারীম বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন !!

সংশয় -৫

সূরা আল-আদীয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোড়ার পায়ের শপথ করেছেন। কিন্তু এ ফযীলত জিহাদ ও মুজাহিদদের ঘোড়ার ব্যাপারে নয়। কারণ, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর হুকুম তো মদীনায় এসেছে। আর এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কী সূরায় বর্ণিত ফযীলত মাদানী হুকুমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কিভাবে সম্ভব?

সমাধান -১

এ সূরাটি মক্কী না মাদানী তা নিয়ে মুফাস্সিরীনদের মাঝে মতনৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন মক্কী, কেউ বলেন মাদানী। উভয় অভিমত অনুযায়ী আমরাও সংশয়ের নিরসন করবো।

তাফসীর-১

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা বিন আবি-রাবাহ রা. এর মতে সূরাটি মক্কী।

[তাফসীরে কুরতুবী]

এ সূরার বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝা যায় এতে যুদ্ধে ব্যবহৃত ঘোড়ার নামে শপথ করা হয়েছে। চাই সে যুদ্ধ ইসলামী জিহাদ হোক বা সাধারণ যুদ্ধ হোক।

এখানে আরেকটি কথা বুঝানো উদ্দেশ্য তা হলো, অবুঝ প্রাণী একটি ঘোড়া সামান্য ঘাস-পানি পেয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করে। মালিকের সামান্য ইশারায় তুমুল যুদ্ধের বিভীষিকাময় মুহূর্তেও সামনে এগিয়ে যায়। গুলিবৃষ্টির মাঝে বুক টান করে প্রভূর প্রতি অগ্রসর হয়। প্রভূকে বাঁচাবার জন্য আপন জান পর্যন্ত লুটিয়ে দেয়।

সুতরাং হে মানব! তুমি তো তোমার প্রকৃত মালিকের এতটা গুণগ্রাহী নও; একটা ঘোড়া তার সাময়িক মালিকের জন্য যতটা গুণগ্রাহী হয়ে থাকে। তুমি তো ওফাদারীতে একটি প্রাণীর থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছো। সারকথা হচ্ছে, নিন্দা জ্ঞাপন ও উৎসাহ প্রধানের মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বানানো।

আপনার তাফসীর অনুযায়ী উক্ত সূরাটির জিহাদ ও মুজাহিদীনদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই ঠিক আছে। তবে কুরআনের প্রতিটি সূরা প্রতিটি আয়াতে জিহাদ ও মুজাহিদীনদের ফযীলত থাকতে হবে এমনটা তো জরুরী নয়।

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের ন্যায় শরীয়তের অন্যান্য আমল যেমন: শোকর, সবর, সাহসীকতা, বদান্যতা, সততা ও লজ্জাশীলতা ইত্যাদি গুনাবলীর কথা কুরআন বর্ণনা করেছে। কিন্তু সব জায়গায় সবকিছু থাকতে হবে এটাতো জরুরী নয়।

সুতরাং এই সূরাটি মুজাহিদদের ব্যাপারে অবতীর্ণ না হলেও এতে মুজাহিদদের মর্যাদায় কোন কমতি আসবে না। কারণ, মুজাহিদদের শান-মর্যাদা আপন জায়গায় স্বীকৃত। তাঁদের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

সমাধান -২

হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আনাস রা. এবং ইমাম মালেক ও কাতাদা রহ. এর মতে আয়াতটি মাদানী।

[তাফসীরে কুরতুবী]

তাফসীর -২

এ আয়াতে যুদ্ধঘোড়া নয়; বরং মুজাহিদদের ঘোড়ারই শপথ করা হয়েছে। হযরত শাহ আব্দুল কাদের রহ. তাফসীরে মুজিহুল কুরআনের টিকায় লেখেন- "এটা জিহাদে ব্যবহৃত ঘোড়ারই শপথ। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের জান দেবার জন্য উপস্থিত হবার চাইতে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কি আছে!"

"إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ"[سورة العاديات-٦]

এই আয়াতের অধীনে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. তাফসীরে উসমানীতে লিখেন-

"মুজাহিদ অশ্বারোহীগণ আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার ক্ষেত্রে অন্যদের আদর্শ হয়ে থাকে। আর যারা আল্লাহর দানকৃত শক্তিকে তার পথে খরচ করে না তারা নিকৃষ্টতম অকৃতজ্ঞ ও অযোগ্য।

"وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ"[سورة العاديات-٧]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও বলেন, মুজাহিদ নেতৃবর্গ ও তাদের অশ্বগুলোর সামনে সবসময় দায়িত্ব এবং কৃতজ্ঞতাবোধ দৃশ্যমান থাকে। তারা কখনো নির্লজ্জ পলায়ন করে না।

সারকথা:

এই সূরাকে মক্কী ঘোষণা করে মুজাহিদদের ফজিলত নিয়ে অযথা পেরেশান হবার কোন কারণ নেই। কেননা আসলাফের কেউ কেউ একে মক্কী বলেছেন আবার অনেকে একে মাদানীও বলেছেন।

অযথা এটাকে মাদানী সূরা ঘোষণা করে মুজাহিদদের ফযীলত বিশ্লেষণ করাও ঠিক নয়। কারণ, কেউ কেউ তাকে মাদানী বলেছেন আবার কেউ মক্কীও বলেছেন। সুতরাং বাড়াবাড়ি করে লাভ কী?

আদেশ-নিষেধ অধ্যায়

সামনের কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন থেকে আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত উল্লেখ করা হবে। এজন্য আমি সমীচীন মনে করছি উসূলে ফিক্বাহের আলোকে আমর-নাহীর সংজ্ঞা উল্লেখ করে দিব। যাতে আগত আপত্তি ও তার জবাবসমূহ বুঝতে সহজ হয়। প্রিয় পাঠক! আশা করি আগত প্রশ্নগুলোর আগে এই অধ্যায়টি মনোযোগের সাথে পড়ে নিবেন।

আমর :

আরবী ভাষায় আমর হলো,"قول القائل لغيره إفعل"কোন ব্যক্তি কাউকে এ কথা বলা যে, 'তুমি এই কাজটি কর।' চাই সে আদেশটি নমনীয়তার সাথে হোক বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।

শরীয়তের পরিভাষায় আমর বলা হয় " تصرف إلزام الفعل على الغير" 'কারো জন্য কোন কাজ করাকে আবশ্যক করে দেওয়া।'[উসূলুস্‌শাশী]

আবার কেউ এই সংজ্ঞাও দিয়েছেন যে, " قول القائل لغيره إفعل على سبيل الإستعلاء" 'শক্তি এবং দাপটের সাথে কাউকে একথা বলা যে, তুমি এই কাজটি কর।'

নাহী:

আরবী ভাষায় নাহী অর্থ المنع নিষেধ করা। আর পরিভাষায় নাহী বলা হয়, কোন ব্যক্তিকে নিজের চেয়ে ছোট ও নগণ্য মনে করে কোন কাজ না করার আদেশ করা।

আবার কেউ এই সংজ্ঞাও করেছেন যে, শক্তি ও ক্ষমতা বলে কাউকে এই আদেশ করা যে, তুমি অমুক কাজটি করো না।

সারকথা

আমর-নাহীর সংজ্ঞার সারাংশ এই দাঁড়ায় যে, কাউকে কোন কাজ করার বা না করার আদেশ দেয়া। তবে শর্ত হলো যাকে আদেশ দেয়া হয়েছে তার উপর আদেশ দাতার কর্তৃত্ব থাকতে হবে।

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি এমন কাউকে কোন কাজ করা বা না করার আদেশ করে যার উপর তার কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই তাহলে তা আদেশ হবে না। বরং অনুরোধ হবে।

উল্লিখিত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আমর-নাহী সম্মলিত আয়াত ও হাদীসের উপর আমল তখনই কার্যত হবে যখন ক্ষমতা থাকবে। যেমনটা ইতিপূর্বে আফগানিস্তানে ইসলামী শাসনামলে দেখা গেছে। আফগানিস্তানে হযরত আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর রহ. যখন আদেশ করতেন যে, নামাজের সময় সবধরনের দোকানপাট বন্ধ থাকবে, সবাই জামাতের সাথে নামাজে শরীক হবে, মহিলোগণ পর্দা করবে ইত্যাদি। এসব বিষয়কে আদেশ বলে।

অথবা তিনি যখন নিষেধ করতেন কেউ দাঁড়ি মুন্ডাবে না, ঘরে টিভি, ভিসিআর, ডিস লাগাবে না। কোন প্রাণীর ছবি আঁকবে না তখন তার আদেশ অমান্য করা কারো পক্ষে সম্ভব? না, সম্ভব না। কারণ, এখানে শক্তি আছে। শাসন ক্ষমতা আছে। অমান্য করলে শাস্তি হবে। এসব বিষয়কে নিষেধ বলে।

এ ভিত্তিতেই মুসলমানদের বাদশাকে আমীরুল মুমিনীন বলা হয়। কেননা তিনি আদেশ দেন। মুষ্টিময় কিছু লোক অথবা কয়েক শত লোকের নেতৃত্ব দানকারীকেও শরীয়তে আমীর বলা হয়। আমীরের কথা মানা জরুরী। যেহেতু অন্যদের উপর তাঁর এক ধরনের কর্তৃত্ব আছে সে কারণে তাঁর কোন কিছু করার আদেশকে আমর আর না করার আদেশকে নাহী বলা হয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পিছনে উল্লিখিত আলোচনাকে সামনে রেখে ইন্‌শাআল্লাহ্ পাঠকের জন্য এই ফায়সালা করা খুব সহজ হয়ে যাবে যে, বর্তমানে অথবা প্রত্যেক যুগে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধদাতা কারা ছিলেন? কোন শ্রেণীর লোকেরা একাজের উপযুক্ত ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই ফরয বিধান কারা আদায় করছেন?

একটি অনুরোধ

এতদ্বসত্ত্বেও আমার অনুরোধ হলো যদি আমর-নাহীর প্রকৃত অর্থের উপর আমল করা দুষ্করই হয় তবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করার জন্য চেষ্টা তো করা দরকার। নয়তো কমপক্ষে এতটুকু করা দরকার যে, দ্বীনের মেহনতের স্বার্থে আমরা নিজের আবেদন-নিবেদন এবং উদাত্ত আহ্বানকে আমর বলবো না। কেননা যখন আমরা স্বাধারণ মেহনত ও তারগীব-তারহীবকেই আমর-নাহী বলতে শুরু করবো তখন উম্মত প্রকৃত আমর-নাহীর উপর আমল করার চেষ্টাই ছেড়ে দিবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে দ্বীন বুঝা এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৬

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"[سورة آل عمران-١٠٤]

তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।

[তাফসীরে উসমানী]

এই আয়াতে কারীমা থেকে কিছু লোকের এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, মুজাহিদীনরা এই আয়াতের ধারক-বাহক নয়। তারা আয়াত মোতাবেক আমল করে না। কেননা এই আয়াতে রয়েছে-এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহবান করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে কিন্তু মুজাহিদরাতো দাওয়াতের মেহনত করে না, সৎকাজের আদেশ দেয় না, অসৎকাজে বাধা প্রদান করে না।

সমাধান -১

এই আপত্তির বাস্তবতা একটি ধোকা ব্যতীত কিছুই নয়। কেননা এই আয়াতে কারীমায় আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা তিনটি কাজ করবে-এক. কল্যাণের পথে আহবান করবে। দুই. সৎকাজের আদেশ করবে। তিন. অসৎকাজে বাধা দিবে।

"يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"

এখন আমরা এই তিনটি কাজের একটি জরীপ করবো।

এক."يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ" 'তারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে।' কল্যাণ দুই প্রকার

এক. পরিপূর্ণ কল্যাণ।দুই. অপরিপূর্ণ কল্যাণ।

পরিপূর্ণ কল্যাণ বলে যাতে পরিপূর্ণ দ্বীন শামিল থাকে। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি। আর অপরিপূর্ণ কল্যাণ হলো- যাতে পরিপূর্ণ দ্বীন থাকে না। বরং কিছু কাজের ঘাটতি থাকে। দেখুন, যারা এমন আমলের দাওয়াত দেয় যাতে জিহাদ নেই তারা অসম্পূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত দেয়। শুধু জিহাদ ব্যতীত অন্যান্য আমলের উপর আমল করা মানে অসম্পূর্ণ কল্যাণের উপর আমল করা।

আর যারা জিহাদের দাওয়াত দেয় তারা পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেয়। কেননা তার মধ্যে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি রয়েছে। জিহাদ তো আছেই। অনেক হাদীসে স্বয়ং জিহাদকেই পরিপূর্ণ দ্বীন বলা হয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنابالبقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهحتى ترجعوا إلى دينكم."

- سنن أبي داوود :٤٩٠/٢ باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:٣٤٦٢ - مسند أحمد:١١٤/٥ رقم الحديث:٥٥٦٢

'যখন তোমরা সুদী কারবার করবে এবং গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে, [পশু পালনে ব্যস্ত হয়ে যাবে] চাষাবাদ নিয়ে পরিতুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন তোমাদের উপর আল্লাহ তা'য়ালা লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যে যাবৎ তোমরা তোমাদের দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে সেই লাঞ্ছনা থেকে তোমাদের মুক্ত করাহবেন না।'

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হজরত খলীল আহমাদ সাহারানপূরী রহ. বজলূল মাজহুদ শরহু আবী-দাউদে বলেন, এখানে দ্বীনের দ্বারা উদ্দেশ্য জিহাদ। অর্থাৎ যে পর্যন্ত তোমরা জিহাদের দিকে ফিরে না আসবে; কখনো লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এখন একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, জিহাদের সাথে দাওয়াত দেওয়া পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত নাকি জিহাদ রেখে দাওয়াত দেওয়া পরিপূর্ণ কল্যাণের প্রতি দাওয়াত?

জিহাদের আমল জিন্দা হলে অন্যান্য সকল আমলও জিন্দা হয়। আর জিহাদের আমল খতম হয়ে গেলে অন্য সকল আমলও খতম হয়ে যায়। সুতরাং জিহাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার অর্থ অন্যান্য সকল আমলের প্রতি দাওয়াত দেওয়া। জিহাদের প্রতি দাওয়াত দেওয়া মানে প্রকৃত কল্যাণের প্রতি আহবান করা ।

দুই.

"يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ" 'তারা সৎ কাজের আদেশ দিবে।' এবিষয়টি ভালোভাবে বুঝার জন্য আমর এর অধ্যায়টি দেখে নিন যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তাহলে আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবেন, জিহাদ ব্যতীত সৎকাজের আদেশ সম্ভব নয়। কেননা সৎকাজের আদেশ তো শক্তি ব্যতীত হতেই পারে না। আর শক্তি জিহাদ ব্যতীত অর্জিতও হতে পারে না। সৎকাজের আদেশতো মুজাহিদীনরাই করে থাকে। অন্য কেউ নয়। অন্য কারো পক্ষে করাও সম্ভব নয়।

তিন.

"يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" 'অসৎকাজে বাধা দিবে।' এবিষয়টি বুঝার জন্য নাহী অধ্যায়টি দেখুন! তাহলে আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারবেন যে, জিহাদ ব্যতীত অসৎকাজে বাধা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ, অসৎকাজে বাধা দেয়ার জন্য শক্তির প্রয়োজন। আর জিহাদ ছাড়া শক্তি অর্জন হয় না। সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, জিহাদী শক্তি ছাড়া অসৎ কাজেও বাধা দেয়া যায় না। এজন্য প্রকৃত অর্থে অসৎকাজে বাধা দেয়ার কাজ মুজাহিদরাই করে থাকেন।

মুখের ভাষায় উৎসাহ দেওয়া বড়ই সহজ কথা

অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে দেখ কেমন জটিলতা।

অন্যায় প্রতিরোধে জেনে রেখ তাই

শক্তি ও দাপটের বিকল্প কিছু নাই।

ব্যাখ্যাঃ

যারা নিজেদেরকে এই আয়াতের সঠিক ধারক-বাহক মনে করেন তারাও সবরকমের অসৎ কাজে বাধা প্রদান করেন না। কারণ, তারাই বলেন যদি আমরা

সবরকমের অসৎকাজে বাধা প্রদান করি তাহলে লোকেরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে। কেননা খারাপ কাজ তাদের প্রিয় ও আকর্ষণীয় বস্তু। আর যখন প্রিয় বস্তু থেকে তাদের বাধা দেয়া হবে তখন তারা আমাদের কথা কিভাবে শুনবে? আর যখন কথা না শুনবে তখন তারা দ্বীনের পথে কিভাবে আসবে?

এমন ব্যক্তিদের জন্য হযরত মুফতী রশীদ আহমদ রহ. এর একটি ওয়াজ চয়ন করে বর্ণনা করছি। অনুগ্রহ করে রশীদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ. এই বাণীটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন।

তিনি বলেন, তাবলীগের জন্য জিহাদ এত বেশী জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ যা ব্যতীত তাবলীগই সম্ভব নয়। যারা ধারণা করে যে, "তাবলীগ শুধু মৌখিক আমল; এটা জিহাদ ব্যতীত সম্পাদন করা সম্ভব।" তারা তাবলীগের অর্থ বুঝতে তিনটি ভুলের ভিতরে নিমজ্জিত।

এক. কিছু ইবাদতের তাবলীগ করে তারা মনে করে যে, তাবলীগের হক আদায় হয়ে গেছে। অথচ প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি একথা বুঝেন যে, পরিপূর্ণ তাবলীগতো তখনই হবে যখন পূর্ণ ইসলামের তাবলীগ হবে। শুধু নামাজ অথবা অতিরিক্ত দু'তিনটি আহকামের তাবলীগকে পূর্ণ দ্বীনের তাবলীগ বলা যায় না।

ইসলামের আহকাম ও বিধি-বিধানের চারটি শাখা রয়েছে।

এক. আক্বীদা-বিশ্বাস। **দুই.** ইবাদত। **তিন.** মুআমালা। **চার.** হুদুদ-ক্বিসাস। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চারটি বিষয়ে পরিপূর্ণ তাবলীগ না করবেন আপনি তাবলীগের কাজ থেকে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারবেন না। ইসলামে যেমন ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত আহকাম রয়েছে তেমনি মুআমালাত তথা যে সকল বিষয়ে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত যেমন বিবাহ, তালাক, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া নেয়া, কৃষিকাজ, চাকরী ইত্যাদি বিষয়েও আহকাম রয়েছে। কুরআন হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যভিচারীকে কি শাস্তি দিতে হবে, চোরকে কি শাস্তি দিতে হবে এবং ডাকাতকে কি শাস্তি দিতে হবে তাও সবিস্তারে বর্ণিত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বিধি-বিধানের তাবলীগ না করবেন সেটাকে ইসলামের পরিপূর্ণ তাবলীগ বলা যাবে না।

দুই.

তারা শুধু মৌখিক তাবলীগকে যথেষ্ট মনে করে। তারা ধারনা করে যদি এটা জারী থাকে তাহলে জীবনাচার পরিপূর্ণভাবে সংশোধন হয়ে যাবে এবং সকল কাজে মুসলমানদের এই জীবনাচার দেখে বিধর্মীরাও ইসলামে প্রবেশ করবে। শরয়ী শাস্তির বিধান কার্যকর করার কোন প্রয়োজন নেই; বরং কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদেরও কোন প্রয়োজন নেই। অথচ দাওয়াত ও তাবলীগ একটি শরয়ী পরিভাষা। যার বিস্তারিত আলোচনা হলো, যদি খেতাব কাফেরদের প্রতি হয়ে থাকে তবে শুধু তাদের কাছে ইসলাম পেশ করার দ্বারা দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ হবে না। বরং যে ইসলাম কবুল করবে সে আমাদের ভাই। আর যে ইসলাম কবুল করবে না তাকে ইসলামী হুকুমত কবুল করার দাওয়াত দেয়া হবে অর্থাৎ রাষ্ট্র হবে ইসলামের আর কাফেররা জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত হয়ে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রও তাদের জান ও মালের হেফাজত করবে। যদি তারা ইসলামী হুকুমতকে সমর্থন না করে তখন তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ চলবে যতক্ষণ তারা ইসলাম অথবা ইসলামী রাষ্ট্র কবুল না করে।

ইসলাম জোরপূর্বক কাফেরদেরকে মুসলমান বানানোর শিক্ষা দেয় না। কিন্তু আল্লাহর যমীনে কাফেরের রাজত্ব করার অনুমতিও দেয় না।

তিন.

তাদের ধারনা শুধু ভাল কাজের আদেশ দাও খারাপ কাজে বাধা দিও না। খারাপ কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিটে যাবে। যেমন অন্ধকার দূর করতে হলে ছোট একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দাও। অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। তেমনি ভাল কাজের আদেশ দাও তাহলে খারাপ কাজ দূর হয়ে যাবে। এর প্রয়োজন নেই যে, ডান্ডা দিয়ে পিটানোর কোন প্রয়োজন হবে না। বাহ্যিক ভাবে মূর্খদের এই প্রমাণ অনেক মজবুত মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই ধারনা সম্পূর্নই ভ্রান্ত। এবং এই ভ্রান্ত মতবাদটিই দুনিয়াতে পাপাচার, অশ্লীলতা, গর্হিতকাজ বিস্তার লাভ করার অন্যতম কারণ। বিবেক ও শরয়ী প্রমাণ এর জীবন্ত সাক্ষী।

কুরআন ও হাদীসে যেখানেই সৎকাজের আদেশ এর হুকুম দেয়া হয়েছে সাথে সাথে অসৎকাজে বাধা দেওয়ার হুকুম ও দেয়া হয়েছে। যদি অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন না থাকে, শুধু সৎকাজের আদেশ দেয়াই যথেষ্ট হয়ে থাকে তাহলে নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল ﷺ এর কাছে এই দর্শন কি বুঝে আসেনি যে, সৎকাজের আদেশ দিলেই সকল খারাপ কাজ আপনা আপনিই মিটে যায়। উপরন্তু এটাও অবাস্তব হয়ে পড়বে যে, উম্মতের উলামায়ে কেরাম যারা সামর্থ থাকা অবস্থায় অসৎকাজে বাধা দেয়ার তিনটি স্তর নির্ণয় করেছেন-হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা-অসৎ কাজে বাধা দেয়াকে ফরয ও ওয়াজিব বলেছেন। মনে হয় তারাও শরীয়তের বিধানও মেযাজ সম্পর্কে অবগত নন। নাউযুবিল্লাহ!

বিবেক-বুদ্ধি ও বাস্তবতার আলোকে এর গুরুত্ব অনেক সুস্পষ্ট। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের আত্মিক চাহিদা ও গুনাহের প্রতি টান রয়েছে। ভাল কাজে যতই দাওয়াত দেওয়া হোক অসৎকাজে বাধা দেয়ার উপর আমল না করা হলে সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও খারাপী মিটানো সম্ভব নয়।

এখন তো এর থেকেও বড় সংবাদ শুনা যায় যে, মানুষদেরকে দ্বীনদার বানানোর জন্য এবং তাদেরকে তরবিয়ত দিয়ে কাছে আনার জন্য তাদের সাথে বিদআত ও গুনাহের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করা শুধু জায়েযই নয়; বরং এটাকে অত্যাবশ্যক মনে করা হয়। এটা দ্বীনের স্পষ্ট তাহরীফ। লোকদেরকে নিজেদের সাথে জান্নাতী আমলে শরীক করার পরিবর্তে তাদের জাহান্নামী কর্মকান্ডে শরীক হয়ে জাহান্নামের সওদা তৈরী করছে। বড়ই জুলুমের কথা যে, এ কাজকে তারা শুধু জায়েয নয়; বরং সওয়াবের কাজ এবং নবুওয়তের মেজাঝ ও দ্বীনের তাবলীগ মনে করতে শুরু করেছে। যদি বাস্তবতা এমন হয় যেমন শুনা যাচ্ছে তাহলে তার ঈমান নেই।

একটি মূলনীতি খুব ভালবাবে মনে রাখবেন। এবং অন্যের কাছে পৌছে দিবেন। মূলনীতিটি হলো এই-لا يقام الدين بهدمه দ্বীনের বিধান লংঘণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

দ্বীন-বিরোধীরা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ তা'য়ালা, পূর্ববর্তী নবীগণ, রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, উলামায়ে কেরামের চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত হলো কুফুরও শিরক এবং অপরাধ থেকে সমাজকে পবিত্র করতে হলে এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয় করতে হলে শুধু মৌখিক তাবলীগই যথেষ্ট নয়। যতদিন পর্যন্ত

কিতাল এর মাধ্যমে কাফেরদের বড় বড় রাষ্ট্রের শান-শাওকাত চুরমার করা না হবে যেমন সাহাবায়ে কেরাম রোম পারস্য চুরমার করে দিয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত সাধারণ কাফেররা ইসলামের সত্যতা নিয়ে ভালভাবে চিন্তা ফিকির করবে না। তাদের সুর নরম হবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে এই বাস্তবতা বোঝার তাওফীক দান করুন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহনের তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

আমারদের আবেদন ঃ

হযরত রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রহ. এর ইলমী দিক নির্দেশনার পরে আরজ করছি, শরীয়তের বিধান ও মাসাইল শুধু দৃষ্টান্ত বা প্রমাণ বিহীন যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না এবং পরিবর্তিনও হয় না। যদি এমন প্রবাদ-প্রবচনের দ্বারাই কাজ হত তাহলে দেখুন, রাফেজী লেংটা ফকিররাও দাবী করে যে, প্রকৃত সাইয়্যেদ তো আমরাই। যখন বলা হয় অনেক সুন্নিও তো সাইয়েদ হওয়ার দাবী করে তখন তারা এই প্রবাদ বাণী দিয়ে তা প্রত্যাখান করেঃ কাঠের হাড়ীতে যেমন ভাত হয় না; কোন সুন্নিও তেমন সাইয়্যেদ হয় না।

এ বিষয়ে আমার ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা স্মরণ হয়েছে। যখন আমি জামিয়া ইমদাদিয়া ফয়যাবাদে পড়ি এবং সমবয়সী বন্ধুদের সাথে এর আলোচনা করি তখন আমার এক বন্ধু মাওলানা সাঈদ আহমদ [তিনি এখন জামিয়া ইমদাদিয়ার শিক্ষক-মাশাআল্লাহ! অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন এবং নেককার ব্যক্তিত। দোয়া করি, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দ্বারা দ্বীনের খুব কাজ নিন, আমীন!] একটি ছন্দ বলে উঠলেন,

পানির যদি চেরাগ হতো; শিয়ারাও সাইয়্যেদ হতো!

একইভাবে কমিউনিষ্টদের মধ্যে যারা আপন বোন ও মেয়েকে কামভাব পূর্ণ করার উপযুক্ত মনে করে -নাউযুবিল্লাহ! তারা দলীল দেয়, যখন ঘরের মধ্যে সেবফল পাওয়া যায় তখন বাজার থেকে কিনে আনার কি প্রয়োজন? সর্বশেষ আপন বোন এবং অপরের বোনের মাঝে কী পার্থক্য? চাচাতো বোন এবং আপন বোনের দাদা তো একই এবং একই রক্ত। যখন একই দাদার ছেলে অর্থাৎ চাচার মেয়েকে বিবাহ করা যায়েজ তখন আপন পিতার মেয়েকে বিবাহ করা যায়েজ

নয় কেন? এই দলীলের উপর ভিত্তি করে খৃষ্টানদের কাছে চাচাতো বোন বিবাহ করা হারাম। আমি শুধু দুটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছি। এ থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন, যদি শুধু দৃষ্টান্ত দ্বারা কাজ চলতো তাহলে কথা কোন পর্যন্ত গড়াতো?

কিন্তু আমি এই দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ করতে চাই। প্রিয় ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মোমবাতি জ্বালালে অন্ধকার আপনা আপনি দূর হয়ে যায়, তবে এটা তখনই সম্ভব যখন মোমবাতির প্রজ্জ্বলন অব্যহত থাকবে। যেমনিভাবে সাধারণ একটি মোমবাতি অনেক বড় অন্ধকারকে দূর করতে পারে তেমনি অনেক বড় মোমবাতিকেও সাধারণ একটি বাতাস নিভিয়ে দিতে পারে। এই শরীয়তকে একটি আবদ্ধ কামরার অন্ধকার দূর করার জন্য মোমবাতি হিসাবে পাঠানো হয়নি। বরং গোটা পৃথিবীর জল-স্থল, লোকালয়, মরু সব জায়গার অন্ধকারকে দূর করার জন্য সূর্য এবং কুফুর ও শিরকের তুফানকে প্রতিহত করার জন্য লৌহপিন্ড, কুসংস্কার ও রুসুমাতের অন্ধকারের মুকাবেলার জন্য বেগবান বাতাস এবং অশ্লীলতা ও খারাপীর সয়লাবকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য চাটান বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

পবিত্র শরীয়তকে ছোট ছোট উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে প্রজোজ্বল শরীয়তকে অপদস্ত করো না।**অন্যের ঈমানের ফিকিরে নিজের ঈমানকে বরবাদ করো না**। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে শরীয়তের উপর আমল করার এবং যথাযথভাবে তাবলীগ করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৭

আজকাল ব্যাপকভাবে কিছু লোক 'খাইরুল উম্মত' হওয়ার ব্যাখ্যা করে বলে যে, মানুষদের দ্বীনের দিকে ডাকো, নামাজ এবং রোজার কথা বলো। এ ভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে যে, ফযীলত শুনিয়ে দ্বীনের দিকে আনাই এই উম্মতের কাজ এবং এ কারণেই এই উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ!

সুতরাং যে সমস্ত আলেম মসজিদের মিম্বরে খুৎবা দিচ্ছেন, মাদ্রাসায় দরস প্রদান করছেন অথবা মাশায়েখগণ যারা খানকায় বসে "আল্লাহ" "আল্লাহ" যিকির করছেন এবং যে সকল মুজাহিদ ময়দানে জিহাদ করে নিজেদের জান

কুরবানী দিচ্ছেন তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারছেন না বলেই, অযথা নিজেদের সময় নষ্ট করছেন। এজন্য তাদেরও উচিৎ তারা যেন দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে কাজ হচ্ছে তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রেষ্ঠ উম্মতের বাস্তব রূপ ধারণ করেন।

সমাধান -১

উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এর 'খাইরুল উম্মত' হওয়ার যেসব কারণ ব্যপকভাবে প্রচার হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং কুরআন-সুন্নাহকে সঠিকভাবে না বুঝার প্রমাণ বহন করে। যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে কাজ চলছে তাকে দ্বীনের রূহ এবং মূল কাজ মনে করে বাকী সব কিছু অনর্থক ভাবা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি এবং দ্বীনকে হেয় করার নামান্তর। এর দ্বারা উলামা, মাশায়েখ এবং মুজাহিদদের হেয়-পতিপন্ন করার পথ খুলে যায়। এটা বড় ধরনের বে-আদবী এবং মাহরূমীর আলামত। সুতরাং বাড়াবাড়ি না করে আসুন! এবার দেখি এ উম্মত 'খায়রুল উম্মত' হওয়ার কারণগুলো একটু পর্যাবেলোচনা করি।

খায়রুল উম্মত হওয়ার কারণ

পাকিস্তানের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী শফী রহ.

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (سورة آل عمران- ١١٠)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেন:-

এ আয়াতে মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা মানবজাতির উপকারার্থে অস্তিত্বে এসেছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানবজাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টা করা আর এটা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী উম্মতের তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর মাধ্যমে সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকজে নিষেধ করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণতা লাভ করেছে। সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী উম্মদের দায়িত্বেও ন্যাস্ত ছিল; কিন্তু বিগত অনেক উম্মতের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই সৎকাজের আদেশ ও

অসৎকাজের নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। উম্মতে মুহাম্মদী বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সর্ব রকমের জিহাদের এবং রাষ্ট্রিয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আঈন কর্যকর করাও এর অন্তরর্ভূক্ত। (মাআ'রেফুল কোরআন২/১৫০)

সৃষ্টির সেরা জীব তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি

তলোয়ারের শক্তি এদের দাওয়াতী কাজের সাথী।

সমাধান -২

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسএর তাফসীরে হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা শুনুন-

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ

-الصحيح البخارى: ٦٥٤/٢ بَاب { كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس }

মানুষের মধ্যে মানুষের কল্যাণে তোমরা সর্বোত্তম। কারণ, তোমরা কাফেরদের গর্দানে শিকল পড়িয়ে বন্ধি করে নিয়ে আসো। অবশেষে তারা [তোমাদের চারিত্রগুনের ছোঁয়া পেয়ে] ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

সমাধান -৩

এই আয়াতে কারিমায় "أمر بالمعروف" ও "نهي عن المنكر" আলোচনা করা হয়েছে। অথচ প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যে أمر بالمعروف" ও نهي عن المنكر নেই। বরং তারা যা কিছু করছে সবই আবেদন ও অনুরোধ মাত্র। এগুলোকে আয়াতের সুনিশ্চিত অর্থ সাব্যস্ত করা সংশয় থেকে মুক্ত নয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আদেষ-নিষেধ অধ্যায়।

সমাধান -৪

এ আয়াতের দুটি অংশ রয়েছে। এক. সৎকাজের আদেশ।

দুই. অসৎকাজের নিষেধ।

দাওয়াত ও তাবলীগের লোকরা শুধুমাত্র এক অংশের উপর আমল করে অর্থাৎ শুধু সৎকাজের আদেশ করে। কিন্তু তাদের এ কাজকে যদি সৎকাজের আদেশ মেনেও নেয়া হয় তারপর ও তাদের এ কাজ প্রকৃত 'সৎকাজের আদেশ' হওয়ার ব্যাপারে সংশয় বাকী থাকে।

সাবধান!

এব কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের উপকারীতা বা গুরুত্বকে অস্বীকার করছি। বরং দাওয়াত ও তাবলীগের উপকারীতা ও গুরত্বকে অবশ্যই স্বীকার করি। কারণ, পূরো জগতে এ মোবারক কাজের সুফল ও ফায়েদা খোলা চোখেই অনুধাবন করা যাচ্ছে। এর উপকারীতা ও সফলতাকে অস্বীকার করা অতি বাড়াবাড়ি। কিন্তু এর দ্বারা কোন ফরয হুকুমকে হেয় বা ছোট করাও কঠিন বিষয়। কেননা আমরা শরীয়তের সকল আমলকে স্তরভিত্তিক পার্থক্যে বিশ্বাসী। যে আমলের মান যতটুকু সেটাকে তেমনই মূল্যায়ন করা চাই।

সংশয় -৮

প্রারম্ভিকা

শরীয়তের আহকাম দুই ধরনের। কিছু তো আছে মৌলিকভাবে ভাল। তার সৌন্দর্য্যটা সবার কাছে সুস্পষ্ট। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালার যিকির, কুরআন তেলাওয়াত, নামাজ ইত্যাদি। কেননা এতে বিনয়-নম্রতা ও অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। ফলে একজন অতি সাধারণ মুসলমানও বুঝতে পারে যে কাজগুলো কাম্য ও করণীয়। তাই শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরণের আহকামকে 'হাসান লি আইনিহী' বলা হয়।

তৃতীয় প্রকারঃ এমন আহকাম যা প্রথম প্রকারের বিপরীত তথা বাহ্য দৃষ্টিতে তা সৌন্দর্য বুঝে আসে না তাই সত্তাগত ভাবে যেন তা কাম্য নয়। কিন্তু আহকামগুলো এমন যা শরীয়তের অনেক মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম। তাই শরীয়ত এগুলো পালনের নির্দেশ দিয়েছে সেই মৌলিক লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হাসান লি গাইরিহী' বলা হয়। যেমন- অযু, তায়াম্মুম, জিহাদ ইত্যাদি। এগুলো শরীয়তের অন্য কোন হুকুমের মাধ্যম হয় যার মূলটা কল্যাণকর। যেমন- বার বার অযু করল এক অযু থাকা সত্ত্বেও আরেকবার অযু করার দ্বারা বাহ্যদৃষ্টিতে পানির অপচয় হয়। আর পানি না থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করার দ্বারা তো হাত-মুখ ধূলোয়-মলিন হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু এগুলো নামাজের মাধ্যম [অর্থাৎ এগুলো ছাড়া নামাজ আদায় হবে না।] এজন্য পবিত্র শরীয়ত এগুলোর মধ্যেও কল্যাণ গণ্য করে নিয়েছে। আর এ ধরনের আহকামকে 'হাসান লি গাইরিহী' [অর্থাৎ অন্যের জন্য কল্যাণকর] বলে।

উদ্দেশ্য

বাহ্যদৃষ্টিতে জিহাদের সত্তার দিকে লক্ষ্য করলে কোন কল্যাণ নজরে আসে না। কারণ, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে জিহাদের যে চিত্র ফুটে উঠে তা মোটামুটি এমন যে, মানব হত্যা, রক্তপাত, সম্পদলুট ইত্যাদি। এর পরিণতিতে যা হয়; মা হারায় বুকের ধন, সন্তান হারায় একমাত্র পিতা, স্ত্রী হারায় প্রাণের স্বামী আরো কত বঞ্চনা কত অশান্তি। কিন্তু যেহেতু জিহাদই হলো এ পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি ও সামগ্রিক নিরাপত্তা লাভের একমাত্র পথ এবং ইসলাম প্রচারের সর্বোচ্চ মাধ্যম তাই শরীয়তে একে কল্যাণকর গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং মূল বিষয় হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচার।

পক্ষান্তরে দাওয়াতে তাবলীগের যে কাজ চলছে তার পূরোটাই ইসলামের প্রচার এবং এটা হাসান লি আঈনিহী অর্থাৎ এটার মূলেই কল্যাণ আছে। আর জিহাদ হলো ইসলাম প্রচারের মাধ্যম এবং এটা হাসান লি গাইরিহী অন্যের জন্য কল্যাণ মেনে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেহেতু দাওয়াত ও তাবলীগ ইসলামের সবচেয়ে উঁচু হুকুম সরাসরি পালন করছে তাই জিহাদের ফযীলতের আসল এবং সর্বপ্রথম উপযুক্ত ব্যক্তি এসব দাওয়াত ও তাবলীগের লোকেরাই।

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের লোকেরা যদি জিহাদে না যায় তাহলে তারা জিহাদ ছাড়ার শাস্তির আওতাধীন হবে না এবং তাদেরকে জিহাদ পরিত্যাগকারীও বলা যাবে না। বরং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ ছেড়ে জিহাদে

যাওয়ার অর্থ হলো তো বড় কাজ ছেড়ে ছোট কাজের দিকে যাওয়া। আসল ছেড়ে শাখার দিকে এবং হাসান লি আইনিহী ছেড়ে হাসান লি গায়রিহীর দিকে যাওয়ার নামান্তর। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করা জিহাদের চেয়ে উত্তম।

সামধান -১

শরীয়তের সকল আহকামেই কল্যাণ বিদ্যমান। কোন হুকুমের মধ্যেই দোষ-ত্রুটি নেই। আর ফুকাহায়ে কেরাম আমাদের মত নগণ্যদের খাতিরে এ জন্য হাসান লি আইনিহী এবং হাসান লি গায়রিহীর প্রকারভেদ করে দিয়েছেন, যাতে আমরা শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের স্তর ও মর্যাদা অনুধাবন করতে পারি এবং প্রত্যেকটিকে যথার্থ স্তর অনুযায়ী গুরুত্ব দেই। কিন্তু এর কোন একটিকে হেয়-প্রতিপন্ন করা ঈমান ধ্বংসের কারণ হিসাবে যথেষ্ট।

সমাধান -২

এ ব্যপারে তো কোন সন্দেহ নেই যে জিহাদ হাসান লি গায়রিহী। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগ তো হাসান লি আইনিহী নয়; বরং হাসান লি আইনিহি হলো 'এ'লায়ে কালিমাতুল্লাহ' তথা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা। আর একমাত্র জিহাদই হলো আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার মাধ্যম। যেমনটা হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে-

عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل)

- صحيح البخارى:٣٩٤/١ باب من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رقم الحديث:٢٨١٠ - صحيح مسلم:١٣٩/٢ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم الحديث:٤٨٨٢ - مسند احمد :٥٠٨/١٤ رقم الحديث:١٩٤٣٥

যে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য জিহাদ করেছে সে আল্লাহর রাস্তায় আছে।

[বুখারী, মুসলিম]

কেউ যদি এ কথার উপর ভিত্তি করে জিহাদ থেকে দূরে থাকে যে, জিহাদ হাসান লি গাইরিহী আর বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগের উপর এ ভিত্তিতে ক্ষান্ত ও সীমাবদ্ধ থাকে যে, দাওয়াত হাসান লি আইনিহী। অতপর আরও আগে বেড়ে জিহাদের গুরুত্বকে নি:শেষ করে এবং জিহাদ পরিত্যাগকে অপরাধ মনে না করে; বরং মুজাহিদদের সকল ফযীলত নিজেদের জন্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এটা বড় ধরনের জুলুম এবং নিজেকে ধোকায় ফেলার নামান্তর।

সমাধান -৩

জিহাদ যদিও হাসান লি গায়রিহী [অন্যের জন্য কল্যাণ মেনে নেয়া হয়েছে।] কিন্তু এর দ্বারা তো জিহাদের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না কেননা জিহাদের উপর আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করা নির্ভরশীল। যার উপর কোন বস্তু নির্ভরশীল হয় তার গুরুত্ব একটু বেশী-ই হবে এবং সেটা ভিত্তি প্রস্তরের মর্যাদা রাখে। কোন বিল্ডিং বা প্রাসাদ কি ভিত্তি প্রস্তর ছাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তাহলে জিহাদ ছাড়া দ্বীনটিকে থাকবে কি করে?

উদাহরণ

যদি কোন ব্যক্তি মরমর পাথর আর কাঁচের একটি বিল্ডিং দাঁড় করাতে চায় কিন্তু ভিত্তি প্রস্তরে কংক্রিট, লোহা ব্যবহার না করে শুধু এ যুক্তি দেখায় যে, আমার ঘর তো মরমর পাথরের। এগুলো খুব উন্নতমানের। আর এ লোহা ও কংক্রিটগুলো তো নিম্নমানের। তাই আমি নিম্নমানের জিনিষ গুলোকে উন্নতমানের জিনিষের সাথে ব্যবহার করবো কেন?

এ ব্যক্তিকে যেমন বলা হবে, হে আহমক! যদি নিজের ঘর মজবুত করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে চাও তাহলে এ কংক্রিট ছাড়া বানানোর চিন্তা করো না। নইলে তোমার এ বাড়ী হালকা ঝাঁকুনিও সইতে পারবে না। অনুরূপ ইসলামের ভিত্তিতে যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর রক্ত প্রবাহিত না হত তাহলে ইসলামের ভিত্তি অনেক দুর্বল হতো। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী ﷺ এর প্রিয় চাচা, শহীদানের সরদার হযরত হামযা রা. এবং হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. এর মত শাহাজাদাদের রক্তের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন হয়েছে। তারপর ইসলাম যিন্দা হয়েছে এবং যিন্দা থাকবে ইনশাআল্লাহ!

কবির ভাষায়-

দেখতে মাকাল কিন্তু সেটা মিষ্ট মধুর ফল

বাস্তবে ভাই জিহাদ খোদার পছন্দের আমল।

সমাধান -৪

দেখুন! অযু তো হাসান লি গায়রিহী এবং তা নামাযের সহায়ক মাধ্যম। এখন যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে, আমার শরীর তো পরিষ্কার আছে, মাত্র গোসল করেছি। যদি সামান্য বায়ু বের হয় তাতে কী হয়েছে। অযুর উদ্দেশ্য তো শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা। সেটা আমার [অর্জন] আছেই। তাই আমি অযু করবো না। এভাবেই যদি সে নামায পড়ে ফেলে তার নামায কি গ্রহণযোগ্য হবে?

হবে না, কখনো হবে না। কেননা অযু যদিও হাসান লি গায়রিহী কিন্তু নামাজ তার উপর নির্ভরশীল। তদ্রুপ যদি জিহাদ না থাকে তাহলে ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যিনি এ উম্মতের উপর জিহাদ ফরয করেছেন; আল্লাহর দ্বীন কস্মিনকালেও বিজয়ী হবে না।

সমাধান -৫

হাসান লি গাইরিহী বলি আর যাই বলি এমতাবস্থায় যদি অযু না করা হয় তাহলে নামাজ যতভালো করেই পড়া হোক তার কোন মূল্য নেই।
জিহাদ ব্যতীত আজ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন না উঁচু হয়েছে, না কিয়ামত পর্যন্ত উঁচু হবে। আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ হবার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কিছু মানুষ কলিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাবে এবং মুসলমানের ন্যায় নামাযী ও রোযাদার হয়ে যাবে, শরীয়ত ওয়ালা হয়ে যাবেএবংএখানেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। বরং আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত হবার উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের বিজয় হওয়া, ইসলামী আঈন বিজয়ী হওয়া এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শরীয়তের আহকাম প্রয়োগ হওয়া। মানব রচিত কাল্পনিক তন্ত্র-মন্ত্র দলিত-মথিত হওয়া এবং ইসলামী শঅসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
মোটকথা কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাওয়া কিংবা কিছু লোক দ্বীনদার হয়ে যাওয়া এক বিষয় আর ইসলাম বিজয়ী হওয়া আল্লাহর আঈন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহলে বাস্তবায়িত হওয়া আরেক বিষয়।
ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য না করে উভয়টিকে টালমাটাল করে গুলিয়ে ফেলা মূর্খতা এবং অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!!

উদাহরণ-

এক এলাকায় একজন শাসক থাকে এবং সে এলাকায় লাখো মানুষের উপর তার শাসন ক্ষমতাও আছে। শাসক ব্যক্তিটি কাফের আর তার অধিনস্ত প্রজারা সবাই মুসলমান। এরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির-আযকার সব আদায় করে। এখন কি আপনি বলবেন? এখানে মুসলমান বিজয়ী এবং দ্বীনের উপর তাদের বিজয় ও স্বাধিনতা অর্জন হয়েছে?

কখনো না! কেন? কারণ স্পষ্ট। যখন ঐ লাখো মুসলমানের শাসক কাফের এবং আঈন-কানূনও কাফেরদের রচিত। তাহলে সেখানে ইসলামের বিজয় কীভাবে হয়? বরং এটা তো ঐ এলাকার মুসলমানদের জন্য অপমান এবং লাঞ্ছনা যে, সংখ্যায় লক্ষাধিক হওয়া সত্ত্বেও একজনের সামনে তারা অসহায়। এর বিপরীত যদি কোথাও শাসক মুসলমান হয় আর তার অধীনে লাখো কাফের থাকে। এরা নিজেদের ধর্মের উপর আমল করে। কিন্তু ইসলামী আঈন-কানুন বাস্তবায়ন হয় এবং তারা এমন কোন বিশৃঙ্খলাও করতে পারে না যার অনুমতি শরীয়তে যিম্মিদের দেয় না। তাহলে নি:সন্দেহে একথা বলতে পারেন যে, এখানে মুসলমানরা যদিও অল্প বা একদমই নেই; কিন্তু ইসলাম বিজয়ী এবং আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত রয়েছে।

সারকথা

উসূলে ফিক্বাহের কিতাবে ফুকাহায়ে কেরাম একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে,

الجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق [أصول الشاشى]

কাফেরদের অনিষ্ট দমন করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার মাধ্যম হিসাবে জিহাদ কল্যাণকর।

জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং সত্য বাণী অর্থাৎ ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা। এখন নিজেই ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখুন, এ দুই বিষয় অর্থাৎ কাফেরের অনিষ্ট দূর করা এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা জিহাদ ছাড়া কি অন্য কোন পথে আছে? না।

অবশেষে বলব, আমরা যতই তাবলীগ করি, আমাদের আখলাক যতই পরিশুদ্ধ হোক, আমাদের অন্তরে দ্বীন নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়ার দরদ যতই সৃষ্টি হোক আমরা

কি সবক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের আগে বাড়তে পারবো? না, না, কখনো না। সুতরাং যখন তাঁদের মত ব্যক্তিদেরও তরবারী ধারণ করতে হয়েছে তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমরা তরবারী ধারণ করা ব্যতীত কাফেরদের অনিষ্ট দূর করে ফেলব এবং ইসলামকেও বিজয়ী করব। ফুকাহায়ে কেরাম একথাও স্পষ্ট ভাবে বলেছেন-

لولا الكفر المفضى إلى الحرب لا يجب عليه الجهاد [أصول الشاشى]

কুফুরী যদি যুদ্ধের কারণ না হতো, তাহলে জিহাদও ফরয হতো না। এখন চিন্তা করুন, যে কুফুরী যুদ্ধের কারণ কি আজ শেষ হয়ে গেছে? আজ গোটা পৃথিবীতে চলছে কুফুরের অস্ফালন। এমতাবস্থায় কি আমরা জিহাদ ছেড়ে দিব? কাফেররা যখন ইসলাম ও আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে নিয়ে হেয়-প্রতিপন্ন করছে, মুসলমানদের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে, সম্মানহানি করছে, এতদ্বসত্বেও আপনি কি একথা বলতে পারেন যে, আমরা জিহাদ না করেও জিহাদের ফযীলত অর্জন করছি? তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কাফেররা অনিষ্ট থেকে বিরত না হবে, জিযিয়া দিয়ে জীবন অতিবাহিত না করবে এবং আল্লাহর আঈন বাস্তবায়ন না হবে, ইসলাম বিজয়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ শেষ হবে না। আর প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ জিহাদ থেকে অধিক ফযীলত পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা জিহাদের বরাবর মনে করাও স্পষ্ট ভ্রান্তি, মূর্খতা এবং অজ্ঞতা।

উসুলে ফিক্বহের কিতাবে ফুকাহায়ে কেরাম একথা বলে দিয়েছেন যে, অযু ও জিহাদ ভিন্ন কারণে কল্যানকর। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। অযু কল্যাণকর নামাজের কারণে। আর অযুর পর নামাজ আলাদা আদায় করতে হয়। শুধু অযু করার দ্বারা নামাজ আদায় হয় না।

কিন্তু জিহাদের মধ্যে কল্যাণ আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার করণে আর জিহাদের পর আল্লাহর দ্বীন আপনা আপনি সমুন্নত হয়ে যায়। এজন্য আমাদের আবেদন! আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার ব্যাখ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে না করে শরীয়ত যে ব্যাখ্যা করেছে তা বর্ণনা করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হক কথা বলার, শুনার, বুঝার এবং হকের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৯

عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
................والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز و جل.

- مسند أحمد:٢٤٠١٣ - سنن الترمذى: ٢٦٢٧ - سنن النسائى: ٤٩٩٥ باب صفة المؤمن

প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে। এই হাদীসে নফসের সাথে জিহাদ করাকে বড় জিহাদ বলে ব্যক্ত করেছে। সুতরাং এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুজাহিদ সে ব্যক্তিই যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে। যেহেতু নিজের নফসের সাথে জিহাদ করাই সবচেয়ে বড় জিহাদ। এই জন্য শুধু কিতালকে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বলা ঠিক নয়।

সমাধান -১

হাদীস শরীফের মর্ম হলো, আসল ও প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তার নফসকে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য ও অনুগামীতে রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ তখনি জিহাদ হবে যখন শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্যই করা হবে। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে জিহাদ করা হয় যেমন জাতিয়তাবোধ, স্বদল প্রীতি দেশাত্মবোধ, লোক দেখানো এবং সুনাম-সুখ্যাতির জন্য যদি জিহাদ করে তাহলে তার জিহাদ কখনোই ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

যেরূপ এই হাদীসের মধ্যে "في طاعة الله"[আল্লাহর আনুগত্য] শব্দমালা এনে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিষয়টি ঠিক এমনই যেমন দুই এক বর্ণনায় এসেছে। হযরত আবু মূসা রা. বলেন: এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ একজন গণীমতের জন্য যুদ্ধ করে। আর আরেক জন প্রসিদ্ধতা ও লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে। তাদের মধ্য হতে প্রকৃত অর্থে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে?

রাসূল ﷺ বললেন-

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل"

- صحيح البخارى:٣٩٤/١ باب من من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. رقم الحديث:٢٨١٠ - صحيح مسلم:١٣٩/٢ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رقم الحديث:٤٨٨٢ - مسند أحمد :٥٠٨/١٤ رقم الحديث:١٩٤٣٥

যে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে সেই আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

সমাধান -২

যদি হাদীসের মর্ম এটা নেওয়া হয় যা সাধারণত নেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ কামেল মুজাহিদ সে যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। তাহলে তুমি নিজেই চিন্তা করো যেভাবে একজন মুজাহিদের পক্ষে নিজের নফসের বিরুদ্ধে গিয়ে সন্তানাদী, প্রিয়জন, অত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকা, এমনকি নিজের সন্তানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যু মুখে পতিত করা উত্তপ্ত গরম, প্রচন্ড ঠান্ডায় যুদ্ধকালীন ভীতিকর পরিস্থিতির মাঝে নামাযের গুরুত্ত দেওয়া, ঘরহীন হয়ে নিজেকে বসবত করে শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জানকে শংকায় ফেলে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধান করা, কোনো কিছু কি এ মুজাহাদার তুলনা হতে পারে? কিছুতেই না! তাহলে একজন মুজাহিদই সর্বাগ্রে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।

রক্তের ধারা গতিহারা হলে

ফাসাদ বৈ ছাড়াবে কি?

আত্মার জিহাদের লক্ষ্য শুধু

স্বশস্ত্র জিহাদের লাগি!

সমাধান -৩

যদি হাদীসের অর্থ এভাবে করা হয়, কামেল মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠ উত্তাপ আর মুসলমানদের ইজ্জতে আঘাত আসছে, মা-বোনদের সম্মান, স্বতীত্ব ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে। এমুহুর্তে মুসলমানদের সহায়তা প্রয়োজন। তাই শরীয়ত তাকে ময়দানে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু এঅবস্থায়ও সে নিজের রুমের দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আর মনে মনে বলছে, আমরা নফসের ইসলাহ করছি। আমরা প্রকৃত জিহাদে রয়েছি। প্রিয় পাঠক! আপনারা একটু চিন্তা করে ইনসাফের সাথে বলুন, এটা কি নফসে আম্মারার পূঁজা এবং গোলামী নয়? এটা কি ইবলিসের ধোঁকা নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফযত করুন। আমীন!

সমাধান-৪

কেউ যদি ঈমানের রোকনসমূহেরও স্বীকার না করে এমন বলে যে, মুমিন হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার সত্ত্বা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত, ফেরেশতা, কিয়ামত, তাকদীর, কবরের আযাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজন নেই; বরং সেই প্রকৃত মুমিন যার থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে। আর দলীলের জন্য এই হাদীসটি পেশ করে-

"والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم" الحديث

'প্রকৃত মুমিন হলো ঐ ব্যক্তি যার থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে।'

আবার কেউ যদি কালেমায়ে তাইয়্যিবা স্বীকার না করে একথা বলে যে, মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের রোকনসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার প্রয়োজন নেই। বরং প্রকৃত মুসলমান হলো ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদে থাকে। আর দলীল হিসাবে এই হাদীসটি পেশ করে-

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

'প্রকৃত মুসলমান হলো ঐ ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে।'

আবার কেউ যদি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের দেশ পরিত্যাগকারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বকে অস্বীকার করে এই বলে যে, প্রকৃত মুহাজির তো সেই ব্যক্তি যে গুনাহ বর্জন করে। আর দলীল হিসাবে এই হাদীস পেশ করে-

"والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب"

'প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে গুনাহসমূহ বর্জন করে।'
প্রিয় পাঠক! এখন আপনারাই বলুন, এসব ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী বেদ্বীন লোকদের ব্যাপারে আপনারা কি বলবেন?
একথা সুস্পষ্ট যে, এই সব হাদীসের মূল মর্মবাণী হলো, মুমিনের জন্য সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে সাথে বান্দার হক আদায় করা আবশ্যক। মুসলমানদের জন্য বান্দার হক আদায় করা থেকে উদাসিন না হওয়া উচিত। আল্লাহর দ্বীনের সার্থে নিজের মাতৃভূমি ও দেশ ত্যাগকারীর জন্য গুনাহ ছেড়ে দেয়া উচিত। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারীদের জন্য শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।
এ ব্যাপারে পূর্ণ হাদীসটি ফায়দার জন্য উল্লেখকরে দেয়া হলো-

عن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "في حجة الوداع الا أخبركم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهموالمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز و جل."

- مسند أحمد:٢٤٠١٣ - سنن الترمذى: ٢٦٢٧ - سنن النسائى: ٤٩٩٥ باب صفة المؤمن

হযরত ফুযালা ইবনে উবায়দ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদায় হজ্বে বলেছেন- 'আমি কি তোমাদেরকে প্রকৃত মুসলিমের ব্যাপারে সংবাদ দিব না? প্রকৃত মুসলিম সে যার মুখ এবং হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদে থাকে। প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে; গুনাহসমূহ বর্জন করে।'

নফসের সাথে জিহাদ করার অর্থ কি?

নফসের সাথে জিহাদ করার অর্থ হলো এই যে, নিজের নফস ও জীবন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আদা নুন খেয়ে নেমে আসা। এমনিভাবে মালের সাথে জিহাদ করার অর্থ হলো, নিজের মালকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে এমটাই বলেছেন- "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে।'

[সূরায়ে আনফাল: ৭২]

আর হাদীস শরীফে এসেছে-

القتلى ثلاثة رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله

-صحيح إبن حبان : ١٦٨/١٠ ذكر البيان بأن الأنبياء لايفضلون الشهداء إل ابدرجة النبوة فقط رقم الحديث : ٤٦٦٣

'নিহত ব্যক্তি তিন শ্রেনীর হয়ে থাকে এক. ঐ মুমিন ব্যক্তি যে নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।'

কুরআন ও হাদীসের যেখানেই "جهاد بالنفس" [জিহাদ বিন্ নফস] ও "جهادبالمال"[জিহাদ বিল মাল] এসেছে সেখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে "جهاد بالنفس" [জিহাদ বিন্ নফস] এর অর্থ ব্যাপকভাবে যেটা করা যেটা করা হয়, 'নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। নফসের চাহিদার বিরুদ্ধে জিহাদ করো।' কিন্তু এই ব্যখ্যাটা "جهادبالمال"[জিহাদ বিল মাল] এর ক্ষেত্রে কেন করা হয় না? হায়! বর্তমান যুগের কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি এই দর্শনের উপর দৃষ্টি পাত করতো।

সংশয় -১০

قدم على رسول الله صلى عليه وسلم "قوم غزاة فقال قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه"

'রাসূল ﷺ এর নিকট একদল মুজাহিদ আগমন করলেন তখন তিনি বললেন তোমরা জিহাদে আসগার-ছোট জিহাদ থেকে জিহাদে আকবার-বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, জিহাদে আকবর কি? রাসূল ﷺ বললেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।' [তাফসিরে কাশশাফ]

এ বর্ননায় রাসূল ﷺ আপন যবান মুবারকে মুজাহাদা ও আত্মশুদ্ধিকে শুধু জিহাদই বলেননি; বরং জিহাদে আকবর তথা বড় জিহাদ বলেছেন। এতো স্পষ্ট বর্ননা থাকতে জিহাদের অর্থ শুধু ফী সাবীলিল্লাহ বলা কোনভাবেই সঠিক নয়।

সমাধান -১

আসুন! মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই বর্ণনার ব্যাপারে কি মন্তব্য করেন? আমরা খুব সংক্ষেপে একটি জরিপ করি। মুখতাসার প্রণেতা আল্লামা পাটনি রহ. বলেন-

"رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ضعيف" ـ تذكرة الموضوعات

এই বর্ননাটি যঈফ-দুর্বল। [তাযকিরাতুল মাওযূআত]

আল্লামা শামসুদ্দিন যাহাবী রহ. বলেনঃ ইহা হাদীস নয় বরং মুহাম্মদ ইবনে আবালা এর বাণী।

[সিয়ারু আলামিন নুবালা]

محمد بن زياد يقول : سمعت إبن أبى عبلة وهو يقول لمن جاء من الغزو قد جئتم من الجهاد الإصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد القلب ـ سير أعلام النبلاء جـ٦

বাগদাদের প্রক্ষাত মুফতী আল্লামা আলুসী রহ. বলেন, এ বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই।

[রুহুল মাআনি]

"والحديث الذي ذكره لا أصل له" ـ روح المعاني جـ٣

আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন, এ বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই।

"أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فلا أصل له."

সমাধান -২

এ কথাটি যদি হাদীস বলে মেনে নেয় হয় তাহলে কোরআনে কারীমের নিম্নক্ত আয়াতটির বিপরীত হয়ে যায়। অথচ কোরআন ও হাদীসের মাঝে বৈপরিত্ব অসম্ভব। সুতরাং বাধ্য হয়ে এটা বলতেই হবে যে, বর্ণনাটি হাদীস নয়।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً"

'নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'য়ালা বসে থাকা লোকদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।' [সূরায়ে নিসা:৯৫]

"الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ"

'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আল্লাহর পথে নিজদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান এবং তারাই সফলকাম।'

[সূরায়ে তাওবা:২০]

যদি উপরোক্ত বাণীকে হাদীস বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে শরীয়তের অতিগুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহকে' ছোট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা শরীয়তের মেযাজ পরিপন্থী।

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে লুতফী রহ. বলেন, এই হাদীসটি দুর্বল। আল্লামা ইরাকীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটা বাতিল। [আল আসরারুল মারফুয়া]

সমাধান -৩

এই বর্ণনার উপর একটি আপত্তি হলো যদি "رجوع" অর্থ হয় প্রত্যাবর্তন অর্থাত হয় এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তর হওয়া। তাহলে আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী এ বর্ণনার সারমর্ম হবে এমন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জিহাদে আসগর থেকে অর্থাৎ এমন কিতাল ও যুদ্ধ-জিহাদ থেকে ফিরে এসেছ যার মধ্যে আত্বশুদ্ধি ও নফসের মুজাহাদা ছিল না। তারপর তোমরা এমন এক জিহাদে আকবরের দিকে ফিরে এসেছে যার মধ্যে আত্বশুদ্ধি এবং মুজাহাদায়ে নফস রয়েছে।

নাউযুবিল্লাহ! এতে সাহাবায়ে কেরামের কি পরিমাণ তুচ্ছ করা হচ্ছে? এটা কেউ সহ্য করতে পারে? সাহাবায়ে কেরামের জিহাদ কি এমন ছিল যে, তাতে কোন শরীয়তের সীমারেখা, আত্মশুদ্ধি ও মুজাহাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা হত না। বরং মদীনায় ফিরে এসে আত্মশুদ্ধি ও মুজাহাদার প্রতি নিমগ্ন হতেন? জিহাদের মধ্যে কি পরিমাণ মুজাহাদা হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আরে জিহাদের ময়দানে আহত-নিহত হওয়া এবং আহত-নিহত করার চেয়ে বড় মুজাহাদা আর কি আছে?
কুরআনে কারীম সে মুজাহাদার কথা এভাবে বর্ণনা করেছে-

"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ"

'তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।'

[সূরায়ে বাকারা:২১৬]

জিহাদ মৌলিকভাবে একটি কষ্টকর আমল।

এখানে এমন কিছু ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হবে যার দ্বারা স্পষ্ট হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম ক্বিতালের সময়ে কি পরিমাণ শরীয়তের পাবন্দী এবং আত্মশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত উবাদা ইবনে বশির রা. রাতে পাহারা দিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় শত্রুর তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয়। তখন তিনি নামাজ পড়ছিলেন। কিন্তু নামজ ছাড়লেন না। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস ছিল না।
হযরত মুয়ায রা. বদরের দিন আপন কর্তিত হাত দিয়ে সারা দিন জিহাদ করছেন কর্তিত হাত যখন সমস্য মনে হলো তখন পায়ের নিচে রেখে টান দিয়ে ছিড়ে ফেললেন। তারপর আবার জিহাদে মশগুল যে, গেলেন। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?
৩. খন্দকের যুদ্ধে রাসূল ﷺ এর সাথে সাহাবায়ে কেরাম পেটে পাথর বেঁধে কাজ করছেন। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?
৪. তিন সাহাবী মৃত্যুর কাছাকাছি হয়েও শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। পিপাসার তীব্রতা সহ্য করে অপর ভাইকে প্রাধান্য দিলেন। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?
৫. হযরত আলী রা. এক ইয়াহুদিকে ধরাশায়ী করলেন যখন তার শরীর থেকে গর্দান পৃথক করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সে হযরত আলী রা. কে সে থুতু মারল তিনি তাকে এই ভেবে ছেড়ে দিলেন যে, এতে আমার ব্যক্তিগত রাগ এসে গেছে। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?
৬. সারিয়্যাতুল আম্বারে সাহাবায়ে কেরাম প্রতিদিন একটি করে খেজুর আহার করতেন। এটা কি মুজাহাদায়ে নফস নয়?

উপরোক্ত কতিপয় ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম জিহাদের মূল সময়েও ইখলাস, মুজাহাদা ও আল্লাহা সুবহানাহু তা'য়ালার প্রতি মনোনিবেশে সামান্য পরিমাণ গাফেল হতেন না। হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর বাণী: হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ রাফী উসমানী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহ) মুহতামিম দারুল উলুম করাচি তিনি লেখেন, আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলতেন- জনৈক ব্যক্তি শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. কে জিজ্ঞাসা করল, সুফিয়ায়ে কেরাম মুরিদদেরকে যে, মুজাহাদা ও রিয়াযত করান নবীজি তো

সাহাবায়ে কেরামকে এমন মুজাহাদা কখনো করাননি। তবে কেন সুফিয়ায়ে কেরাম এমন করেন? হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. বলেন, হুবহু শব্দ তো স্বরণ নেই শুধু বিস্তারিত বর্ণনা করছি।

মূল কথা হলো, তরিকতের মধ্যে মুজাহাদা ও রিয়াযত আসল উদ্দেশ্য হয় না। বরং আভ্যন্তরীন আখলাকের সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যার সার কথা হলো, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে যেন সম্পর্ক গড়ে এবং দৃঢ় হয়। আর নফস যেন শরীয়তের অনুগামী হয়ে যায়। এই উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য নফসের চিকিৎসা স্বরুপ মুজাহাদা করানো হয়। যাতে নফস কষ্টও প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে অভ্যস্ত হয়। যখন এই অভ্যাস বৃদ্ধি পায় তখন তার জন্য শরীয়তকে মানা সহজ হয়ে যায়।

এরপর শরীয়তের উপর আমল করার জন্য শুধু দিক নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দেয় যা মুর্শিদ আঞ্জাম দেয়। এ উদ্দেশ্য নবীজির সহচার্যে জিহাদের মাধ্যমে সাহবায়ে কেরামের আধ্যতিক শক্তি এতবেশি পরিমানে অর্জন হতো যে, অতিরিক্ত কোন মুজহাদা বা রিয়াজতের প্রয়োজন থাকতো না। তারা এই জিহাদের মাধ্যমে সুলক ও তরিকতের এমন উচ্চ মাকাম লাভ করতেন যা হাজার হাজার বছর সাধনা করেও অন্যদের পক্ষে সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা, জিহাদই একটি বড় মুজাহাদা। এটা রুহানী ও বাতেনী উন্নতি এবং তায়াল্লুক মা'আল্লাহ এর জন্য পরশ পাথর। আত্মশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সালাফেসালেহীনদের পথ ও পন্থা হলো জিহাদ। তথাকথিত রিয়াযত বা কাল্পণিক মুজাহাদা নয়। বরং ময়দানের প্রকৃত মুজাহাদা। এতে বান্দার অত্মশুদ্ধিও হয় এবং দ্বীনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একটি স্মরনীয় ঘটনা

সমাধান -৪

আমার ভালো করে মনে আছে, আজ থেকে প্রায় সতের বছর পূর্বের কথা: আমি যখন জামে মসজিদ বুড়ওয়ালী শাখার মন্ডিতে পড়তাম তখন উস্তাদে মুহতারাম শাইখুল হাদীস আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমাম মাওলানা মুহাম্মদ সারফরায খান সফদর দা.বা. সকালের দরসে বলেন- "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" এটাকে যদি হাদীস হিসাবে মেনে নেয়া হয় তাহলে এর

উদ্দেশ্য হলো, সাহাবায়ে কেরাম এক গাজওয়া থেকে ফিরলেন। সেখানে অনেক আহত সাহাবী ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবত ঘর থেকে দূরে ছিলেন এবং শহীদদের কারণে অন্তরও ভারাক্রান্ত ছিলো। এমতাবস্থায় তারা দ্বিতীয় বার জিহাদের দিকে ধাবিত হলেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন-

"رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر"

'তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি ফিরেছ।' সুস্পষ্ট বিষয় হলো হাদীসে গাযওয়াসমূহের মধ্যে এক গাযওয়াকে বড় আর আরেক গাযওয়াকে ছোট বলা হয়েছে। সুতরাং এতে কোন আপত্তির বিষয় নেই।

জিহাদে আকবর হলো স্বাধের প্রাণ বিসর্জন
সবচে' বড় জিহাদ কুফুরের অনিষ্ট দমন।

জিহাদে আকবর-বড় জিহাদ

এখন আসুন দেখি, জিহাদে আকবারের বাস্তবতা কি? এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু একটি বর্ণনা উল্লেখ করবো। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকানী রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় লিখেন- "وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِه" 'আর তোমরা আল্লাহর পথে পরিপূর্ণভাবে জিহাদ কর।' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় জিহাদ। আর তা হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাদেরকে প্রতিহত করা যখন তারা মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। [ফাতহুল কাদীরঃ ৩]

আসলে জিহাদে আকবর কোনটি এ ব্যপারে আমি শুধু ইমাম শাওকানী রহ. এর অভিমত তুলে ধরছি-

"وجاهدوا في الله حق جهاده"

'তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।' এ আয়াতের তাফসীরে তিনি লিখেন-

"والمراد به الجهاد الأكبر وهو الغزو للكفارومدافعتهم إذا غزوا بلاد المسلمين"

'এ আয়াতে জিহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় জিহাদ। আর তাহলো কাফেররা যখন কোন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমন করে; তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে প্রতিহত করা।' আর কবির ভাষায়-

জীবন কুরবান করা জিহাদ আকবর;

কুফুরির অস্ফালনে গরদান চেপেধর।

সংশয়

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, 'কিতাল এবং গাযওয়াকে জিহাদে আকবার বলার কারণে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 'কিতাল এবং গাযওয়া' ছাড়া অন্যান্য আমলকেও জিহাদ বলা যায়; যদিও সেটা জিহাদে আসগর হোক না কেন? সুতরাং জিহাদের অর্থ শুধু যুদ্ধ করা এটা ভুল!

সমাধান

ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে লড়াই করা। কিন্তু জিহাদের সাথে কোন কোন আমলের মিল ও সমঞ্জস্যতা থাকার কারণে 'মাজাযান-রুপক' অর্থে সেই আমল জিহাদ। এজন্য তাকেও জিহাদে আকবর বলা হয়েছে। আর কোন আমলকে জিহাদে আকবর বলার দ্বারা ভুল বুঝাবুঝি শিকার হওয়া এবং এটাকে জিহাদের 'হাকীকী-প্রকৃত' অর্থে অন্তর্ভূক্ত করা কখনো ঠিক হবে না। যেমন হজ্জ এবং উমরাহ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। হজ্জের কিছু কাজ উমরার কজের অন্তর্ভূক্ত। যেমন- ইহরাম, তাওয়াফ, হলক-মাথামুন্ডানো, সায়ী ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দৃষ্টিকোন থেকে কোন কোন সময় উমরাকে 'হজ্জে আসগর' এবং হজ্জকে 'হজ্জে আকবর' বলা হয়। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

'মহান হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষনা।'

[সূরায়ে তাওবা:৩]

সুতরাং আমার একটি হাসির কথা মনে পড়েছে। আমাদের দ্বীনি মাদরাসা সমূহের সমাপনী বছরকে বলা হয় 'দাওরায়ে হাদীস।' এ দাওরায়ে হাদীস পড়ার মূল বুনিয়াদ ও ভিত্তি হচ্ছে মেশকাত শরীফ। এ হিসাবে আমাদের পাখতুনের ছাত্ররা মেশকাত জামাতের নাম দিয়েছে ' ছোট দাওরা'।

সংশয় -১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عن أبی سعيد الخدری رض، قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر"
.

- سنن أبي داؤود: ٥٩٧/٢ باب في الأمر والنهی . رقم الحديث:٤٣٤٤ - سنن إبن ماجة : ٢٨٩ باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر، - سنن الترمذی : ٤٠/٢ باب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر،

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাই সবচেয়ে বড় জিহাদ'

উক্ত হাদীসে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য বলাকে জিহাদ বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মুখে সত্য কথা বলাও জিহাদ। সুতরাং জিহাদের অর্থ শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ আর মারামারি এমন বলাতো ঠিক নয়।

সামধান -১

মুহাদ্দিসীনে কেরাম একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, বাদশাহর সামনে সত্য কথা বলা তখনই জিহাদ বলে বিবেচিত হবে যখন সত্য বলার কারণে মাথা কেটে ফেলার প্রবল আশংকা এবং দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে।

সত্য প্রকাশ শ্রেষ্ঠ জিহাদ জালিম শাহের কাছে

প্রাণ বিনাশের সমূহ বিপদ সামনে যে তার আছে।

মুহাদ্দিসীনে কেরামের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তো উল্লিখিত হাদীসের অর্থ যুদ্ধ-জিহাদেরই সমর্থক। করণ, জিহাদের মধ্যে কাজ দুটি। শত্রুকে হত্যা করা এবং নিজে শহীদ হওয়া। আর জালিম বাদশাহর সামনে সত্য প্রকাশেও তার শাহাদাত বরণের আশংকা আছে।

সামধান -২

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, মুখের কোন কথা বা ভাষণ যদি কিতালের সহায়ক হয় তাহলে তা কিতালের অংশ হিসাবেই গণ্য হবে। এই হাদীসে হুবহু এমনটাই হয়েছে।

সমাধান -৩

অনেক সময় তীর-তরবারীর চেয়ে মুখের কথাই কাফেরদের উপর বেশী প্রভাব ফেলে। আর এজাতিয় কথা নিঃসন্দেহে জিহাদ। কেননা মুখের কথা যখন কাফেরদের মনোবল দুর্বল করে দেয় তখন তারা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। আবার এসব কথাই কখনো মুসলমানদের মনোবল চাঙ্গা করে এবং তাদের অন্তরগুলোকে মজবুত করে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণা যোগায়।

একটি জলন্ত প্রমাণ

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন "ওমরাতুল ক্বাযা" করার জন্য মক্কা গমন করলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. গলায় তরবারী ঝুলিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উটনীর লাগাম ধরে আগে আগে চলছিলেন। আর এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:

خلوا بني الكفار عن سبيله،
اليوم نضربكم على تنزيله.
ضربا يزيل الهام عن مقيله،

ويذهل الخليل عن خليله.

فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر .فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.

- سنن الترمذى: ١١٢/٢ باب ما جاء في إنشاد الشعر. رقم الحديث:٢٨٥٦ - شمائل المحمدية للترمذي: ١٦باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر.

অর্থ: "হে কাফেররা! সরে যাও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাস্তা ছেড়ে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মক্কায় আগমনে আজকে তোমাদেরকে এমন মার দিব, যার আঘাত তোমাদের শরীর থেকে মাথার খুঁপড়ী পৃথক করে দিবে এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। তারপর হযরত ওমর রা. বললেন-

"يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟"

'ইবনে রাওয়াহা! তুমি মক্কায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এমন কবিতা আবৃতি করছো? [যেন তিনি বিরত রাখতে চাইলেন] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে ওমর! তাকে বিরত রাখার চেষ্টা কর না। আজকে তাঁর কবিতা কাফেরদের উপর তীরের চেয়ে কঠিন আঘাতকারী।'[শামায়েলে তিরমিযী]

অতএব, এই পুরো আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, একটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে যে কোন হক কথাকে আল্লাহর পথে 'জিহাদ' বলা কোন ভাবেই ঠিক হবে না।

সংশয় -১২

سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والداك) . قال نعم قال (ففيهما فجاهد) "

- صحيح البخاري: ٨٨٣/٢ باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. رقم الحديث:٥٩٧٢ ـ مسند أحمد : ٦٨٥٨/١١

'হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, জী হ্যাঁ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি পিতা-মাতার সেবা কর। অর্থাৎ তুমি গিয়ে পিতা-মাতার সেবা কর। তোমার জন্য এটাই জিহাদ।'

এই হাদীসে মাতা-পিতার সেবা করাকে জিহাদ বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, শুধু অস্ত্রের যুদ্ধই "জিহাদ" নয়; বরং পিতা-মাতার সেবা করাও জিহাদ!

সমাধান -১

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বান্দাদের 'হকের' মধ্যে সবচেয়ে বড় 'হক' মা-বাবার সেবা করা। হাদীসে বাবার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি বলা হয়েছে। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত রাখা হয়েছে। সন্তানের সম্পদকে বাবার সম্পদ বলা হয়েছে। 'শিরক' এর পর মা-বাবার অবাধ্যতাকেই সবচেয়ে বড় গুনাহ বলা হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্য সন্তানের ধ্বংস ও অমঙ্গলের জন্য হযরত জিবরাইল আ. বদ দোয়া করেছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলেছেন।
মায়ের অবাধ্য সন্তানের মুখে মৃত্যুর সময় 'কালিমা' না আসা শরীর থেকে রূহ বের না হওয়া এবং ছটফট করতে থাকা; মা মাফ করার পর মুখে কালিমা আসা আর সাথে সাথেই 'রূহ' বের হওয়ার ঘটনাও হাদীসে বর্ণিত আছে।
মা-বাবার এসব হক মা-বাবার সেবার বিষয়ে বর্ণিত ফাযায়েল এবং মা-বাবার অবাধ্যতা যে মারাত্মক অপরাধ তা আপন যায়গায় ঠিক আছে, আমরাও তা মানি। কিন্তু এ কারণে সর্বাবস্থায় সবার ক্ষেত্রে মা-বাবার সেবাকে আল্লাহর পথে জিহাদ বলা কোন ভাবেই ঠিক নয়। কেননা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। আর তা হলো, আল্লাহর পথে স্বশস্ত্র যুদ্ধ।
তবে এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাহলে হাদীস শরীফে মা-বাবার খেদমতকে জিহাদ বলা হয়েছে কেন? এর সহজ একটি উত্তর হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী ও রাসূল হওয়ার সাথে সাথে মুফতী, কাযী, ইমাম, খতীব, মুবাল্লিগ এবং আমীরুল মুজাহিদীনও ছিলেন। যদিও তাঁর মৌলিক দায়িত্ব 'নবুওয়াত'-ই

ছিলো। কিন্তু তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য উল্লেখিত অন্যান্য দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়েছেন।

এই সাহাবী রাসূল ﷺ এর নিকট জিহাদের নিয়তেই উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে যাবার পরিবর্তে মা-বাবার খেদমতের কাজে লাগিয়েছিলেন। সুতরাং ঐ সাহাবীর জন্য মাতা-পিতার খেদমতই জিহাদ। কারণ, তিনি আমিরের আনুগত্য করেছেন এবং তার বন্টিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

টাল বাহানা করে যারা বাঁচায় আপন প্রাণ
বাস্তবে তার খোদার সাথে নেই যে মনের টান।
পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ হয় যদিও
কিন্তু তাহার যুদ্ধের সাথে সম্পর্ক নেই কভূও।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মা-বাবার খেদমত তো এমনিতেই অনেক বড় বিষয়। আমীরুল মুজাহিদীন যদি কাউকে যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছনে পাঠান এবং টয়লেট পরিষ্কারের কাজে লাগান তাহলে টয়লেট পরিষ্কারের মত অতি নগণ্য কাজটিও জিহাদ বলে বিবেচিত হবে। এজন্য সে জিহাদের পূর্ণ ছওয়াবও পাবে। কারণ, আমীরের আনুগত্য করে যে যাই করবে সবই জিহাদ বলে বিবেচিত হবে।

আর এমন ঘটনা শুধু এই এক সাহাবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এমন আরো বহু ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপঃ হযরত উসমান রা. বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। রাসূল ﷺ ও তাঁকে বদরের গণীমত থেকে অন্যদের সমান অংশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত উসমান রা. বদর যুদ্ধে ময়দানে শরীক ছিলেন না। বরং স্বীয় স্ত্রী রাসূল ﷺ এর মেয়ে হযরত রুকাইয়া রা. এর অসুস্থতার কারণে তাঁর সেবা-যত্নে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বদরীদের মধ্যে তাকে শুধু এজন্য গণ্য করা হয় যে, তিনি সহধর্মীনীর সেবা-যত্নের জন্য নিজ ইচ্ছায় পিছে থেকে যাননি; বরং রাসূল ﷺ তাঁকে একাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

তাহলে কি শুধু এই হাদীসের কারণে যে কেউ স্ত্রীর সেবা-যত্নকে জিহাদ বলে দিবে? যেহেতু ঘটনা দুটির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। বরং এক হিসাবে হযরত

উসমান রা.এর ঘটনা আরো বেশী মজবুত। কারণ, তিনি গণীমতের অংশও পেয়েছেন; অথচ যুদ্ধে শরীক ছিলেন না।

ইতিহাসে হযরত উসমান রা. ছাড়াও আরো এমন আটজন সাহাবীর নাম পাওয়া যায় যাদেরকে বদর যুদ্ধে শরীক না থাকার পরও 'বদরী' বলা হয় শুধু এজন্য যে, তাঁদেরকে রাসূল ﷺ নিজেই কাজে পাঠিয়ে ছিলেন। আর ঐ আট জন সাহাবী হলেন: ১. হযরত তালহা রা. ২. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. ৩. হযরত আবু লুবাবা আনসারী রা. ৪. হযরত আসেম বিন আদী রা. ৫. হযরত হারেছ বিন হাতেব রা. ৬. হযরত হারেছ বিন ছুম্মাহ রা. ৭. হযরত খাওয়াত বিন যুবায়ের রা. ৮. হযরত জাফর রা.

সারাংশ

সুতরাং এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে আমীরের অনুমতি ব্যতীত জিহাদ ছেড়ে দিয়ে মা-বাবার সেবা-যত্নে লেগে থাকা এবং এটাকে প্রকৃত জিহাদ মনে করে যুদ্ধের ময়দান থেকে বিমুখতা প্রকাশ করা আবার সময়মত নিজেকে মুজাহিদরূপে জাহির করা নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার নামান্তর। তার উদাহরণ হলো-

"این خیال است و محال است و جنوں" 'এটা কেবল অবাস্তব কল্পনা আর পাগলামী।'

মাসআলা

জিহাদ "ফরজে আঈন" হলে মা-বাবার অনুমতি ছাড়া; বরং তাঁদের বাধা সত্ত্বেও জিহাদে যাওয়া জরুরী। তবে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করবে যেন মা-বাবা স্বেচ্ছায় অনুমতি দেন। এতে করে তাঁরাও সন্তানের জিহাদের সওয়াব পাবেন।

আর যদি জিহাদ ফরজে কেফায়া হয় তাহলে মা-বাবার অনুমতি তখনই জরুরী যখন তাদের সেবা করার মত আর কেউ না থাকে।

যদি মা-বাবার সেবা করার লোক থাকে আর মা-বাবা শুধু মুহাব্বতের কারণেই সন্তানকে জিহাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় তাহলে মা-বাবার অনুমতি নেয়া জরুরী না।

[ফয়জুল বারী শরহে সহীহ বুখারী]

আমাদের আকাবির

এখানে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেমুল উলুমী ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. এর ঘটনা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। যাতে আমাদের বড়দের 'মেযাজ' বুঝতে সহায়ক হয়।

হযরত নানুতুবী রহ. যখন জিহাদের অনুমতির জন্য মায়ের কাছে গেলেন তখন মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর পথে জান-মাল উৎসর্গকারীর এমন সওয়াব পায়। আর যে ব্যক্তি সেচ্ছায় আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দেয় তাঁর মর্যাদা এই। [অর্থাৎ তিনি জিহাদের ফাযায়েল বর্ণনা করে বললেন] এখন জিহাদ ফরয হয়ে গেছে।

আর মাসআলা হলো, যদি মা-বাবার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের বাঁধা হয় তখন মা-বাবার অনুগত্য বাদ দিতে হয়। আমি চাই যে, আপনি আমাকে স্বেচ্ছায় জিহাদে যাবার অনুমতি দিবেন। তাহলে আপনিও সেই সওয়াবের ভাগী হবেন।

মা বললেন, বেটা! তুমি আল্লাহর দেয়া ছেলে। আমি আনন্দচিত্তে তোমাকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করছি। যদি তুমি গাজী হয়ে ফিরে আস তাহলে আবার দেখা হবে। আর যদি ফিরে না আস তাহলে আমরা খুব শীঘ্রই আখেরাতে মিলিত হব।

মায়ের অনুমতির পর যখন বাবার কাছে বিনম্র হয়ে নিজের সংকল্পের কথা জানালেন তিনি বললেন, বাবা! আমার পাগড়ীটা একটু নিয়ে আস। মাওলানা নানুতুবী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? পিতা বললেন, আমি তোমার সাথে শহীদ হতে চাই। হযরত নানুতুবী রহ. বললেন, আমার জন্য আপনি জীবন দিবেন কেন? আপনি যদি একমাত্র আল্লাহর জন্য জীবন দিতে চান তাহলে আমার সাথে চলুন। তারপর মা-বাবার অনুমতি নিয়ে হযরত নানুতুবী রহ. থানাভবনে পৌঁছে গেলেন।

[হায়াতে আমীরে শরীয়ত পৃষ্ঠা: ১৯১]

আল্লাহু আকবার! তাঁরাই হলেন আমাদের পূর্বসূরী। এমনই ছিলেন আমাদের আকাবিরগণ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

একটি উদাহরণ

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য পরিশেষে আমি দুই ব্যক্তির একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একজনের নাম রিয়াজ খান। অপরজনের নাম পিয়াজ খান। দু'জনেই দোকানদার। রিয়াজ খান আমীরুল মুজাহিদীনের কাছে গিয়ে বলল, সম্মানিত আমীর সাহেব! আমার জান-মাল জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। আমাকে জিহাদের জন্য কবুল করুন। আমীর সাহেব তার বিস্তারিত অবস্থা জানার পর বললেন, তুমি দোকান চালাও, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাক এবং স্থানীয় মুজাহিদদেরকে সহযোগীতা করতে থাক। এই বেচারা জিহাদে শরীক হওয়ার চিন্তা মাথায় নিয়ে দোকানও চালায়, সন্তানদের দেখাশুনাও করে। আবার মুজাহিদদেরকে সহযোগীতাও করে।

অপর ব্যক্তি পিয়াজ খান। সে কোন আমীরের অধীনে নেই। সে দোকান চালায় আর ভাবে, রিয়াজ খানও দোকানদার। আমীর সাহেব তাকে বলেছেন, তুমি দোকান চালাও, সন্তানদের দেখাশুনা কর; মুজাহিদদেরকে আর্থিক সহায়তা কর, এটাই তোমার জিহাদ। তাহলে তো আমিও দোকান চালাই, সন্তানদের দেখাশুনা করি। আমার সন্তান তো রিয়াজ খানের চেয়ে এক ডজন বেশী। কারণ, আমার স্ত্রী তিনজন। আমি খুব জিহাদ করছি, আমি মুজাহিদদেরকে মাসিক সহায়তা করছি, তারপরেও কি আমি জিহাদের সওয়াব পাব না?

আমরা আশাবাদী যে, উপরের উদাহরণ থেকে আপনারা উভয় ব্যক্তির কাজের পার্থক্য সহজেই বুঝতে পেরেছেন। এখানে রিয়াজ খান তো আমীরের আনুগত্য করে সব কাজ করছে; কিন্তু পিয়াজ খান আমীর বিহীন মন মত কাজ করছে। আত্মপূঁজা করছে।

সংশয় -১৩

সহীহ বুখারীর হাদীস। রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে মহিলারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলে রাসূল ﷺ বলেন-

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : "استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم في الجهاد فقال (جهادكن الحج) "

- صحيح البخارى: ٤٠٢/١ باب جهاد النساء. رقم الحديث:٢١٧٥ - مسند أحمد : ١٧/ ٣١٥ - السنن للبيهقى: ٨٨٨١ باب حج النساء.

'হজ্জ করাই তোমাদের জিহাদ।'

এই হাদীসে 'হজ্জ' কে জিহাদ বলা হয়েছে। অথচ 'হজ্ব' ভিন্ন একটি ইবাদত। যুদ্ধের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই? বরং এক হাদীসে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে-

عن عائشة قالت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ،الحج والعمرة "

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মাহিলোাদের উপর কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, রক্তপাতহীন জিহাদ হচ্ছে হজ্ব এবং ওমরা।

সুতরাং দুটি হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জিহাদের অর্থ শুধু কিতালই নয়; বরং যে ইবাদতের মধ্যে কষ্ট রয়েছে তাকেও জিহাদ বলা যায়!

সমাধান -১

হজ্জ ও জিহাদ উভয়টি স্বতন্ত্র ইবাদত। উভয়টির আহকামও ভিন্ন ভিন্ন। অনেক হাদীসেই দুটিকে পৃথক পৃথক করে আলোচনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীর অন্য হাদীসে দেখুন, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা

। এরপর প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এরপর প্রশ্ন করা হলো, তারপর কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কবুল হজ্জ সর্বোত্তম আমল।

পরিপূর্ণ হাদীসটি এই-

عن أبي هريرة : "سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال (إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله) . قيل ثم ماذا؟ قال : جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور."

- صحيح البخارى: ٢٠٦/١ باب فضل حج المبرور . رقم الحديث:١٥١٩

- صحيح إبن حبان: ٣٦٥/١ رقم الحديث:١٥٢

একই বিষয়ে যেহেতু দ্বিমূখী হাদীস পাওয়া যায় তাহলে একটি হাদীস দেখেই ফলাফল বের করার চেষ্টা করা শরীয়তের মেযাজ ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়। এজন্য সবগুলো হাদীস সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সমাধান-২

যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে বা রাষ্ট্র প্রধানের নির্দেশক্রমে মহিলোাদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায় আর তখন যদি কোন মহিলোা বলে, আমি তো হজ্জ করব। জিহাদে যাব কেন? হজ্জ করাই তো আমার জিহাদ। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ করাই মহিলোাদের জিহাদ। তখন কি কোন জ্ঞানীব্যক্তি তার এই যুক্তি মেনে নিবে? সে হজ্জ পালন করার দ্বারা কি তার থেকে জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে যাবে?

সমাধান-৩

হাদীসের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা হলো এই যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় মহিলোাদের উপর জিহাদ ফরয নয় তাই তাদেরকে সান্তনা দেয়ার জন্য এ কথা বলা হয়েছে যে, পুরুষেরা যেমন যুদ্ধের ময়দানে অনেক পরিশ্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে তেমনি মহিলোারা যদি আল্লাহর দেয়া সীমা রেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে হজ্জ করে

এবং কষ্ট সহ্য করে সবগুলো রুকন যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে তারা এই হজ্জের সুবাদে জিহাদের সওয়াব পাবে।

এজন্যই মহিলোাদের জিহাদ শুধু 'হজ্জ' বলা হয় নাই; বরং "حج مبرور"কবুল হজ্জের কথা বলা হয়েছে। কেননা মহিলোদের মত নাযুক প্রকৃতির মানুষের জন্য হজ্জের কষ্ট করা এবং পর পুরুষদের উপস্থিতিতে পর্দার প্রতি লক্ষ্য রেখে হজ্জে মাবরুর-মাকবুল হজ্জ করা বাস্তবেই তা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কষ্টের চেয়ে কম নয়। মূলত এ কথার উপর ভিত্তি করেই তাদের হজ্জের ক্ষেত্রে রূপক অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

হজ্জ ও জিহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বুঝার জন্য মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা আসলাম শেখপুরী (হাফিযাহুল্লাহ) এর "খাযীনা" নামক কিতাব থেকে কিছু ইবারত এখানে উল্লেখ করছি-

হজ্জ এবং জিহাদের সম্পর্ক

১. জিহাদের ময়দানে একটি কেন্দ্র থাকে যার সাথে মুজাহিদগণ সম্পৃক্ত থাকেন। তেমনিভাবে হজ্জের মধ্যেও একটি কেন্দ্র থাকে যার সাথে সকল হাজী সম্পৃক্ত থাকেন।

২. যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগণ একজন আমীরের অধীনে থাকেন। তেমনিভাবে হজ্জের ক্ষেত্রেও একজন আমীরে-হজ্জ নির্ধারিত থাকেন।

৩. সব মুজাহিদদের জন্য যেমন একপ্রকার বিশেষ সামরিক পোষাক থাকে তেমনি সব হাজীদেরও ইহরামের পোষাক থাকে।

৪. মুজাহিদদের কখনো কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত গোসলের সুযোগ হয় না। যার কারণে শরীর ময়লা হয়ে যায়। হাজীসাহেবদেরও কখনো প্রায় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়।

৫. যুদ্ধের জন্য যেমন ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয় তেমনি হজ্জের জন্যও ঘর-বাড়ি ছাড়তে হয়।

৬. যুদ্ধে সাধারণত মুজাহিদদেরকে পর্যায়ক্রমে ক্যাম্প পরিবর্তন করতে হয়। তেমনিভাবে হজ্জের ক্ষেত্রেও মক্কা থেকে মিনা, মিনা থেকে আরাফা, আরাফা থেকে মুজদালিফা, মুজদালিফা থেকে মিনা এবং মিনা থেকে মক্কায় যেতে হয়।

৭. যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম-শৃংখলা থাকে। তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রেও নিয়ম-শৃংখলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

৮. যুদ্ধ ক্ষেত্রে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার বিশেষ নির্দেশনা থাকে। তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রেও এসব বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।
৯. জিহাদের মধ্যে শয়তানের এজেন্ট কাফেরদেরকে হত্যা করা হয়। হজ্জের মধ্যেও শয়তানের প্রতিকৃতিতে কংকর-পাথর মারা হয়।
১০. জিহাদে মানুষের তাজা রক্তের নাযরানা পেশ করা হয়। আর হজ্জে পশুর রক্ত পেশ করা হয়। যা মূলত হযরত ইসমাইল আ. এর মানবীয় রক্তের বদলা।
১১. জিহাদে বিজয়ের পর কেন্দ্রে সংবাদ পাঠানো হয় এবং বিস্তারিত রিপোর্ট করা হয়। হজ্জের ক্ষেত্রে হজ্জের কাজ সম্পন্ন করার পর মূল কেন্দ্রে বাইতুল্লায় হাজিরা দেয়া হয়।
১২. মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে এবং আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা করতে থাকে। হাজীরাও তালবিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষনা দেয় এবং অন্তর জাগ্রত করে।

এসব সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে হজ্জকে রূপক অর্থে জিহাদ বলা হয়েছে শুধু মহিলোাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু অকারণে জিহাদের অর্থে ব্যপকতা আনার জন্য হজ্জ অথবা অন্যান্য কাজকে জিহাদের অর্থে ব্যবহার করা তো ঠিক নয়।

সমাধান-৪

হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. এর ভাষ্য মতে “হজ্জ” মূলত জিহাদেরই প্রশিক্ষণ, অনুশীলন এবং পূর্বপ্রস্তুতি।

তাহলে তো উত্তর আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ট্রেনিংয়ের মধ্যে যেমন যুদ্ধ হয় না তেমনি ট্রেনিংকে যুদ্ধও বলা যায় না। হ্যাঁ, ট্রেনিং অবশ্যই যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি এবং এর গুরুত্ব যুদ্ধ থেকে কোন অংশে কম নয়। ট্রেনিংকে যুদ্ধের অংশ মনে করা এক হিসাবে বাস্তব সম্মতও।

এ বিষয়ে হযরত মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ–“ইলহামুর রহমান” এ যা লিখেছেন তার সরাংশ হলো ঃ সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে হজ্জের হুকুম দেয়া হয়েছে। এর বর্ণনা সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত থেকে ২০৩ নং আয়াতে রয়েছে। এই সবগুলো আয়াতই হজ্জ বিষয়ক। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

عن عائشة قالت : يارسول الله على النساء جهاد ؟ قال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ،الحج والعمرة "

অর্থাৎ রক্তপাতহীন জিহাদ হচ্ছে হজ্জ এবং ওমরা। এতে শত্রুর মুখোমুখি হতে হয় না।

সংশয় -১৪

এই আপত্তিটি আলোচনা করার পাশাপাশি একটি ঘটনাও উল্লেখ করছি, যা আমার সাথেই ঘটেছিল। একবার আমি মুজাহিদ ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য "সারগোধা" জেলার "মঢরাঞ্জ"এলাকায় যাই। তখন সেখানকার মুজাহিদ সাথীরা বলল, আমাদের "শুকরানী" জামে মসজিদে তাবলীগ জামাতের লোকেরা এসে আমাদেরকে অস্থির করে ফেলেছে।

তারা বলে হাদীস শরীফে এসেছে-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تمسك بسنتي عند فسادأمتي فله أجرمائة شهيد"

- مشكاة المصابيح للتبريزى: ٣٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة – الفصل الثانى،

অর্থ: ফেৎনা-ফাসাদের যুগে যে ব্যক্তি আমার একটি সুন্নত আঁকড়ে ধরবে, সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে।

তাহলে আপনার মুজাহীদরা কেন অযথা কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের পাহাড়ে গিয়ে এত কষ্ট করছেন? ঘর-বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে মা-বাবাকেও কষ্ট দিচ্ছেন? যদি শহীদ হন তাহলে বেশীর থেকে বেশী এক শহীদের সওয়াব পাবেন। এর চেয়ে ভালো হবে, ঘরে থেকে দ্বীনের মেহনত করেন, দৈনিক কয়েকটি "সুন্নত" জিন্দা করেন। তাহলে হাজার হাজার নয়; বরং লাখো শহীদের সওয়াব পাবেন।

এই হাদীসটিসহ আরো অন্যান্য হাদীস যেগুলো মূলত দ্বীন প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বর্ণিত, সেগুলো দ্বারা ইসলামের দুশমন, মুনাফিক ও কিছু অবুঝ দ্বীন-দরদী মুসলমান অন্য মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। নিজেও ধ্বংস হচ্ছে অন্যকেও ধ্বংস করছে। এজন্য এই হাদীসটির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে।

সমাধান -১

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, সুন্নাহ দুই ধরনের। সুন্নতে আদত ও সুন্নতে ইবাদত। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু কাজ আল্লাহর তা'য়ালার ইবাদত হিসাবে করেছেন। আর কিছু কাজ মানবীয় চাহিদার ভিত্তিতে করেছেন। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গোটা জীবনই ইবাদত।
যেমন দেখুন, মাথায় তেল লাগানো, চিরুনি করা, খাওয়ার পর মেসওয়াক করা, ঘুমানোর আগে মেসওয়াক করা, খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া, মিষ্ট দ্রব্য পছন্দ করা এবং জুতা ব্যবহার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস ও মানবীয় প্রয়োজনের তাগিদে করেছেন।
কিন্তু অজুর সময় মেসওয়াক ব্যবহার করা, নামাযের জন্য আযু করা, ফরয গোসল ও শরীয়তের অন্যান্য আমল যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত হিসাবেই করেছেন। এই হাদীসে সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐসব সুন্নত যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত হিসব করেছেন। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐ সব সুন্নতও অনুসরণীয় যেগুলো তিনি অভ্যাস ও মানবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে করেছেন এবং এটাও অনেক সাওয়াবের কাজ।
আপনি ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলতে পারেন যে, সুন্নত দুই ধরনের এক. সুন্নতে শরইয়্যাহ। দুই. সুন্নতে তাবইয়্যাহ। সুন্নতে শরইয়্যাহর অনুসরণ করা আবশ্যক। আর সুন্নতে তাবইয়্যাহর অনুসরণ আবশ্যক নয়।

সমাধান-২

সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের কোন হুকুম জিন্দা করা। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে-"من أحى سنتى" 'যে আমার একটি সুন্নত জিন্দা করল' অথবা সুন্নত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়তের কোন হুকুম মজবুতভবে আঁকড়ে ধরা। যেমনটা এই হাদীস থেকে বুঝে আসে। আর শরীয়তের আহকামসমূহের মধ্যে 'জিহাদ' হুকুমটির উপর যে অবহেলোা করা হয়েছে অন্য কোনটির ক্ষেত্রে তা হয়নি। শত্রুদের কথা বাদই দিলাম, আপন মিত্ররাও এ নিয়ে কম আপত্তি করেনি।

শত্রুদের শত্রুতা তো বুঝা যায় কিন্তু মিত্রুদের মারপ্যাঁচ বুঝা বড় দায়। আর জিহাদ এমন একটি হুকুম যা জিন্দা হলে পূরা দ্বীনই জিন্দা হয়ে যাবে। জিহাদ শেষ হয়ে যাওয়া মানে দ্বীন শেষ হয়ে যাওয়া। এজন্য জিহাদের বিষয়ে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শরীয়তের অন্য কোন হুকুমের ব্যাপারে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আর জিহাদ যেহেতু পূর্ণ দ্বীনের ভিত্তি ও স্তম্ভ; সম্ভবত এ কারণেই হাদীস শরীফে জিহাদকে পরিপূর্ণ দ্বীন বলা হয়েছে।

عن ابن عمر ، قال : سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

- سنن أبي داؤود :٢/٤٩٠ باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:٣٤٦٢ - مسند أحمد:١١٤/٥ رقم الحديث:٥٥٦٢

'যখন তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের পিছনে পড়ে যাবে, গরুর লেজ ধরে রাখবে অর্থাৎ পশু পালনে লিপ্ত থাকবে এবং ক্ষেত-খামারের পিছে পড়ে জিহাদ ছেড়ে দিবে। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের উপর এমন লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন, দ্বীনের দিকে [জিহাদের দিকে] ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাদের থেকে সেই লাঞ্চনা দূর করা হবে না।'

এই হাদীস শরীফে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জিহাদ। সুতরাং জিহাদ করাই প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীসের কাছাকাছি অর্থ। [বজলুল মাজহুদ শরহে আবু দাউদ]

সমাধান-৩

হাদীস শরীফে সুন্নত জিন্দা করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যাক্তি আমার একটি সুন্নত আঁকড়ে ধরবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে, হাদীসের উদ্দেশ্য কি এ মন যে, জিহাদের ময়দানে গিয়ে আর যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই [নাউযুবিল্লাহ।] তাহলে যেসব হাদীসে কোরআন শরীফের বিশেষ কিছু সূরার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন সূরা ফাতেহা সাওয়াবের দিক থেকে দুই তৃতীয়াংশ কোরআনের সমপরিমাণ, আর সূরা ইয়াসিন হলো কোরআন শরীফের অন্তসার। যে সূরা ইয়াসিন পড়বে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে দশবার কোরআন খতমের সওয়াব দিবেন। চারবার সূরা কাফিরুন, অন্য এক বর্ণনামতে তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে পুরো কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সওয়াব দান করার উদ্দেশ্য কি এটাই হতে পারে? যেসব মাদ্রাসায় পুরো কোরআন শরীফ মুখস্থ করানো হচ্ছে সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক। কি প্রয়োজন আছে পুরো কোরআন শরীফ মুখস্থ করার? এক সূরা পড়লেই যখন দশ খতমের সওয়াব পাওয়া যায় তাহলে কি প্রয়োজন আছে পুরো কুরআন শরীফ পড়ার? কোন সাধারণ ও স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিও কি এমন কথা বলতে পারে? এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করতে পরে? কক্ষনো না। তাহলে অযথা জিহাদের সাথে এমন শত্রুতা-বিদ্বেষ কেন?

সমাধান-৪

এবার আসুন! উল্লেখিত হাদীস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিই। হাদীস শরীফে ফেৎনার যুগে কোন সুন্নত মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা বা জিন্দা করার ভিত্তিতে একশ শহীদের সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। এজন্য এখানে খুব ভালোভাবে বুঝে নিন যে, এখানে দুটি জিনিস রয়েছে। একটি হলো প্রতিদান ও পারিশ্রমিক আর আরেকটি হলো মান ও পদ-মর্যাদা। পারিশ্রমিক এক জিনিস আর মান-মর্যাদা ভিন্ন জিনিস। সুন্নত আদায়কারী কোন ব্যক্তি একশ শহীদের পারিশ্রমিক পাওয়ার পরেও একথা বলা যাবে না যে, সে একজন শহীদের মান-মর্যাদাও পেয়ে যাবে। কারণ, পারিশ্রমিক আর মর্যাদা কোনদিন সমান হতে পারে না। এজন্য যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানকারী মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা যে মর্যাদার ওয়াদা করেছেন, তার বিপরীত একশ কেন লক্ষ শহীদের পারিশ্রমিকও তাঁর সমপরিমাণ হবে না।

শত শহীদের সওয়াব পাবে সুন্নত জিন্দায়;

কিন্তু তাহার নেই যে প্রভাব শহীদের মর্যাদায়।

শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের দিন যখন শহীদ আসবে তখন তার আসার পথে যদি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর মত নবী-রাসূলও থাকেন তাহলে তাঁকেও নির্দেশ দেয়া হবে, রাস্তা ছেড়ে দাও, শহীদরা আসছে। তাঁদের ইস্তেকবাল ও অভ্যর্থনার জন্য সবাইকে একদিকে সরিয়ে রাস্তা খালী করে দেওয়া হবে।

শহীদের মর্যাদা হলো এমন যে, একজন শহীদ কিয়ামতের দিন তার পরিবারের সত্তর জন্য জাহান্নামীর জন্য সুপারিশ করবে এবং তার সুপারিশ গৃহীত হবে। শহীদের মর্যাদা পাওয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ দশবার শহীদ হওয়ার তামান্না করেছেন। অর্থাৎ নবুওয়াত পাওয়া সত্ত্বেও "শাহাদাতের" মর্যাদার তামান্না করেছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা সে তামান্না পূর্ণও করেছেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত বিষের প্রভাবেই হয়েছে। খয়বার যুদ্ধের সময় এক ইহুদী মহিলো গোস্তের সাথে বিশ মিশিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিয়েছিলো। আর বিষ প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু বরণ করলে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহর রাসূল বারবার শাহাদাতের তামান্না করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, শাহাদাতের মর্যাদা নবুওয়াতের উর্দ্ধে। বরং নবুয়তের মর্যাদায় সমাসীন হওয়া সত্বেও বারবার তামান্না করেছেন উম্মতকে শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য।

মর্যাদা ও পারিশ্রমিক এক নয়

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির একটি মান ও পদমর্যাদা রয়েছে। তিনি কিছু দায়িত্ব পালন করেন। এই সুবাদে কিছু বেতনও পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতির বেতনটাকে আপনি পারিশ্রমিক বলতে পারেন। এখন রাষ্ট্রপতির বেতন তো এত সামান্য যে, কোন ফ্যাক্টরীর জেনারেল ম্যানেজার কিংবা কোন ব্যাংকের একজন বড় কর্মকর্তার বেতনও তার কয়েকগুণ বেশী হতে পারে। কিন্তু দেশের সব ইঞ্জিনিয়ার বা বড় বড় গার্মেন্টস-ফ্যাক্টরীর জি,এমদের মান একসাথে করলেও রাষ্ট্রপতির মর্যাদার সমান হতে পারে না। সুতরাং শহীদের পারিশ্রমিক আর পদ-মর্যাদার মাঝে এই পার্থক্যটি ভালোভাবে বুঝতে পারলে আর কোন সংশয় থাকবে না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা! দ্বীনের কাজ করুন এবং দ্বীনের বুঝ হাসিল করুন। কাফেরদের সুক্ষ্ম চালের শিকার হয়ে দ্বীনের স্বরুপ বিকৃত করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ্ বুঝ দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয় -১৫

কিছু কিছু দ্বীনী মহলে খুব জোরে-সোরে একথার প্রচার করা হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজ প্রয়োজনে এক টাকা খরচ করে সে এর বদলায় সাত লাখ টাকার সওয়াব পাবে। আর এক ওয়াক্ত নামাজে উনপঞ্চাশ কোটি নামাজের সওয়াব পাবে। আমরা দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচার-প্রসারের কাজ করছি। আর দাওয়াতও তাবলীগের কাজ সবচে বড় কাজ।

বাকী সব তো দ্বীনের শাখা-প্রশাখা মাত্র। দাওয়াতের আমলই আসল এবং পরিপূর্ন দ্বীন। সুতরাং এই সওয়াব শুধু তারাই পাবে যারা দাওয়াতও তাবলীগের কাজ করে। এটাই প্রকৃত আল্লাহর রাস্তা। এর দ্বারাই দ্বীন জিন্দা হয়। জিহাদের আবার প্রয়োজন কিসের?

সমাধান-১

সর্ব প্রথম ঐ হাদীসটি দেখুন, যাতে এক টাকায় সাত লাখ টাকার সওয়াব এবং এক ওয়াক্ত নামাজে উনপঞ্চাশ কোটি নামাযের সওয়াব পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরপর দেখুন, এ হাদীসগুলোর মান কেমন? তৃতীয়ত দেখুন, এমন সাওয়াবের প্রথম হকদারকে? এখন আমরা এই তিনটি বিষয়কে ক্রমানুসারে বর্ণনা করবো।

এক.

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. হযরত আবু দারদা রা., হযরত আবু হুরায়রা রা. হযরত আবু উমামা রা. হযরত ইবনে ওমর রা. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

"من أرسل نفقة فی سبيل الله وأقام فی بيته فله بكل درهم سبع مائة درهم ومن غزا بنفسه فی سبيل الله وأنفق فی وجهه كذلك فله بكل درهم ألف درهم (ابن ماجه عن الحسن بن علی،وأبی الدرداء،وأبی هريرة،وأبی أمامة،وابن عمر،وابن عمرو، وجابر،وعمران بن حصين)."

- جامع الأحاديث لجلال الدين :٤٥٥٣٢ - سنن إبن ماجة : ١٩٨ - باب فضل النفقة في سبيل الله .

যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে অবস্থান করে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ পাঠায় সে এক টাকার বিনিময়ে সাতশ টাকার সওয়াব পাবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পদ ব্যয় করে, সে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকার সওয়াব পাবে। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পাঠ করেন, "আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

হযরত মুয়ায রা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- "আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা, যিকির করা এবং আল্লাহর সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা সাতশগুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়।"

সহজ হিসাব

জিহাদরত অবস্থায় এক টাকার সওয়াব সাত লক্ষ টাকা আর শুধু আল্লাহর রাস্তায় থাকলে এক টাকার সওয়াব সাতশ টাকা। তাহলে আমরা হিসাবটি এভাবে করি, যিনি জিহাদরত আছেন তিনি আল্লাহর রাস্তায়ও আছেন। তিনি একদিকে জিহাদের জন্য পাচ্ছেন সাত লক্ষ অপরদিকে আল্লাহর রাস্তায় থাকার জন্য পাচ্ছেন সাতশ। তাহলে এই সাতশদিয়ে সাত লক্ষকে পূরণ করলে হবে,
(৭০০×৭০০০০০=৪৯০০০০০০০) উনপঞ্চাশ কোটি। সুতরাং এই দৃষ্টিকোন থেকে, বলা হয়ে থাকে আল্লাহর রাস্তায় নামাজ, রোযা, যিকিরসহ প্রত্যেকটি ইবাদতের সওয়াব আল্লাহ তা'য়ালা উনপঞ্চাশ কোটি বাড়িয়ে দেন।[৪]

দুই. হাদীসের মান

এই দুইটি হাদীস সনদের দিক থেকে একেবারেই "জইফ" এজন্য সমস্যা বর্ণনা করা ছাড়া এসব হাদীসের শুধু ব্যখ্যা করা জায়েজ নেই। [তাবলীগ জামাত ও উনপঞ্চাশ কোটির সওয়াব, যুগশ্রেষ্ঠ মুফতী শহীদ রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহ.]

তিন. সওয়অবের হকদার কারা?

যদি চিন্তা করা হয় তাহলে এককথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই হাদীসের সর্ব প্রথম ও সর্বোত্তম ধারক-বাহক হলেন মুজাহিদগণ। কেননা নামাজ, রোযা ও জিকিরের জন্য উনপঞ্চাশ কোটি সওয়াব তো তখন দেয়া হবে যখন তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পথে সম্পদ ব্যয় করবে। সুতরাং "النفقة في سبيل الله" এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এই সওয়াব তখনই পাবে যখন একটি শর্ত পাওয়া যাবে। আর তা হলো আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধের কাজ মুজাহিদরা ছাড়া আর কে করে? ফুক্বাহায়ে কেরাম তো একথা সুস্পষ্ট বলে

---

[৪]প্রিয় পাঠক! আপনারাই চিন্তা করুন, মসজিদে বসে দ্বীনে ফিকির করা, বিভিন্ন স্বাধের জিনিস পানাহার করাই কি জিহাদ? আর নয়-ছয় মিলিয়ে উনপঞ্চাশ কোটির হিসাব কষানো কতটুকু যুক্তি সম্মত? 'জিহাদ ও দাওয়াতের উদ্দিশ্য এক' এই বাহানা করে জিহাদের মূল অর্থকে বিকৃত করা কখনোই ঠিক হবে না। আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আমীন!

দিয়েছেন যে, স্বাভাবিকভাবে যখন ফী সাবীলিল্লাহ শব্দটি বলা হবে তখন এর দ্বারা উদ্দিশ্য হবে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। উল্লিখিত হাদীস শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, "غزا بنفسه" যার অর্থ যুদ্ধ করা। এখানে আল্লাহর রাস্তা বলতে যুদ্ধের ময়দানই উদ্দেশ্য।

এজন্য একথা বলা যথার্থ হবে যে, এই হাদীসের সারাসরি উদ্দেশ্য মুজাহিদগণ। যদিও পরোক্ষভাবে ঐসব ভাইয়েরাও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা দ্বীনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় কাজ করেন।

দয়ার সাগর হতে এটা নয়তো অনেক দূরে
চাইলে তিনি দিতে পারেন অসংখ্য সওয়াব মোরে।
তার জন্য লাগবে তবু জীবন বাজী খেলা
সখ-বিলাসের মাঝে ডুবে পাবে কি তা হেলোা!

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এসব পুরষ্কার বরং তার চেয়ে আরো বেশী দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

মুহতারাম দোস্ত ও বুযূর্গ! আপনাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, হাদীস গুলোর ব্যখ্যা করার সময় আল্লাহ ভয়ের ব্যাপারটি সামনে রাখুন। নতুবা দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। নিজের মনমত হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা এটাও কি দ্বীনের খেদমত?

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বর্তমান প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতকে পূর্ন দ্বীন মনে করা এবং দ্বীনের মূল কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করে দ্বীনের অন্যান্য খেদমতকে দাওয়াত ও তাবলীগের শাখা-প্রশাখা বলা একেবারেই মূর্খতা। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আছে। একটু ভালোভাবে বুঝে নিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীন বিকৃতি এবং দ্বীনের অপব্যাখ্যা থেকে হেফাজত করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সংশয় -১৬

"فقال فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم"

- الصحيح البخاري: ٤١٣/١ باب دعاء النبي صلى الله عليه و سلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. رقم الحديث:٢٩٤٢ - سنن أبي داؤود : ٥١٥/٢ باب فضل نشر العلم. رقم الحديث:٣٦٦١

খায়বার যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ হযরত আলী রা. কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমার কারণে একজন ব্যক্তি হেদায়েতের উপর এসে যাওয়া লাল উটের পাল সদকা থেকে উত্তম।'
এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে শক্তি-সামর্থ ব্যয় না করে আমাদের উচিত তাদের ইসলাম গ্রহণের চিন্তা করা এবং তাদের উপর দাওয়াতের মেহনত করা।

সমাধান -১

এটা ঠিক আছে, একজন কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়ে আমাদের খুব ফিকির করা উচিত। কিন্তু এর থেকে এটা কি করে প্রমাণিত হয়, যে কাফের নিজে ঈমান আনে না; বরং ইসলামের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এমন কাফেরকে হত্যা করা উচিত নয়। অথচ কোন কোন কাফেরদেরকে হত্যা করাই মূলত অন্যান্য কাফেরদের ঈমান আনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমাধান -২

রাসূল ﷺ এর এই পবিত্র বাণী শোনার পর খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী রা. আর কোন কাফেরকে হত্যা করেননি? অন্যান্য সাহাবীরাও কি যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন? তাহলে বীর মোরাহহাবের হাশর কে করেছিল? তাকে মৃত্যুর ঘাটে কে পৌঁছে দিয়েছিল?

সমাধান -৩

যদি এই হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হয় যা একটু আগে প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা করেছেন। তাহলে ঐসব হাদীসের উদ্দেশ্য কি হবে? যাতে রাসূল ﷺ কাফেরদেরকে হত্যা করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন এবং একজন কাফেরকে হত্যা করার প্রতিদান হিসাবে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

হয়ত যদি ঈমান আনে কোন কাফের জনে
শত উটের চেয়ে দামী একথা সবাই মানে।
তাই বলে কেউ অর্থ কি তার এরূপ ভাবতে পারে;
দুষ্ট কাফের নিধন করা তার চেয়ে কম নারে?

এজন্য আমার আন্তরিক আবেদন হলো, কাফেরদের ঈমানের ফিকির করা যেমন আবশ্যক তেমনি দাম্ভিক কাফেরদের দাম্ভিকতা দূর করা এবং বিকৃত মস্তিষ্কের

অধিকারী কাফেরদের মস্তিষ্ক ঠিক করার ফিকির করাও জরুরী। যাতে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। আমাদের ঈমান মজবুত হয়ে যায়। ইসলামের বিজয় ও শান-শাওকত দেখে লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীন বুঝার এবং পূর্ণ দ্বীনের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

ইতি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, জিহাদ মূলত দাওয়াত। তবে এ দাওয়াতের মেহনতের সাথে শক্তিও রয়েছে। সুতরাং জিহাদকে ভিন্ন কিছু মনে করা বা শুধু কাটাকাটি-মারামারি মনে করা নিতান্তই মূর্খতা। বরং জিহাদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী দাম্ভিক কাফেরকে হত্যা করলে হাজারো মানুষের হেদায়াতের দরজা খুলে যায়। 'সুন্দর সুন্দর কথা বললেই শুধু মানুষ হেদায়াত পায় আর জিহাদের মাধ্যমে হেদায়াত পায় না।' একথা আপনাকে কে বলেছে?

সংশয় -১৭

সংশয় ও সমাধান লেখার আগে আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ১৯৯৮ সালের কথা। আমি কাবুলের পাশে এক এলাকায় মুজাহিদদের খালিদ বিন ওয়ালিদ ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই। সেখানকার ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষকগণ বললেন, ট্রেনিং সেন্টারে দৈনিক যোহরের নামাজের পর 'ফাজায়েলে আমল' তালীম করা হয়। কিন্তু একটি হাদীসের কারণে আমরা যথেষ্ট পেরেশানীর শিকার হয়েছি। এক পর্যায়ে পেরেশানীর কারণে ঐ হাদীসের তালীমই নিষিদ্ধ করে দিয়েছি। কারণ, এতে মুজাদিদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এই হাদীসের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও আমাদের জানা নেই। আমি নিজেই আশ্চর্য হলোম, এটা কি করে সম্ভব? কোন হাদীস কি এমন হতে পারে যা মুজহিদদের জন্য কেন দ্বীনের যে কোন শাখায় কর্মরত কোন মুসলমানের জন্য পেরেশানীর কারণ হবে? হাদীস তো দ্বীনই-দ্বীন। এর দ্বারা দ্বীনের উপর আমল করা সহজ হবে। পেরেশানীর কারণ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, আমি যোহরের নামাযের পর ঐ হাদীসটিই তালীম করি এবং তার ব্যাখ্যা আলোচনা করি। এতে মুজাহিদদের সাথে সাথে প্রশিক্ষকগণও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। প্রথমে আমি ফাযায়েলে আমালের ঐ হাদীসটি ব্যাখ্যা করবো। তারপর আসল প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবো ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সাবাইকে সত্য বলার এবং সত্যের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন !

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ،قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ مِنْ بَلِيٍّ حَىٍ مِنْ قُضَاعَةَ أَسْلَمَامَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم،فَاسْتُشْهِدَ أَحَدُهُمَا،وَأُخِّرَالآخَرُسَنَةً. قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللّهِ: فَرَأَيتُ الْمُؤَخَّرَمِنْهُمَا أُدْخِلَ قَبْلَ الشَّهِيدِ،فَتَعَجِبْتُ لِذَلِكَ،فَأَصْبَحْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم،أَوْذُكِرَذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم،فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ قَدْصَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ،وَصَلَّى سِتَّةَ آلافِ رَكْعَةٍ،أَوْكَذَا وكَذَا رَكْعَةً صَلاَةَالسَّنَةِ.

'হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, কুযা'আ গোত্রের দুই সাহাবী একসাথে মুসলমান হন। তাদের একজন যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। অপর জন এক বছর পর মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যে সাহাবী এক বছর পর ইনতেকাল করেছিলেন তিনি শহীদ সাহাবীর আগে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। আমি খুব আশ্চর্য হলোম। [শহীদের মর্যাদা অনেক উর্ধে তারতো আগে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা।] সকালবেলা আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করলাম বা অন্য কেউ রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন রাসূল ﷺ বললেন যে সাহাবীর ইন্তেকাল এক বছর পর হয়েছে, তার নেক আমল তো অনেক বেশী হয়েছে। সে এক রমজানের রোযা বেশী রাখেনি? এবং এক বছরে ছয় হাজার রাকাত বা তার চেয়ে আরো কতো বেশী রাকাত নামাজ পড়েছে।

সমাধান

উত্তর দেয়ার আগে ভূমিকা স্বরূপ কিছু জরুরী কথা উল্লেখ করছি। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

إنما الأعمال بالنيات ..... الصحيح للبخاري: ٢/١ رقم الحديث: ١

নিশ্চই আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

অন্য হাদীসে এসেছে-

عن سهل بن سعدالساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نيةالمؤمن خيرمن عمله"

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ-উত্তম।' অর্থাৎ অনেক সময় মুমিন কোন নেক কাজের নিয়ত করে; কিন্তু কোন কারণবসত ঐ কাজটি করতে পারে না। তাহলে নিয়তের কারণে সে অবশ্যই প্রতিদান পাবে। দেখুন ! কোন ব্যক্তি যদি কুরআনে কারীম হেফজ করার নিয়ত করে হিফজ শুরু করে; এর জন্য অনেক মেহনতও করে কিন্তু সে মেধা সল্পতার কারণে শেষ করতে না পারে অথবা পড়াশোনার মাঝেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। তাহলে অবশ্যই তাকে কিয়ামতের দিন হাফেযদের সাথে উঠানো হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে রওয়ানা হয়। কিন্তু রাস্তায় তার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন হাজ্বীদের কাতারে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ চাহেতো তাকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে হজ্জের পূর্ণ সওয়াব এবং প্রতিদান দান করবেন। দেখুন! আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন যে, হিজরতের নিয়তে ঘর থেকে রওয়ানা হয় এবং মাঝ পথে তার মৃত্যু হয়ে যায়,

"وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً"

'আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও স্বচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয়; তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' [সূরায়ে নিসা:১০০]

উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হলো, প্রত্যেক আমলেরই একটি বাহ্যিক রূপ এবং হাকীকত ও বাস্তবতা রয়েছে। সওয়াব ও প্রতিদান মূলত ঐ হাকীকত ও বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই হয়; বাহ্যিক রূপের উপর নয়। যদি নিয়ত ঠিক না থাকে, শুধু বাহ্যিক রূপ থাকে তাহলে আখেরাতে কোন সওয়াবই পাবে না। যেমন আলেম, দানবীর ও শহীদ ব্যক্তির ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, এদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হবে। কেননা তাদের নিয়ত ভালছিলনা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং লোক দেখানো এবং সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো।

এখানে যদিও ইলেম, তালীম, দানশীলতা এবং শাহাদাতের বাহ্যিক রূপ আছে; কিন্তু হাকীকত বাস্তবতা নেই। যার জন্য ফলাফল ভালো আসেনি। আর পূর্বে আলোচিত সূরাতে যেখানে হাফেজে কুরআন বা হাজ্জী ও মুহাজির তাদের আমল পূর্ণ না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু পূর্ণ সওয়াব ও প্রতিদান তারা পেয়েছে। কেননা সেখানে নিয়ত সঠিক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মেহনতও ছিল। যার কারণে কাজের হাকীকত-লিল্লাহিয়্যাত ও বাস্তবতা সেখানে ছিলো। সুতরাং এক্ষেত্রে আমল পরিপূর্ণ না হলেও তারা সফল। আর এ দিকে আমল পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ। এমনিভাবে শহীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

حدثني أبو شريح أن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه" ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه (بصدق)

- صحيح المسلم : ١٤١/٢ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. رقم الحديث:٤٨٩٣ - صحيح إبن حبان :٤٦٥/٧ رقم الحديث:٣١٩٢ . - سنن أبي داوود : ٢١٣/١ باب الإستغفار. رقم الحديث:١٥٢٠ ،

'কোন ব্যক্তি যদি সত্য দিলে আল্লাহর কাছে শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দিবেন। যদিও তার নিজের বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।'

এই হাদীসের আলোকে আমি আরজ করতে চাই, নববী যুগের উভয় ব্যক্তিই সাহাবী এবং উভয়েই শহীদ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একজনের শাহাদাত কামনা ও লিল্লাহিয়্যাত বাস্তবতার সাথে সাথে বাহ্যিক সুরত অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করার সৌভাগ্য হয়েছে। আর অন্যজনের শুধু শাহাদাতের বাস্তবতা অর্জন হয়েছে। তার নিয়ত চেষ্টা ও ছিল। কিন্তু ময়দানে শহীদ হননি বিধায় তিনি বাহ্যিক রূপ অর্জন করতে পারেন নি তাবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন সহীনিয়তের কারণে।

সুতারাং এখানে উভয়েই শহীদ। তবে দ্বিতীয় শহীদের এক বছরের নামাজ বেশী আছে এবং অন্যান্য আমলও বেশী আছে। এজন্যই দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির উপর অগ্রগামীলাভ করেছেন। অতএব আর কারো মনে এ নিয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকার কথা নয়।

কেউ দিব্য শহীদ কেউ অর্থের বিচারে
উভয়েই সফল ভাই রবের দরবারে।
একজন নামাজ, রোজায় অগ্রগামী তাই
প্রাধান্যের কারণহলো তার বর্ধিত আমল ভাই!

আমি যে বললাম, তারা উভয়ে শহীদ ছিলেন তার কারণ স্পষ্ট। কেননা রাসূল ﷺ নিজে যখন বার বার শাহাদাতের মৃত্যুর তামান্না করতেন তখন কিভাবে সম্ভব যে, একজন সাহাবী শাহাদাতের তামান্না করবেন না এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছনে থেকে যাবেন। সাহাবায়ে কেরাম তো কাফেরদের সাথে যুদ্ধের জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতেন।

একটি সংশয়

হ্যাঁ, এখানে কারো এই সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, রাসূল ﷺ কেন ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন না যেমন আপনি বললেন?

সমাধান

বন্ধুরা! সেখানে এমন বলার প্রয়োজনই ছিল না। কেননা সাহাবায়ে কেরাম তো এমন সুক্ষ্ম বিষয় খুব ভালোই বুঝতেন। সকল হাদীস তাঁদের সামনে ছিলো। তাদের সংশয় শুধু এই ছিলো, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে আগে গেল সে জান্নাতে কেন পরে গেল? রাসূল ﷺ এর ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, শাহাদাতের সাথে অন্যান্য আমলের আধিক্য ছিল এবং আগে জান্নাতে প্রবেশের কারণ এটাই।

বিশেষ আকর্ষণ

আসলে আমাদের এমন প্রশ্ন শুধু এজন্য সৃষ্টি হয় যে, আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনকে আমাদের জীবনের মতো মনে করি। وشتانا بين هؤلاء وبين هؤلاء(অথচ তাঁরা কোথায় আর আমরা কোথায়?) আমাদের মধ্যে যেমন কিছু লোক এমন আছে যারা জিহাদ থেকে দূরে থেকে শুধু নামাজ, রোজা পালন করে। নাউযুবিল্লাহ! হয়ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন লোক ছিলো। বিষয়টি কখনোই এমন নয়; বরং যারা জিহাদ থেকে পিছনে থাকত, তাঁদের বিশেষ কোন কারণ বা শরীয়ত সম্মত ওজর থাকত। নতুবা তারা তো এমন ছিলেন যে, বাবা ছেলের আগে এবং ছেলে বাবার আগে জিহাদে যাওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করতেন। উভয়ের মধ্যে লটারী হত। বাচ্চাদের মধ্যে জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য মল্লযুদ্ধ হত এবং মহিলোরা পর্যন্ত পবিত্র মদীনায় অবস্থান করাটা মেনে নিতে পারতেন না।

এখানে যাদের এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছে তারা মনে করেছেন যে, খোদা না খাস্তা হয়ত এক বছর পর ইন্তেকালকারী সাহাবী আমাদের মতই জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতিত নামাজ, রোযা করেছেন। সুতরাং তার যেসব নামাজ আমাদের নামাজের মতো ছিলো, হয়ত এসব কারনেই তিনি জিহাদ ওয়ালা আমল ও শাহাদাতের চেয়ে অগ্রগামী লাভ করেছেন। আসলে এমনটা মনে করা কখনোই ঠিক হবে না। করণ, তারা উভয়ে নামাজি, রোজাদার হওয়ার সাথে সাথে উভয়েই মুজাহিদ এবং উভয়েই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। এজন্য এখানে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার মত কিছুই নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সংশয় -১৮

বড় বড় মজলিস এবং লাখো জনতার সমাবেশে আজ একটি কথা অত্যন্ত নির্লজ্জতা এবং দুঃসাহসিকতার সাথে বলা হচ্ছে যে, শাসন ক্ষমতা দিয়ে কিছু হবে না। উজীর-উপদেষ্টা দিয়ে কিছু হবে না। শুধু আমলের উপর মেহনত কর। কেননা হাদীস শরীফে আছে,

فقد روي أعمالكم عُمَّالكم وكما تكونوا يولى عليكم .

তোমাদের আমলই তোমাদের শাসক। তোমরা যেমন আমল করবে তোমাদের উপর তেমন শাসক নিযুক্ত হবে।

যমীন থেকে আমাদের যে রকম আমল আসমানে যাবে; আসমান থেকে ঐরকম তেমন ফলাফলই যমীনে অবতরণ করবে। এজন্য ভাই! আমলের ফিকির কর। লড়াই করা, কাফেরদেরকে হত্যা করা ছেড়ে দাও। বসনিয়া, চেসনিয়া, ফিলিস্তিন ও কাশ্মীরে আল্লাহর আযাব এসেছে। কেননা তারা নেক আমল ছেড়ে দিয়েছে। যখন আমাদের আমল ঠিক হয়ে যাবে তখন এমনি সবঠিক হয়ে যাবে। আমাদের এমনি শাসন ক্ষমতাও অর্জিত হয়ে যাবে।

সমাধান -১

আস্তাগফিরুল্লাহ! কত বড় কুফুরী কথা জবান দিয়ে উচ্চারণ করছে এবং সহজ সরল লোকদেরকে বিষের বড়ির উপর চিনি লাগিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। ঈমানের মেহনতের আড়ালে কুফুরীকে মজবুত করা হচ্ছে। অন্তরে নেফাকির বীজ বপন করা হচ্ছে। এই মূলনীতি আমরা মানি, যে ধরনের আমল যমীন হতে আসমান যাবে, আসমান হতে সে ধরনের ফায়সালা অবতরণ হবে। কিন্তু এর দ্বারা এটা কিভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে, জিহাদ ছেড়ে দাও। কাফেরদের হত্যা করা ছেড়ে দাও।

আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি বদআমল? নাউযুবিল্লাহ! (আল্লাহ ক্ষমা করুন) কাফেরদেরকে হত্যা করা কি আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম এবং রাসূল ﷺ এর বরকতময় সুন্নত নয়? অস্ত্র রাখা কি আল্লাহ তা'য়ালার মুহাব্বতের আলামত নয়? মুজাহিদকে আল্লাহ তা'য়ালা ভালোবাসেন না? জিহাদের ময়দানের অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান করা সত্তর বছর ঘরের ইবাদত হতে উত্তম নয় কি? কাফেরকে হত্যার বিনিময়ে কি জান্নাতের সুসংবাদ নেই? একটি তীর নিক্ষেপের বিনিময়ে কি তিন ব্যক্তির জান্নাতের সুসংবাদ নেই?

বুঝা গেল যে, এধরনের শব্দ ও বাক্য 'জিহাদ ছাড়, নেক আমল কর) উচ্চারণকারীরা ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহর পথে জিহাদকে নেক আমল হিসাবে গণ্য করে না। যদি বিষয়টি এমনই হয় তাহলে তাদের নিজ ঈমানের ফিকির করা উচিত। ঈমানের মধ্যে কোন সমস্যা আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা উচিত।

সমাধান -২

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, শরীয়তের প্রতিটি আমলের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন। প্রতিটি আমলের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। যদিও প্রকৃত সফলতা আখেরাতের সফলতা এবং আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি। তবে দুনিয়াতে প্রত্যেকটি আমলের একটি ফলাফল রয়েছে। যা তার দুনিয়াবি লক্ষ্য উদ্দেশ্য। যখন যমীন হতে কোন আমল আসমানে যায় তখন আসমান হতেও তার ফলাফল যমীনে নেমে আসে। এমনিভাবে আল্লাহর পথে জিহাদেরও একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রয়েছে। যখন জিহাদের আমলটি যমীন হতে আসমানে যাবে তখন তার ফলাফল আসমান হতে যমীনে নেমে আসবে।

যমীনে জিহাদ হলে আসমান হতে আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেস্তাদেরকে সাহায্যের জন্য পাঠাবেন। যমীনে জিহাদ হলে আসমান হতে আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য নেমে আসবে। কেননা আল্লাহ পাকের ওয়াদা রয়েছে-

إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (سورة محمد:٧)

যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা'দৃঢ় মজবুত করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ-৭)

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ(سورة الحج : ٤٠)

আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহকে সাহায্য করে।

যমীনে জিহাদ না হলে মসজিদ, মাদরাসা, খানকা ও ইবাদতখানাসমূহের সংরক্ষণের জন্য আসমান থেকে কোন কিছু নেমে আসবে না। বরং ধ্বংস নেমে আসেবে। ইরশাদ হয়েছে-

"وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا"

'যদি আল্লাহ তা'য়ালা লোকদেরকে একের মাধ্যমে অন্যকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা না করতেন তাহলে যেখানে আল্লাহর নাম বেশী করে উচ্চারণ করা হয় সেসব আশ্রম, গীর্জা, ইবাদতখানা, ও মসজিদ ধ্বংস হয়ে যেতো।' [সূরায়ে হজ্জ:৪০]

যমীনে জিহাদ না হলে আসমান হতে ফাসাদ ও ধ্বংস নেমে আসবে।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ

'আল্লাহ তা'য়ালা যদি মানুষদের একটি দলের মাধ্যমে আরেকটি দলকে দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতো।' [সূরায়ে বাকারা:২৫১]

যমীনে জিহাদ না হলে মুসলমানদের উপর আসমান হতে লাঞ্ছনা নেমে আসবে।

عن ابن عمر قال : سمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول : "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم."

- سنن أبي داؤود :٤٩٠/٢ باب في النهى عن العينة . رقم الحديث:٣٤٦٢ - مسند أحمد:١١٤/٥ رقم الحديث:٥٥٦٢

যমীনে জিহাদ না হলে মুসলমানদের ঈমানী মৃত্যুর বদলে মুনাফেকী মৃত্যু আসমান হতে নেমে আসবে।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق.

- الصحيح لمسلم :١٤١/٢ باب ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ . رقم الحديث:٤٨٩٤ - المسند للإمام أحمد :٢٩/٩ رقم الحديث:٨٨٥١، - سنن أبي داود:٣٣٩/١ باب كراهية ترك الغزو . رقم الحديث:٢٥٠٢

সারাংশ

আপনার এই মূলনীতি জেনেই একথা বলতে হয় যে, যখন যমীন হতে জিহাদের আমলটি আসমানে যাবে তখন আসমান হতে মর্যাদা, জান-মাল ও ঈমানের হেফাজত, খেলাফত, হুদুদুল্লাহর কায়েম নেমে আসবে। নতুবা লাঞ্ছনা, গোলামী, ফাসাদ ও ধ্বংস নেমে আসবে। কারণ, এ বিষয়গুলো জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে বরং তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত এবং আউয়াবিনেরও পাবন্দ হয়ে যায়, যাকাত-সদকা আদায় করে, শুধু রমজান না বরং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার, আইয়্যামে বীয, আশুরা এবং জিলহজ্জের দশ রোজাও রাখে এবং সারাদিন কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরে কাটায়, সারা রাত জায়নামাযে অতিবাহিত করে, হারাম খাওয়া ছেড়ে দেয়, তারপরেও রবের কসম! রবের কসম!! জান-মাল ইজ্জত ও ঈমানের হেফাজত এবং খেলাফত কায়েম ঐ সময়

পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ এই উম্মত জিহাদ শুরু না করবে। কারণ, এবিষয়গুলোর অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের সাথে নয়; বরং এগুলোর সম্পর্ক জিহাদের সাথে। বাকী কথা হলো নামাজ, রোজা, হজ্জ ভিন্ন ভিন্ন ফরয। এর গুরুত্ব আপন অবস্থায় স্বীকৃত। যারা এর ফরযিয়্যত ও গুরুত্বকে অস্বীকার করে তারা কাফের। যারা জিহাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করে তারাও কাফের।

শক্তি যদি ব্যয় না কর ওহে মুমিনগণ!
ফাসাদ থেকে পাবে না মুক্তি তোমরা চিরন্তন।
নামাজ, রোযার সওয়াব তো ভাই আপন জায়গায় রবে,
কিন্তু যে ভাই দ্বীন প্রতিষ্ঠা জিহাদ দ্বারাই হবে।

যদি নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত এবং যিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা হত, আল্লাহর মদদ চলে আসত, ইসলাম ছড়িয়ে পড়ত, কাফেররা দুশমনী হতে বিরত থাকতো তাহলে কমপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিরস্ত্র মুখলিস নামাজী, রোজাদার, কুরআন তেলাওয়াতকারী সাহাবা রা. কে ময়দানে নিয়ে জিহাদ করাতেন না এবং কাফেরদেরকেও হত্যা করে জাহান্নামে ফেলতেন না। সাহাবায়ে কেরামও মক্কা মোকার্‌রমার হেরেমের নামাজ এবং মদীনা মুনাওরার মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়ে কুফুরী রাষ্ট্রে গিয়ে যুদ্ধ করতেন না।

বরং দেখুন! মু'তার যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদ বিন হারেসা রা. কে বাহিনী প্রধাণ বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায় তাহলে বাহিনীর প্রধাণ হবে জাফর বিন আবু তালিব। যখন সে শহীদ হয়ে যাবে তখন আমীর হবে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা। যখন সে শহীদ হয়ে যাবে তখন যাকে ইচ্ছা বাহিনীর প্রধান বানিয়ে নিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এটা চিন্তা করলেন যে, এখন শাহাদাত তো ইয়াক্বীনি (আবশ্যম্ভাবী)। শেষ নামাজ প্রিয় নবীজির পিছনে পড়ে যাই। আমার ঘোড়া খুব দ্রুতগামী। আমাদের বাহিনী সকালে রওয়ানা হলেও আমি জুমার পর রওয়ানা হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে পারবো। সর্বোত্তম দিন জুমার দিনে মসজিদে হারামের পর সর্বোত্তম মসজিদ মসজিদে নববীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামের পিছনে নামাজ পড়বেন। এই চিন্তা করে তিনি বাহিনীর পশ্চাতে রয়ে গেলেন। যখন রাসূল ﷺ এর দৃষ্টি তার উপর পড়লো তখন তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ আরজ করলেন, মনে চাচ্ছিলো যে, প্রিয় নবীজির পিছনে শেষ নামাজ পড়ব এরপর দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে বাহিনীর সাথে মিলিত হব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তুমি দুনিয়ার সমস্ত জিনিস আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দাও তারপরও তাদের সকালের একটি সফর এবং তার সওয়াব হাসিল করতে পারবে না।

প্রিয় পাঠক ভাইয়েরা! 'জিহাদ ছাড়ো; দাওয়াতের কাজ করো।' এধরনের কথা উচ্চারণ করে নিজের আখেরাত বরবাদ করবেন না। ঈমানকে নেফাক দ্বারা পরিবর্তন করবেন না। জিহাদের গুরুত্ব কমানোর চেষ্টা করবেন না। কেননা জিহাদের গুরুত্ব অতীতেও কমেনি এবং ভবিষ্যতেও কমবে না। বরং আপনার গুরুত্ব কমে যাবে। শরীয়তের প্রতিটি আমলকে স্বস্থানে রাখুন। এটাই দ্বীন, এর নামই ইসলাম, এর নামই ঈমান এবং এর নামই আদর্শ। অন্যথায় কবির ভাষায় বলতে হয়।

স্তর বিন্যাস যদি না কর সব আমলের মাঝে

যিন্দিকের খাতায় নাম যাবে তাই দিবা প্রহর সাঁঝে।

সংশয় -১৯

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربع مائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولا يغلب اثنا عشر الفا من قلة) .

- سنن الترمذى: ٢٨٣/١ باب ما جاء في السرايا. رقم الحديث:١٥٤٤ - سنن أبي داؤود : ٣٥١/١ باب فيما يستحب للجيوش. رقم الحديث:٢٦١١ - الصحيح لابن خزيمة: ١٤٠/٤ رقم الحديث:٢٥٣٨،

"উত্তম সঙ্গী হলো চার জন এবং ছোট বাহিনীগুলোর মাঝে উত্তম হলো চারশ জনের বাহিনী। বড় বাহিনীগুলোর মাঝে উত্তম হলো চার হাজারের বাহিনী আর বার হাজারের বাহিনী সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।" এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে মুজাহিদ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা লক্ষাধিক। তারপরেও তারা কেন বিজয় অর্জন করতে পরছে না? অথচ হাদীসের মর্মবাণী হলো, মুসলমানদের বার হাজার বিশষ্ট একটি বাহিনী হলে তারা কখনো পরাজিত হবে না।

সমাধান -১

ইসলাম ও কুফুরের মাঝে চলমান লড়াই তো শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধই। আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি স্মরণ রাখবে যে, "الحرب سجال" "যুদ্ধ হলো কুপের বালতির মতো।" এর দ্বারা কখনো এক দল পানি নেয় কখনো অন্যদল পানি নেয়। সর্বদাই এক ব্যক্তির কাছে থাকে না। এটা ঐ নীতি যা উহুদ যুদ্ধে মুসলমাদেরকে সাময়িক পরাজয়ের পর কাফের সর্দার আবু সুফিয়ান (যিনি পরবর্তিতে মুসলমান হয়েছেন) পূনরাবৃত্তি করে বলেছিল- "يوم بيوم بدر والحرب سجال" 'আজ আমাদের জয় হয়েছে বদরের পরাজয়ের পরিবর্তে। আর যুদ্ধ হলো কুপের বালতির মতো যা কখনো উপরে আসে কখনো নিচে যায়।'

এ ছাড়াও আবু সুফিয়ান কিছু কথা বলেছিল যেগুলোর জবাব রাসূল ﷺ সাহাবাদের মাধ্যমে দিয়েছেন। কিন্তু এই বাক্যের জবাব না স্বয়ং রাসূল ﷺ দিয়েছেন। না অন্য কারো মাধ্যমে দিয়েছেন। তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্ধলবী রহ. সীরাতে মুস্তফার ৩য় খন্ডে লিখেছেন যে, আবু সুফিয়ানের এই বাক্য "الحرب سجال" যেহেতু যথার্থ ছিল তাই তার জবাব দেননি। কুরআনুল কারীমের এই আয়াত "وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ" 'আমি যুদ্ধের দিনগুলোকে মানুষের মাঝে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করে থাকি।' তার কথার সমর্থন করে। এ জন্য যে কোন যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়কে এই নীতির ভিত্তিতে দেখতে হবে।

ফায়েদা

"الحرب سجال"এটা কোন সাধারণ নীতি নয়। এই নীতি হাদীস থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এটাকে আমরা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি।

অতি সংক্ষেপে বলছি, রাসূল ﷺ এর কথা কাজ ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। আর (تقرير) তাকরীর এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তির কোন কাজকে রাসূল ﷺ জানা সত্ত্বেও তা থেকে নিষেধ করেননি; বরং তা বলবৎ রেখেছেন।

সমাধান -২

এই হাদীস দ্বারা তো এই কথা জানা যায় যে, মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা যদি বার হাজার হয় তবে কখনো তারা সংখ্যা লঘুর কারণে পরাজিত হবে না। কিন্তু এ

কথার উদ্দেশ্য তো এটা নয় যে, তারা অন্য কোন কারণেও পরজিত হবে না। যেমন : রসদ আমদানী বন্ধ হয়ে যায় এবং যুদ্ধের সামান তথা যুদ্ধাস্ত্র ফুরিয়ে যায়। বিশেষভাবে যখন মুসলমানরাই কাফেরদের দালালী করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের গোপন তথ্য জানিয়ে দেয় তখন মুসলমানদের পরাজয় কেন হবে না?

সমাধান -৩

কখনো কখনো মুসলমানদের পরাজয়ের মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ হেকমত ও কল্যাণ নিহিত থাকে, যা শুধু পরাজয়ের মাঝেই পাওয়া যায়। বিজয়ের মাধ্যমে নয়। পরাজয়ের হেকমত সমূহ:

১. ভালো-খারাপ, খাঁটি-ভেজাল এবং মুখলিছ ও গায়রে মুখলেছ পৃথক হয়ে যায়।
২. পরাজিত হয়ে বান্দারা আল্লাহর দরবারে অক্ষম-অপদস্ত ও অসহায়ত্বের সাথে ফিরে আসে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ভবিষ্যতে সম্মান ও বিজয় দান করে।
৩. মুসলমানদের অন্তরে যেন আত্মতৃপ্তি, বড়ত্ব ও গর্ব সৃষ্টি না হয়। যার কারণে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। যেমনটি হুনাইন যুদ্ধে হয়েছিল।
৪. যাতে পরজিত হয়েও মুসলমানরা সত্যের উপর অটল থাকা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় একথার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে।
৫. শাহাদাতের তামান্না এবং আল্লাহর সাথে অপূর্ব সাক্ষাতের আশাবাদীদের জন্য শাহাদাতের নেয়ামত নসীব হয়।
৬. এই শাহাদাতের বিনিময়ে মুসলমানদের গুণাহ এবং ভূল-ক্রটি মাফ হয়ে যায় এবং পাক-পবিত্র হয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়।
৭. আল্লাহ তা'য়ালা যেন কাফেরদেরকে নি:শেষ করে দেন কেননা যখন আল্লাহর বিশেষ বান্দারা যুদ্ধে শহীদ হন; আল্লাহ তা'য়ালার গায়রত-আত্মমর্যাদায় ক্রোধ-উত্তেজনা বাড়তে থাকে মারে তখন নিজের বিশেষ বান্দা ও বন্ধুদের দুশমনদেরকে পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেন।
৮. কাফেররা যেন আরো বেশী বীরত্ব, অহংকার ও দাম্ভিকতার সাথে ময়দানে আসে এবং চিরদিনের জন্য নি:শেষ হয়ে যায়।

৯. এ কথা সাব্যস্ত করার জন্য যে, আল্লাহ তা'য়ালার নীতি হলো, তিনি অন্তরসমূহকে ঘুরিয়ে দেন। কখনো বন্ধুদের বিজয় দান করেন আবার কখনো শত্রুদের। কিন্তু সর্বশেষ ফলাফল এবং শেষ পরিণাম ও বিজয় শুধু আহলে হকেরই থাকবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

প্রেমিকের তরে প্রাণোৎসর্গকারীর পরীক্ষা যখন হয়;
হাজার লোকের পরাজয় তো অসম্ভব কিছু নয়।
প্রিয়জনকে তিনি সাফল্য করেন, প্রেমের পরীক্ষা নিয়ে
কখনো বিজয়, কখনো নুসরাত, কখনো শাহাদাত দিয়ে।

সতর্কীকরণ

মুহতারাম ভাই ও দোস্ত-বুযুর্গ! আপনাদের নিকট আকুল আবেদন, এই হাদীসের মত অন্যান্য হাদীসগুলোকেও ভালোভাবে বুঝার চেষ্টা করুন। আর যদি বুঝে না আসে তবে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন। তাই ইরশাদ হয়েছে-

"فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ"

'তোমরা যদি না জানো তাহলে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও।' [সূরায়ে আম্বীয়া: ৭]

সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। না বুঝে মুজাহিদীনে ইসলাম এবং জিহাদের উপর আপত্তি তুলে নিজের অজান্তে কাফেরদের সহযোগিতা করবেন না। নিজের আখেরাতকে বরবাদ করবেন না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আখেরাতের ফিকির করার তাওফিক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আবেদন

যদি কখনো পৃথিবীর কোনদিক থেকে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ আসে তখন মুজাহিদদের আমালেসালেহা থেকে খুঁত বের করার চেষ্টা না করে নিজেদের মধ্যে এ চিন্তা আনা উচিত, আমাদের কোন বদআমলের কারণে মুজাহিদদের পরাজয় হচ্ছে কিনা? এমন কঠিন মূহূর্তে মুজাহিদদের যখমীতে লবণ না ছিটিয়ে তাঁদের হিম্মত ও শক্তি যোগানোর কাজে সহায়তা করুন। মুজাহিদদেরকে সর্ব প্রকার জান-মাল ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার নিকট মুজাহিদদের বিজয় ও নুসরাত এবং কাফেরদের

পরাজয়ের জন্য নিয়মিত দোয়া করা চাই এবং ইসলামের সাধারণ ক্ষতিকেও নিজের ক্ষতি মনে করা চাই। এটাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য।

সমাধান -৪

মুজাহিদদের পরাজয়ের প্রতি যাদের চোখ যায় তাদের আফগানিস্তানের মুজাহিদদের ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেখানে নিরস্ত্র, দুর্বল-অসহায় মুজাহিদগণ আল্লাহর ফজল ও করমে দুনিয়ার সুপার পাওয়ার শক্তিকে পরাজিত করে দিয়েছেন।

"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ"

'হে জ্ঞানীগণ! তোমারা এ থেকে শিক্ষার্জন কর।'

সমাধান -৫

বর্তমান বিশ্বে চলমান জিহাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ এ কথা বলতে পারো যে, মুজাহিদদের বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে। কিন্তু এটা বলা যাবে না যে, মুজাহিদরা পরাজিত হচ্ছে। বরং কাফেররাই পরাজিত হচ্ছে। এটা তারা নিজেরাই স্বীকার করছে। (বর্তমানে ইরাক, আফগান, সোমালিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া ও মিসরসহ অন্যান্ন দেশের দৃষ্টিপাত করুন। সেখানকার মুজাহিদরা কতোটা সাফল্যের সাথে পথ এগিয়ে চলছেন -লিখক)

সংশয় -২০

জিহাদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্টা করা পূর্ব শর্ত। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ করা জায়েয নেই। কারণ, রাসূল ﷺ যতদিন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্টা করতে পরেননি ততদিন জিহাদের কাজ শুরু করেননি। সুতরাং আপনারা যদি জিহাদ করতে চান তাহলে আগে মারকাজ প্রতিষ্ঠা করুন। তারপর জিহাদ করুন।

সমাধান -১

জিহাদ দু'প্রকার -
এক. ইক্বদামী-আক্রমনাত্মক
দুই. দিফায়ী-প্রতিরক্ষামূলক

আক্রমনাত্মক জিহাদ

ইসলামের মান-মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফরয জিহাদের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য মুসলমানদের শক্তিশালী একটি দল কাফেরদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করা। এধরনের জিহাদ ফরযে কিফায়া। এমন কাজে অংশগ্রহণের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি নেয়া এবং আক্রমণ করার আগে কাফেরদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া শর্ত। কেউ কেউ উভয় পক্ষের শক্তি সমপরিমাণ হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। একইভাবে উক্ত জিহাদী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য একটি মারকাজ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র থাকা যেমন আবশ্যক, তেমনিভাবে এ জিহাদী অপারেশনের ধারা অব্যাহত রাখাও আবশ্যক। যদি একটি মুহূর্তের জন্যও এই কাজের ধারা বন্ধ হয়ে যায় তবে গোটা উম্মত গুনাহগার হবে। কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন করলে গোটা উম্মত গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। যেমন জানাজা নামাজের ক্ষেত্রে একই কথা। কিছু মানুষ আদায় করলে অন্যরা গুনাহ থেকে বেঁচে যায়।

প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ

কাফেররা যখন কোন মুসলিম দেশে আক্রমণ করে অথবা কোন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা দখল করে নেয় যেখানে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন কুফুরী শক্তির প্রতিরোধ করা এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরয হয় সর্বপ্রথম প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর। তারা যদি সংখ্যায় কম থাকে অথবা প্রতিরক্ষার কাজটি আঞ্জাম দিতে না পারে তখন কাফেরদের প্রতিহত করা পর্যায়ক্রমে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের উপর ফরয হয়ে যায়। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের জন্য কোন শর্ত নেই। আক্রমণকরার আগে কাফেরদের ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়া, ইসলামী রাষ্ট্রও সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পিতা-মাতার অনুমতি নেয়া ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। গোলাম-বাঁদী তার মালিকের অনুমতি ছাড়াই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই জিহাদে অংশগ্রহ করতে পারবে।

আজ সারাবিশ্বে যেসব রাষ্ট্রে যুদ্ধ হচ্ছে সবই দিফায়ী-প্রতিরক্ষামূলক। ইক্বদামী-আক্রমনাত্মক যুদ্ধ কোন ভুখন্ডে নেই বললেই চলে। তবে অতি সত্তর আল্লাহ তা'য়ালা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন ফলে ইক্বদামী জিহাদও শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র বা সরকারের উপস্থিতির শর্ত করা কোনো ভাবেই সঠিক নয়।

সমাধান-২

প্রশ্নে আরেকটি অংশ ছিলো, রাসূল ﷺ ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করার পূর্ব পর্যন্ত তার উপর জিহাদের বিধান নাযিল হয়নি। এক্ষেত্রে বলবো, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যদি জিহাদের পূর্ব শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয় তাহলে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, রাসূল ﷺ ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করার পর রোযা, যাকাত, মিরাছসহ যে সব বিধি বিধান নাযিল হয়েছিলো, এগুলো পালন করার জন্য কি ইসলামী রাষ্ট্র ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা করা শর্ত ছিল? আপনি বলবেন, না। এসব বিধান পালন করার জন্য ইসলামী শরীয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব শর্ত ছিলো না। আমরাও বলি শর্ত ছিলো না। আর এটাই বাস্তব সত্য। তাহলে অযথা জিহাদের জন্য এমন শর্ত উল্লেখ করা হয় কেন? সবগুলিই তো ফরয বিধান। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

দোস্ত আমার জিহাদ যদি
শুদ্ধ না হয় আমীর ছাড়া!
নামায পড়ছ, রোযা রাখছ;
কিন্তু সেথায় আমীর কারা?

সমাধান-৩

যুদ্ধ-জিহাদ করা হয় একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখন যদি জিহাদের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা পূর্বশর্ত হয়, তাহলে অযৌক্তিক কথা বার্তার অবতারণা ঘটবে। যাকে মান্তেকের পরিভাষায় 'দাওর ও তাসালসুল' বলে। আর দাওর বাতিল। সুতরাং জিহাদ পরিচালনার জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা পূর্ব শর্ত এমন কথা বলা অবাস্তব-অবান্তর।

সামাধান-৪

ইসলামী রাষ্ট্র এবং আমীর ছাড়াও জিহাদ করা জায়েয। আবু বাছির রা. এর ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের জন্য নিরব সাক্ষী। নবী যুগের এই ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে।

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূল ﷺ উমরা পালনের ইচ্ছায় মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। হুদাইবিয়া নামক জায়গায় আসার পর কাফেররা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। তখন রাসূল ﷺ এর সাথে মক্কার মুশরিকদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয়। বাহ্যিকভাবে এমন চুক্তি মেনে নেয়া মুসলমানদের পক্ষে ছিলো কঠিন ব্যাপার। চুক্তির অন্যতম একটি শর্ত ছিলো এই- কেউ যদি মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে যায়, তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। তবে কেউ যদি মদীনা থেকে মুরতাদ হয়ে মক্কায় ফিরে আসে তাকে মদীনায় ফেরত পাঠানো হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় হযরত আবু বাছির রা. মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসলেন। তখন কাফেররা তাঁকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঙ্গিকার রক্ষার্থে মক্কা থেকে আগত দুই ব্যক্তির নিকট তাঁকে হস্তান্তর করলেন। আবু বাছির রা. কে নিয়ে তারা মক্কার পথে রওয়ানা হলো। মাঝ পথে আবু বাছির রা. লোক দু'জনকে বললেন, তোমাদের হাতের তলোয়ার গুলো খুবই শানদার-চমৎকার। আমি একটু দেখি তলোয়ার গুলোর ধার কেমন! আবু বাছির রা. এর হেয়ালি কথায় কাফের দু'জন উল্লোসিত হয়ে উঠে এবং এই বলে আবু বাছির রা. এর হাতে তলোয়ার তুলে দেয় যে, এটা দিয়ে আমি অনেক মানুষের কাজ সমাপ্ত করেছি। তলোয়ার পেয়ে আবু বাছির রা. গর্জন দিয়ে উঠলেন। মুহুর্তেই এক জনকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। আর অন্যজন কোন রকম পালিয়ে যায়। তারপর আবু বাছির রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চুক্তি অনুযায়ী আমাকে তাদের নিকট হস্তান্তর করেছেন। কিন্তু তাদের সাথে আমার কোন চুক্তি ছিলো না বলে আমার যা করার প্রয়োজন ছিলো আমি তা করেছি। এরপর তিনি আশংকা করলেন যে, কাফেররা যদি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আমাকে ফেরত নেয়ার আবেদন করে, তিনি পূণরায় আমাকে হস্তান্তর করে দিবেন। তাই এবার তিনি মদীনা থেকে অনেক দূরে সমূদ্রের কিনারে গিয়ে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখন মক্কায় যে কেউ মুসলমান হন তিনি সোজা আবু বাছির রা. এর ঘাঁটিতে এসে যোগদান করেন। যার ফলে এখানে ক্ষুদ্রতম একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে ওঠে। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর জন। তবে আল্লামা সুহাইলি রহ. তিনশ জনের কথা উল্লেখকরেছেন। [যুরকানী /২]

এদিকে তারা কাফেরদের বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দিলেন। যখনি কোন বণিক দল এখানে আসে আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করেন। তাদের সাথে লড়াই করেন। এসব গেরিলা হামলার ভয়ে কাফেররা চরম আতংকিত হয়ে পড়ে। বাঁচার কোন পথ না পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আপনি আপনার কাজ করে যান, আমরা আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না। তবে আপনি ঐ লোকগুলোকে আপনার কাছে নিয়ে আসুন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আবু বাছির রা. ও তার সাথী-সঙ্গীরা কোন আমীরের

অধীনে যুদ্ধ করেছেন? তাদের যুদ্ধ অভিযান যে শরীয়তসম্মত ছিলো তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, রাসূল ﷺ তাদের ব্যাপারে সব কিছু জানা সত্ত্বেও চুপ ছিলেন। অর্থাৎ মৌখিকভাবে তাদের কাজের স্বীকৃতি না দিলেও আন্তরিকভাবে ঠিকই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

"আওসাফ" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার উস্তাদ মাওলানা যাহেদ আর-রাশেদী সাহেবের প্রবন্ধটি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে আমাদের জন্য যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করি।

কোন যুদ্ধ শরয়ী জিহাদ হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো সেখানে যথা-রীতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আমীরুল মুমিনীন এর পক্ষ থেকে জিহাদের ঘোষণা করা। যে ভূখন্ডে ইসলামী শাসন বর্তমান নেই অথবা শাসকরা অমুসলিমদের কাতারে শামিল এবং কুফুরী শক্তির প্রভাবে কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে থাকে, সেখানে জিহাদ করা ফরয। এ ঘোষণাটি করার দায়িত্ব বর্তায় উলামায়ে কেরামের উপর। এটি ফিক্বাহ শাস্ত্রের একটি সর্বজন স্বীকৃত মূলনীতি। বিষয়টি এভাবে বুঝতে পারি, অনেক শরয়ী বিধান এমন রয়েছে যার কার্যকারীতা নির্ভর করে রাষ্ট্র সরকারের উপর। কিন্তু সেখানে ইসলামী হুকুমত নেই অথবা মুসলিম শাসক আছে, কিন্তু সে এসব বিধান চালু করার দায়িত্ব গ্রহণে গড়িমসি করে, তখন আপনার করণীয় কি? যেমন সালাত কায়েম করা, দুই ঈদ ও জুমার নামাজ কায়েম করা, বিবাহ তালাকের জটিলতা নিরসন করা, যাকাত উসুল ও বন্টণ করা সহ অনেক বিধান রয়েছে। এগুলো পালন করার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকেন। যুগে যুগে উলামায়ে কেরাম এ ফরয দায়িত্ব সুন্দর ভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। একইভাবে যেখানে মুসলিম শাসক নেই অথবা সেই মুসলিম শাসকটি কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদের যে তাকাযা আসে সে স্থানে নেতৃত্ব দিয়ে শূণ্যতা পূরণ করা উলামায়ে কেরামের উপর ফরয। তাদের ফতোয়া ও ঘোষণার মাধ্যমে যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হবে, সেই সংগ্রামই শরয়ী জিহাদের রুপে রুপান্তরিত হবে।

সংশয় -২১

বুঝলাম জিহাদ করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা পূর্ব শর্ত নয়। কিন্তু একজন আমীর থাকাতো অবশ্যই শর্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেয়ার মত একজন আমীর না থাকবে সেটা শরয়ী জিহাদ হবে না । বর্তমানে যতগুলো জিহাদী গ্রুপ কাজ করছে, সবার আমীর ভিন্ন ভিন্ন, সবাই তো এক আমীরের অধীনে নেই। সুতরাং তাদের জিহাদ শরয়ী জিহাদ বলে বিবেচিত হবে না ।

সমাধান -১

এটি একটি ভিত্তিহীন প্রশ্ন। কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্বাহ ও ইসলামের ইতিহাসে এর কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা ফিক্বাহ শাস্ত্র ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহণ করে। বরং এ কথার আড়ালে আছে এক গভীর ষড়যন্ত্র। যা সাধারণভাবে বুঝে আসে না।

কাফেরদের মোকাবেলা যদি করতে হয়

তুনিরের মাঝে বন্ধু! তীর থাকতে হয়।

প্রত্যয়, নিষ্ঠা, সাহস হলো জিহাদের মূলধন

অযথাই বলে জিহাদের লাগি এক আমীরের প্রয়োজন!

প্রকৃত সত্য হলো, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম জিহাদের ঘোষণা করলেন তখন ইংরেজরা ভাল করে বুঝতে পারল যে সামনে তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয় ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই তারা বৃহৎ ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করল। তাদের এজেন্ট মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মাধ্যমে লিফলেট লিখে প্রচার করে তার বক্তব্যের ভাষ্য ছিল এই "হে-মুসলমানগণ! তোমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। কারণ, তোমাদের সমরশক্তি কম। আর সমরশক্তি ছাড়া যুদ্ধ-জিহাদ করা যায় না। তোমাদের আমীর একজন নয়। এক আমীর ছাড়া জিহাদ করা যায় না।"এসব কথার সূত্রপাত একারণেই হয়েছে যে, এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের জিহাদী শক্তি দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে যথেষ্ট নিরুৎসাহিত করতে পেরেছ।

সমাধান-২

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে জিহাদ দুই প্রকার।

এক. ইক্বদামী-আক্রমণাত্মক।

দুই. দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক।

এই দ্বিতীয় প্রকার জিহাদের জন্য কোন শর্ত নেই। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেসব যুদ্ধ হচ্ছে সবই দিফায়ী ও আত্মরক্ষামূলক।

সমাধান-৩

বেশী উদাহরণের প্রয়োজন নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপর নজর ফিরালে দেখতে পাবেন সমগ্র পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কতগুলো ইসলামী আন্দোলন ও জিহাদী কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু সবার আমীর ছিল ভিন্ন। শামেলীর যুদ্ধ ময়দান থেকে শুরু করে ইমাম শামেলের যুদ্ধ পর্যন্ত সে সব ইতিহাসে ভরা।

সমাধান-৪

'একজন আমীর থাকা আবশ্যক' এমন শর্ত আরোপ করলে পৃথিবী থেকে জিহাদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে ইসলামী শাসন র্ববস্থা না থাকায় আত্মমর্যাবোধসম্পন্ন মুসলমানগণ পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে জিহাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ কুফুর কর্তৃক দেশ ও সীমান্ত বিভক্তির জটিলতায় আমীর এক হওয়া তো দূরের কথা-পরস্পর সামান্যতম যোগাযোগ রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমাধান-৫

এ ক্ষেত্রে হযরত আবু বাছির রা. এর জিহাদী কার্যক্রম আমাদের জন্য আদর্শ ও পথ প্রদর্শক। মদীনায় রাসূল ﷺ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপরও তিনি সায়্যিদুল মুরসালীন, আমীরুল মুজাহিদীন রাসূল ﷺ এর পরামর্শ ছাড়া জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের ভেতর স্বতন্ত্র একজন আমীরও রয়েছেন। তাহলে যেখানে রাসূল ﷺ উপস্থিত রয়েছেন, তাঁর আদেশ ছাড়া অন্যরা জিহাদ করবে, বিষয়টা কতটা বিস্ময়কর! কিন্তু এখানে বাস্তব সত্য এটাই যে, এক আমীরের অধীনে কখনও জিহাদ করা সম্ভব হত না। কারণ, হযরত আবু বাছির রা. যদি রাসূল ﷺ এর আদেশক্রমে জিহাদ করতেন তাহলে সেটা হত হুদায়বিয়ার সন্ধির পরিপন্থি। নাউযুবিল্লাহ, রাসূল ﷺ চুক্তি ভঙ্গ করবেন! এটা তো কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এখানে জিহাদ অব্যাহত রাখার পথ ছিল একটাই। পৃথকভাবে একজন আমীর নির্ধারণ করে জিহাদ করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে অব্যহত ভাবে জিহাদ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

হাশরের দিন এই অজুহাত চলবে না বন্ধু কভু
পৃথিবীর বুকে হকের আমীর ছিল না যে কেউ প্রভু।
কখনো কি বিবেক বলেনি তোমায় চলতে রনাঙ্গণে
সামর্থ কি হারিয়ে ছিলে তুমি রিক্তহস্ত বনে?

সংশয় -২২

যুদ্ধ-জিহাদ করতে হলে মুসলমানদের শক্তি, সৈন্য সংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র কাফেরদের তুলনায় বেশী না হলেও অন্তত সমান সমান থাকা আবশ্যক। যথেষ্ট সমরশক্তি ও পর্যাপ্ত পরিমাণ গোলাবারুদ ছাড়াই যদি মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু করে দেয় তাহলে সে যুদ্ধ হবে আত্মহত্যার শামিল। আর আত্মহত্যা হারাম। শরীয়ত কখনও এর বৈধতা এবং অমুমোদন দেয় না। সুতরাং এর বেতিক্রম হলে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না।

সমাধান -১

জিহাদ করার সবচে' বড় হাতিয়ার হলো ইখলাস, সবর, তাওয়াক্কুল ও ঈমানী শক্তি। জিহাদের মূল প্রাণ শক্তি হলো ঈমান। আর মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে যেন তার সাধ্যানুযায়ী উপকরণ সামগ্রী নিয়ে রনাঙ্গণে চলে আসে।

একজন সাচ্চা মুসলমান যখন আল্লাহর উপর ভরসা করে রনাঙ্গণে চলে আসে, নিজেকে আল্লাহর নিকট অর্পণ করে, কাকুতি মিনতি করে দো'আ করে, হে আল্লাহ! আমার যতটুকু প্রস্তুতি নেয়া সাধ্যে ছিল প্রস্তুতি নিয়েছি, যা করার দরকার ছিল তা করেছি, শত্রু মোকাবেলায় এসেছি। এখন শত্রুর উপর বিজয় দান করা তোমার কাজ। তুমি আমাদেরকে বিজয় দান কর । আমীন! আল্লাহ তা'য়ালা তখন আসমান থেকে ফেরেশতা নাযিল করে তাদের সাহায্য করেন। সেই সাহায্যের একটি তালিকা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

এক. ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মুজাহিদদের সাহায্য-সহযোগীতা করেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

"إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ"

'স্বরণ করুন সে সময়ের কথা যখন আপনি মুমিনদেরকে বললেন, রব তোমাদেরকে আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে সাহায্য করবেন। এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না?' [আলে ইমরান-১২৪]

দুই. মুমিনদের হৃদয়কে পাহাড়সম মজবুত করে দেন। তাই ইরশাদ হয়েছে-

فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

'তোমরা [ফেরেশতারা] মুমিনদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে দাও।' [আনফাল-১২]

তিন. কাফেরদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দেন। ইরশাদ হচ্ছে-

"سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ"

'আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো।' [আনফাল-১২]

চার. মুসলমানদের ক্ষুদ্র দলটিকে কাফেরদের দৃষ্টিতে বিশাল বড় করে দেখান। কুরআন তাদের কথা এভাবে তুলে ধরেছে-

"فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ"

'তাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাফির। তারা মুমিনদেরকে খোলা চোখে তাদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল।' [আলে ইমরান-১৩]

পাঁচ. মুসলমানদের শান্তনার জন্য কাফেরদের বিশাল বড় সৈন্য দলকে একদম ছোট ও নগন্য করে দেখান। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا

[হে নবী!] সেই সময়কে স্বরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের (শত্রুদের) সংখ্যা কম দেখাচ্ছিলেন। [আনফাল -৪৩]

'সাচ্চা মুসলমান যখন ঈমানী শক্তিতে জেগে ওঠে তার কাছে ইট-পাথরও তখন গোলা-বারুদের ন্যায় কাজ করে । নিম্নে দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন!

১. হযরত দাউদ আ. জালূতকে হত্যা করার জন্য পাথর ছুঁড়ে মারলেন। যার আঘাতে ছটফট করে তার মৃত্যু হয়েছে। জালূত ছিলো কাফের বাদশাহ ও লড়াকু যুদ্ধনেতা। একাই হাজার মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিলো। কিন্তু গোলা-বারুদের ন্যায় একটি পাথর তার জীবনকে বিনাশ করে দিয়েছে।

২. মাটি গোলা বারূদের ন্যায় কাজ করে । বদর ও হুনায়নের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুষ্টিমেয় বালি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাদের চোখ অকেজো হয়ে পড়লো। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। বর্তমান যুগের পরিভাষায় বলা যায়- মুষ্টিময় বালি তাদের উপর পরমাণুর প্রক্রিয়ায় কাজ করেছিল।

৩. গাছের ডাল পর্যন্ত তলোয়ার হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে হযরত উক্কাশা রা. এর সাথে এমনটাই হয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেয়া মাত্রই সেটা তলোয়ার হয়ে গিয়েছে।

৪. কোথাও সমুদ্রপথকে মুজাহিদদের অধীন ও অনুগত করে দেয়া হয়েছে। হযরত আলা-হাযরামী রা. এর ব্যাপারে আমরা এমন ঐতিহাসিক ঘটনাই দেখতে পাই। মুজাহিদগণ পানির ওপরে সমতল ভূমির ন্যায় অশ্বারোহণ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন।

৫. মুজাহিদদের নিরাপত্তায় বনের হিংস্র প্রাণীরা জঙ্গল ছেড়ে চলে যায়। হযরত সাফীনা রা. আফ্রিকার জঙ্গলের পশুদের এই বলে তাড়িয়ে দিলেন, 'এখানে মুহাম্মাদে আরাবী ﷺ এর গোলামরা রাত্রিযাপন করবে। তোমরা চলে যাও'।

সুতরাং উপরোল্লিখিত ঘটনাগুলো থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সবর, ইখলাস ও ঈমানী শক্তিই হচ্ছে মুসলমানদের সবচে' বড় হাতিয়ার। এগুলো দিয়েই তারা সবসময় বিজয়ী হয়ে আসছেন। আল্লাহ তা'য়ালার গায়েবী নুসরাত শুধু আম্বিয়া আ. ও সাহাবায়ে কেরামের উপর সীমিত নয়। বরং গায়েবী নুসরতের ধারা আজো বিদ্যমান আছে এবং থাকবে। যুগে যুগে আল্লাহ মুজাহিদদেরকে সাহায্য করে আসছেন। বর্তমান যুগেও মুজাহিদদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যত সাফল্যের নতুন পথ উন্মোচন করে দিচ্ছে। আরেকটি কথা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে, বাহ্যিকভাবে অস্ত্রের শক্তি অর্জন করা এবং আধুনিক সমরাস্ত্র গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থি নয়। বরং এগুলো তাওয়াক্কুলকে আরও মজবুত করে তোলে।

নিকটতম অতীতের দিকে ফিরে তাকান, রাশিয়ার মত পরাশক্তি মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের হাতে করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করা এবং পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। একজন মুজাহিদের মুষ্টিময় বালি-পাথরের আঘাতে চৌদ্দটি ট্যাংক জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে গেছে। নিরস্ত্র মুজাহিদগণ অস্ত্রধারী বাহিনীকে বন্দী করে এনেছেন। বিমান হামলার আগে পাখি এসে মুজাহিদদের সতর্ক করে রাডার ও যোগাযোগ মিডিয়ার দায়িত্ব আদায় করেছে। শুধু দোয়ার বরকতে বহু যুদ্ধ বিমান ও ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধ চলাকালীন অচেনা মানুষ এসে মুজাহিদদের পক্ষ

অবলম্বন করে যুদ্ধ করেছে। বন্দী রুশ বাহিনীর লোকেরাও এসব কথা স্বীকার করেছে। এসব ঘটনা আমাদেরকে শুধু এ বার্তাই পৌছায়, একমাত্র চিরঞ্জীব সত্তাই মুজাহিদদের হেফাজত করেছেন। ইনশাআল্লাহ! ভবিষ্যতেও হেফাজত করবেন। তার কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ঘোষণা করেন:

"ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ "

এটা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।[সূরায়েমুহাম্মদ-১১]

ধনে জনে শক্তি বলে জিহাদ হয় না ভাই.

রনাঙ্গণের বিজয় মূলে খোদার মদদ চাই।

সমাধান -২

মুসলমানদের সমরশক্তি ও সৈন্য সংখ্যা কম হলে যুদ্ধ করা যাবে না বরং যুদ্ধ করলে এটা হবে আত্মহত্যার শামিল। এমন উদ্ভ্রান্ত দার্শনীক কথা বলা মানে ইসলামের ইতিহাসকে কলুষিত করা। কোন যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা সমান কিংবা বেশী ছিল এমন ঘটনা পাওয়া খুবই বিরল। অধিকাংশ যুদ্ধেই কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী । একথা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই। তাই আসুন! এক নজরে ইতিহাসের পাতায় কিছু ঘটনার পর্যালোচনা করি।

১. হযরত তালূত আ. এর সৈন্য সংখ্যা ছিল[৩১৩] তিনশ' তের জন।পক্ষান্তরে জালূতের ছিল লক্ষাধিক সশস্ত্র সৈন্য।

২. বদর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৩১৩] তিনশ' তের জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [১,০০০] এক হাজার।

৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৭০০] সাতশ' জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [৩,০০০] তিন হাজার।

৪. খন্দক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৩,০০০] তিন হাজার।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [২৪,০০০] চব্বিশ হাজার।

৫. খায়বার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [১,৬০০] ষোলশ' জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [২০,০০০] বিশ হাজার।

৬. মু'তার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৩,০০০] তিন হাজার।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [২,০০,০০০] দুই লক্ষ।

৭. কাদেসিয়্যা যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৩০,০০০] ত্রিশ হাজার।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [১,০০,০০০] এক লক্ষ ইরানী সৈন্য।

৮.ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৩২,০০০] বত্রিশ হাজার।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [২,০০,০০০] দুই লক্ষ রোমান সৈন্য।

৯. স্পেন যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [১২,০০০] বার হাজার।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [১,০০,০০০] এক লক্ষ।

১০. ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা [৬০] মাত্র ষাট জন।

কাফের সৈন্য সংখ্যা [৬০,০০০] ষাট হাজার।

সমাধান -৩

সৈন্য সংখ্যা ও গোলা বারুদ কম থাকা সত্ত্বেও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিভাষা যদি হয় 'আত্মহত্যা' তাহলে নিম্নোক্ত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে কি উক্তি করবেন?

ক. মিসর বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস রা. হযরত ওমর ফারুক রা. এর নিকট মদীনা থেকে তিন হাজার সৈন্য তলব করলেন। তখন হযরত ওমর রা. মাত্র তিনজনকে পাঠালেন। হযরত খারেজা ইবনে হুযাইফা রা. হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. কে পাঠিয়ে বললেন, আরে! আমি তো তিনজন পাঠাইনি; বরং তিন হাজার পাঠিয়েছি!

খ. হযরত বারা ইবনে আযেব রা. মুসায়লামাতুল কায্যাবকে হত্যা করতে ধাওয়া করলেন। মুসায়লামা ছিল 'বাগান বাড়ীর নিরাপত্তায় বেষ্টিত। চিকন সুড়ঙ্গ করে তিনি একাই সেখানে ঢুকে পড়লেন। নাউযুবিল্লাহ! এটা কি তাঁর আত্মহত্যা ছিলো? অন্য কোন সাহাবী কি তাঁদেরকে এমনটা করতে নিষেধ করেছিলেন? তাহলে আমরা নিষেধ করতে যাবো কেন?

সমাধান -৪

কোন রকমভাবে আপনার কথা মেনে নিলাম যে, কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্র বেশী না হলেও সমান সমান থাকা জরুরী। এমনটাই যদি হয় তাহলে পৃথিবীতে জিহাদ বলতে কিছু থাকবে কি? তখন তো মানুষ শুধু এতটুকু বাহানা পেশ করে জিহাদ থেকে বিরত থাকবে, 'আমাদের শক্তি নেই, তাই আমরা জিহাদ করি না।' অথচ আল্লাহ তা'য়ালা সাধ্যমত জিহাদের শক্তি অর্জন করতে আদেশ করেছেন। অন্যান্য আমলের তুলনায় জিহাদের তাগিদ একটু বেশীই দিয়েছেন। কুরআনে কারীম বলছে-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ....

[হে মুমিনগণ!]'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর [সমর] শক্তি এবং অশ্বের মাধ্যমে।' [সূরায়ে আনফাল:৬০]

এই যুদ্ধ প্রস্তুতি পর্বটি এমন এক বিষয় যার কোন সীমারেখা নেই। শেষ বলতে কিছু নেই। প্রস্তুতি পর্ব যেহেতু কেউ শেষ করতে পারবে না এজন্য আদেশ দেয়া হয়েছে, যতটুকু তোমার সাধ্যে কুলায় প্রস্তুতি গ্রহণ কর। শক্তি অর্জন কর। সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা সার্বক্ষণিক ওয়াজিব। কেউ যদি দশটি জাহাজ নির্মাণ করার ক্ষমতা রাখা সত্বেও নয়টি জাহাজ নির্মাণ করে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে। কারণ, সে দশটি জাহাজ নির্মাণের ক্ষমতা রাখে তাহলে নয়টি বানাবে কেন? একইভাবে কেউ যদি অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ভুলে যায় হাদীসের ভাষ্যমতে সে হবে গুনাহগার! রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

عن عبدالرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم أعاينه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك ؟ قال إنه قال " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى "

- صحيح مسلم: ١٤٣/٢ باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. رقم الحديث:٤٩١٢ - مسند أحمد : ١٧٣٣٦ الجزء الثامن والعشرون.

'যে ব্যক্তি অস্ত্র চালানো শিখল তারপর এ কাজ ছেড়ে দিল অথবা ভুলে গেল সে আমার উম্মত নয়।' [মুসলিম শরীফ ২য় খন্ড হাদীস নং ৪৯১২।]

যারা আজ পর্যন্ত অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়নি; তাদের জন্য কি এই হাদীস শিক্ষনীয় নয়? তারা আজও অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না বরং উল্টো এটাকে ঘৃণা করে। মানুষের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে। যারা এমন বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা করে তাদের ঈমানের ব্যাপারে আশংকা করা উচিত। আসলে এরা মানুষরূপী শয়তান। এদের ছোবল থেকে আল্লাহ্ পুরো মুসলিম জাতিকে হেফাজত করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

আল্লাহ তা'য়ালা এমন টালবাহানাকারী মুনাফিকদের বিষয়ে ইরশাদ করেন-

"وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً"

'যদি যুদ্ধে যাবার ইচ্ছে তাদের থাকত; তাহলে অবশ্যই কিছু না কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করত।' [সূরা তাওবা-৪৬]

সুতরাং কোন রকম টালবাহানা করে যারা এমন মন্ত্র ছড়াচ্ছে তাদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত । তাদেরও নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কি সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করছি, না কি অবান্তর মন্ত্র ছড়িয়ে জিহাদের শক্তিকে দুর্বল ও নিস্তব্ধ করে কাফেরদের সহযোগিতা করছি?

সমাধান -৫

এগুলো মুনাফিকদের বাহানা মাত্র। পবিত্র কুরআন তাদের কথা এভাবে উল্লেখ করেছে, মুনাফিকরা ছলনা করে জিহাদ থেকে দূরে থাকত। যখন জিহাদের ডাক আসত তারা বেহুশ ও অজ্ঞান হয়ে যেত। নিজেদের কাপুরুষতা এবং আভ্যন্তরীন মুনাফেকী চরিত্রকে গোপন করার জন্য নানা রকম ছলনা ও অজুহাত পেশ

করত। এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে মাত্র একটি ছলনার কথা উল্লেখ করছি। উহুদ যুদ্ধে রাসূল ﷺ মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন। মাঝপথে মুনাফিকরা শুধু একথা বলে যুদ্ধে যাওয়া পরিহার করল-

"لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَتَّبَعْنَاكُمْ"

'আমরা যদি যুদ্ধ মনে করতাম তবে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতাম।'

[আল ইমরান-১৬৭]

আয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত তাফসীর এই -

মুনাফিকরা মনে করত উহুদ যুদ্ধ প্রকৃত অর্থে কোন যুদ্ধই নয়; বরং এটা আত্মহত্যার শামিল। কারণ, একতো আমরা সংখ্যায় কম [মুসলিম সৈন্যমাত্র ৭০০ আর কাফের সৈন্য ৩০০০]। দ্বিতীয়ত আমাদের যুদ্ধাস্ত্র ও পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এগুলো ছাড়া আবার যুদ্ধ হয় নাকি? আমরা যদি এটাকে যুদ্ধ মনে করতাম অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতাম।

আমাদের আকাবির

পরিশেষে আমাদের আকাবিরদের ছোট্ট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আকাবিরদের চিন্তা-চেতনা ও মেযাজ যেন আমাদের মাঝে ফিরে আসে এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চলার সৌভাগ্য নসীব হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য যখন হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এবং অন্যান্য আকাবিরগণ একত্র হলেন এবং তাঁদের নিয়ে জরুরী পরামর্শ শুরু করলেন। এসময় হযরত থানবী রহ. এর সাথে কথাবার্তা চলাকালে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! আপনি শত্রুদেশে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয তো দূরের কথা জায়েয পর্যন্ত বলেন না । এর কারণটা কি? হযরত থানবী রহ. বললেন, আমাদের তো যুদ্ধাস্ত্র নেই। যুদ্ধের সরঞ্জাম ছাড়া কিভাবে জিহাদ করব? হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. বললেন, বদর যুদ্ধে যা ছিল তাও কি নেই? এরপর থানবী রহ. নিরব হয়ে গেলেন। কিন্তু মাওলানা শহীদ যামেন রহ. বলেন থানবী রহ. উত্তরটি এভাবে দিয়েছিলেন-

مولانا بات سمجھ میں آگئی মাওলানা! আমার বুঝ হয়ে গেছে। আর বলতে হবে না।'

[নকশে হায়াত হযরত মাদানী ২য় খন্ড]

উলামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হযরত মাওলানা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর নিকট শপথ নিলেন। ফলে শামেলী যুদ্ধ ও সিপাহী বিপ্লবের সূচনা হয় । সর্বস্তরের উলামায়ে কেরাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখলেন। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. অলী-গলীতে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষকে জিহাদের আহ্বান করে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইংরেজরা তখন বুঝতে পারল সামনে তাদের জন্য নিশ্চিত পরাজয় অপেক্ষা করছে। তাই পানি ঘোলা করে মাছ ধরার নেশায় তারা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মত এক নরপিচাশকে ষড়যন্ত্রের পুতুল হিসাবে ব্যবহার করে । সে নিজেকে এক সময় নবী বলে দাবী করে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর হৃদয় থেকে জিহাদী চেতনা দূর করা। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে কিছু লিফলেট ছেপে প্রচার করে এবং মুসলমানদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে। লিফলেটের মূল লেখা এভাবে সাজানো হয়েছে-"হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর জিহাদ ফরয নয়। কারণ, তোমাদের সামরিক শক্তি কম। সামরিক শক্তি না থাকলে যুদ্ধ করা যায় না। তোমাদের একজন আমীর নেই। এক আমীরের নেতৃত্ব ছাড়াও জিহাদ করা যায় না।।" হে আল্লাহ! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঈমান দান কর। মুনাফীক চক্র থেকে দূরে রাখ। শয়তানের প্রতারণা থেকে হেফাজত কর। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয় -২৩

যুদ্ধ-জিহাদের আগে কাফেরদেরকে ঈমান গ্রহণ করার দাওয়াত পেশ করা শর্ত। বর্তমান মুজাহিদরা কাফেরদেরকে ঈমানী দাওয়াত ছাড়াই হত্যা করছে। এটা জায়েয নেই। সুতরাং এ সমস্ত কাফেররা যে জাহান্নামে যাবে এর দায়ভার কিন্তু মুজাহিদদেরকেই নিতে হবে। জিহাদের নামে শরীয়ত বিরোধী কাজ করে আল্লাহর নুসরতের আশা করা যায় না।

সমাধান -১

ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে জিহাদ দুই প্রকার।

এক. ইক্বদামী-আক্রমণাত্মক।

দুই. দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক।

জিহাদ করার আগে কাফেরদের প্রতি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি ইক্বদামী-আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান বিশ্বের কোথাও কোন যুদ্ধ আক্রমণাত্মক নেই। বরং যা হচ্ছে সবই দিফায়ী-আত্মরক্ষামূলক।

সমাধান -২

ইক্বদামী-আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ইসলাম সম্পর্কে কাফেরদের কোন জ্ঞান না থাকে। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম এত ব্যাপক হয়েছে, কাফেররাও ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ভাল জ্ঞান রাখে । কোন কোন বিষয়ে কাফেররাও মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান রাখে।

শক্তিতেই বৃদ্ধি পায় দাওয়াত পূর্ণমানে

তবুও এটা শর্ত নয় প্রতিরোধ অভিযানে।

সত্য দ্বীনের জ্ঞান কভু মেলেনি তাদের

সর্বমূলে কারণ যাহা অজস্র ফাসাদের।

সমাধান -৩

যুদ্ধের আগে কাফেরদের ঈমানী দাওয়াত দিতে হয়। তবে বিষয়টি এত ব্যাপক নয় যে, প্রতিটি কাফেরকে পৃথক পৃথক ভাবে দাওয়াত দিতে হবে। বরং শুধু কাফের প্রধান ও রাষ্ট্রনায়কদের দাওয়াত দেয়াই যথেষ্ট। রোম ও পারস্যের যুদ্ধগুলোতে সাহাবায়ে কেরাম এই নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্য ও রোমান যুদ্ধের আগে শুধু রাজা-বাদশাহদের দাওয়াত দিয়েছেন। কোন প্রজাকে নয়। সামনের রেওয়ায়েত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা করি।

এক.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খসরু পারভেজের নামে নিম্নোক্ত পত্র প্রেরণ করেন।

بعث عبد الله بن حذافة السهمي منصرفه من الحديبية إلى كسرى وبعث معه كتابا مختوما فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا

عبده ورسوله أدعوك بداعية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس".

- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير - الجزء الثاني.

السيرة النبوية لإبن كثير: الجزء الثالث. - زاد المعاد : ٦٠١/٣ . ذكر هَدْيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مكاتباته إلى الملوك وغيرهم.

'পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট খসরুর উদ্দেশ্যে [পত্র প্রেরিত হচ্ছে] তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়েতের অনুসারী। আল্লাহ ও তার রাসূলে বিশ্বাসী এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তার কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাচ্ছি। নিশ্চই আমি সমগ্র মানব মন্ডলির উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি। যাতে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারি এবং নিশ্চিত করতে পারি কাফেরদের পরিণতি। ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি পাবে। অন্যথায় অগ্নিউপাসক প্রজাবর্গের সকল পাপ তোমার কাঁধে চাপবে।' [শামায়েলে তিরমিযী]

দুই.
হযরত সুলাইমান আ. যখন রাণী বিলকীসকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে তাঁর দাওয়াত নামা এভাবে তুলে ধরেন,

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (سورة النمل- ٣٠-٣١)

"নিশ্চই এপত্র সুলাইমানের পক্ষ থেকে। বিসমিল্লাহির রহমানীর রহীম। [পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু]। আমাদের উপর অহমিকা দেখিও না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে চলে এসো। (সূরা নামল ৩১)

সমাধান -৪

উপরোল্লিখিত দুটি রেওয়ায়েত থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, দাওয়াতের কাজ হবে খুব সংক্ষেপে এবং সাহসীকতার সাথে। আপোষ ও সমাঝোতার কোন আভাস থাকবে না। স্বশস্ত্র শক্তির দাপট নিয়ে মুজাহিদের মত বুক টান করে দাওয়াত দিবে। ইসলাম কবুল কর, না হয় যুদ্ধ ও মৃত্যুর অপেক্ষা কর। এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলকে শরীয়তের দলীল না মেনে নিজের যুক্তি ও তর্ককে দলীল বানানোর চেষ্টা করা যে কতটা ভয়ংকর সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। কারো বিবেক-বুদ্ধি যদি হারিয়ে যায় সেই একমাত্র শরীয়ত বিরোধী কথা বলতে পারে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

পরিশেষে এ বিষয়ে ফিক্বাহ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কিতাব মুখতাসারুল কুদূরীর বিখ্যাত শরাহ আলজাওহারাতুন নায়্যিরাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা শেষ করছি।

إِنَّمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ أَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى الدَّعْوَةِ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ قَدْ فَاضَ وَاشْتَهَرَ فَمَا مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ إِلَّا وَقَدْ بَلَغَهُ بَعْثَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاؤُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَيَكُونُ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْبَعْثِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ وَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ جَهْرًا وَخُفْيَةً.

"ইসলামের প্রথম যুগে দাওয়াত দেয়া ব্যতীত যুদ্ধ করা জায়েয ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, বর্তমানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। সুতরাং কাফেরদেরকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়টি আমীরের মর্জির উপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে দাওয়াত দিতে পরেন আবার নাও দিতে পারেন। কাফেরদের মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করলেও পারেন আর না হয় গোপনে-গোপনে হত্যা করলেও পারেন।"

মোটকথা দলীলের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেরদের হত্যা করার আগে ইসলামের দাওয়াত দেয়া জরুরী নয়।

সংশয় -২৪

জিহাদ করা কোন সহজ কাজ নয়। জিহাদের জন্য যেমন মজবুত ঈমান থাকা জরুরী তেমন ঈমান যেহেতু আমাদের নেই, তাই আমাদের উচিত প্রথমে ঈমানের মেহনত করা। যখন ঈমান মজবুত হবে তারপর জিহাদ করব। কারণ, রাসূল ﷺ মক্কী জীবনের তেরটি বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর শুধু ঈমানের মেহনত করেছেন। তারপর জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

সমাধান -১

প্রথমে আমাদের মাথায় একটি জিনিস রাখতে হবে, রাসূল ﷺ কোন সাহাবীর উপর পূর্ণ তের বছর ঈমানী মেহনত করেননি। নবুয়তের প্রথম দিন কেউ ঈমান গ্রহণ করেননি। বরং রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন পরম স্ত্রী হযরত খাদিজা রা. কে। শুনিয়েছেন ওহী সংক্রান্ত নানা ঘটনাবলী। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাসূলের নবুওয়াতের তের বছর পূর্ণ হবার আগেই বিদায় নিয়ে গেলেন সে মহীয়সী নারী। আর যারা সর্ব প্রথম মুসলমান হয়েছেন তাঁদের নাম এই- পুরুষদের মাঝে হযরত আবূ বাকর রা. শিশু কিশোরদের মাঝে হযরত আলী রা. গোলামদের মাঝে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা. তাঁদের কেউতো নবূওয়াতের প্রথম দিন ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাহলে তাদের উপর তের বছর পূর্ণ হলো কিভাবে? সুতরাং এমন কথা বলা যে ভিত্তিহীন সেকথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। জানি না কে বা কারা কখন থেকে এসব ভ্রান্ত কথার রেওয়াজ ও প্রচলন ঘটিয়েছে!

সমাধান -২

'রাসূল ﷺ তের বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর ঈমানের মেহনত করেছেন।' তারপর জিহাদের আদেশ দিয়েছেন এমন কথা বলা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর অপবাদ দেয়ার শামিল। এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা আছে। কারণ, উক্ত কথার সারমর্ম হলো তের বছর ঈমানী মেহনত করার পর ঈমান পরিপূর্ণ হয়। তাহলে নির্যাতিত নিপীড়িত মজলূম সাহাবায়ে কেরাম রা. যাদের অনেকে শহীদ হয়ে গেছেন তাদের ঈমানের ব্যাপারে কি বলবেন? তারা কি ঈমান অপরিপূর্ণ থাকতেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন? অথচ কুরআন তাদের

মত ঈমান আনার আদেশ দেয়। তাহলে কি কুরআন ও অপরিপূর্ণ আদেশ দেয়? নাউযুবিল্লাহ! তাদের ঈমান পরিপূর্ণ হতে কি তের বছর সময়ের প্রয়োজন ছিলো? অথচ উম্মতের ইজমা ও আক্বীদা-বিশ্বাস এই, যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছে, প্রথম দর্শনেই তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। দ্বীধাহীন ভাবে তারা আল্লাহর পথে জান মাল কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। লক্ষ্য করুন, হযরত যুনায়রা রা. এর চক্ষুদ্বয় তুলে ফেলা হয়েছে। হযরত লুবায়না রা. এর শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলা হয়েছে। নরপিচাশ আবু জাহেলো হযরত সুমাইয়া রা. এর লজ্জাস্থানে বর্শার আঘাত করে শহীদ করেছে। তারপর দু'পায়ে রশি দিয়ে উটের সাথে বেঁধে টেনে হিচড়ে কষ্ট দিয়েছে। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর শরীর দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। তবুও তাঁর ঈমানে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি ও ঘাটতি আসেনি। দু'চারটি নারীর করুণকাহিনী থেকে অনুমান করুন, ভয়াল নির্যাতনের সামনে তাঁদের ঈমান কতটা মজবুত ছিলো। দ্বীনের জন্য কতইনা কষ্ট করেছেন।

একইভাবে পুরুষ সাহাবীদের ঘটনায় ইতিহাস ভরপুর। হযরত সুহাইল রা. হযরত আম্মার রা. হযরত বেলাল রা. ও হযরত খাব্বাব রা. এর ঘটনা জগৎ জুড়ে বিখ্যাত। এদের করুণ কাহিনী কে না জানে? নাউযুবিল্লাহ! আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের ঈমান পূর্ণ হতেও কি তের বছর সময় লেগেছিল? সাবধান! এমন কথা আর বলবেন না।

সমাধান -৩

জিহাদের জন্য পরিপূর্ণ ঈমান থাকা যদি জরুরী হয়ে থাকে তাহলে এর পিছনে কারণ একটাই হতে পারে যে, যুদ্ধ-জিহাদ চলাকালীন সময়ে অনেক বিপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এসব পরিস্থিতি সহ্য করে নেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় পরিপূর্ণ ঈমানের। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কী জীবনে মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট ছিল সীমাহীন অসহনীয়। পক্ষান্তরে জিহাদের চরিত্র হচ্ছে শত্রুকে প্রতিহত করা, দমন করা । এখানে নিজে যেমন কষ্ট পায় অন্যকেও কষ্ট দেয়। নিজে যেমন আহত হয় অন্যকেও আহত করে । নিজে যেমন নিহত হয় অন্যকেও মৃত্যুর কোলে তুলে দেয়। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে যুদ্ধের চরিত্র অঙ্কণ করেছেন এভাবে-

"إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً"

'তোমরা যদি কষ্ট পেয়ে থাক তাহলে তারাও তোমাদের মতই কষ্ট পেয়ে থাকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা কর, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।' [সূরা নিসা-১০৪]

মক্কী জীবনে শত্রুকে প্রতিহত করার কোন অনুমতি ছিল না। এ সময় মুসলমানদের শুধু সবর ও ধৈর্য্যের আদেশ দেয়া হত। তারপর ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার বাড়তে লাগল। তখন তাদেরকে হিজরতের আদেশ করা হলো। এজন্য বলা যায়, সাহাবায়ে কেরামের উপর শুধু ঈমানী মেহনত হয়নি; বরং মেহনত হয়েছে সবর ও ধৈর্য্যের। আর কাফের মুশরিকদের উপর মেহনত হয়েছে ঈমানের। তারা যেন ঈমানদার হয়ে যায়। ইসলামের সীমারেখায় চলে আসে। সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও তদবীর করা হয়েছে। কিন্তু আজ স্বল্পজ্ঞানী লোকেরা দ্বীনের এ মূল কথাগুলো অন্য ক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দ্বীনের চরিত্রকে নষ্ট করে ফেলেছে। আল্লাহ সবাইকে মাফ করুন।

সমাধান -৪

আপনার কথা মেনে নিলাম, মক্কী জীবনে তের বছর সাহাবায়ে কেরামের উপর ঈমানের মেহনত করা হয়েছে। তারপর জিহাদের বিধান নাযিল করা হয়েছে। তাহলে যেসব সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় মুসলমান হয়েছেন। তাদের উপর তের বছর ঈমানী মেহনত হলো না কেন? নাউযুবিল্লাহ! ঈমানী মেহনত না করে, তাদের ঈমান মজবুত না করে, যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো কেন? এ অপত্তি কার উপর বর্তায়? মুজাহিদদের উপর নাকি মুজাহিদদের রবের উপর? মুজাহিদদের প্রকৃত সেনাপতি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর?

বর্তমানে মুজাহিদদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হয়, তারা শিশুদের উপর ঈমানী মেহনত ছাড়াই রনাঙ্গণে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের জীবন ধ্বংস করছে। প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা একটু চিন্তা করুন, যারা মদীনা শরীফে মুসলমান হয়েছেন। ঈমানী মেহনত ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ! আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদের ঈমান অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধের ময়দানে চলে যাবার অপরাধ ও দায়ভার কার কাঁধে চাপবে? অথচ রাসূল ﷺ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আগে মুসলমান হব নাকি জিহাদ করব? রাসূল ﷺ বললেন, আগে মুসলমান হও তারপর জিহাদ কর। ঐ ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লালাহ পড়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হয়ে গেলেন। স্বয়ং রাসূল ﷺ তাঁকে কবরে রেখে খুব দ্রুত উঠে আসলেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম একটু শংকিত হয়ে বললেন, তাঁর কবরে কোন আযাব হচ্ছে নাকি! রাসূল ﷺ বললেন, না বিষয়টি এমন নয়। হুর-পরীরা তাঁর কাছে এসে পড়েছে। এজন্য আমি কবর থেকে দ্রুত এসে পড়েছি। তারপর তিনি বললেন-

"عمل قليلا واجر كثيرا" 'সে তো আমল করেছে কম; কিন্তু প্রাপ্তি পেয়েছে অনেক বেশী।' এবার চিন্তা করুন, এই সাহাবী তো ঈমানের উপর কোন মেহনত করেননি। কোন নামাজ পড়ার সুযোগ ও পাননি। যুদ্ধ-জিহাদের ময়দানে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। তবুও রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন কেন? কিসের ভিত্তিতে? তের বছরের মেহনতের ভিত্তিতে? নাকি এক মূহুর্তের জিহাদের ভিত্তিতে?

সমাধান -৫

বর্তমান জামানায় যদি কেউ ঈমান কমজোর ও দুর্বল হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে জিহাদ না করার অপারগতা প্রকাশ করে এটা হবে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ এবং আল্লাহর উপর অপবাদ দেয়ার শামিল। নাউযুবিল্লাহ! সে এমন কটুকথা বলে বুঝাতে চায় যে, আল্লাহ আমাদের উপর এমন বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন যা পালন করতে আমরা সক্ষম নই, বরং অক্ষম। কারণ, যেখানে রাসূল ﷺ এর সোহবত–সাহচর্য এবং তাঁর পিছনে নামাজ পড়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ঈমান মজবুত করতে তের বছর সময় লেগেছে তাহলে আমরা তো ঈমানই মজবুত করতে পারছি না । আবার জিহাদ দিয়ে কি করব? আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার উপর জিহাদের বিধান ফরয করে জুলুম করেছেন! তিনি এমন বিধান দিয়েছেন যা পালন করার যোগ্যতা ও শক্তি উম্মতের মাঝে নেই । নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

একজন মুসলিমের উপর যে ঈমানের কারণে নামায, রোযা, হজ্ব যাকাত ইত্যাদি ফরয ঠিক সেই ঈমানের কারণেই জিহাদ ফরয। যে আত্মশুদ্ধি দিয়ে নামাজ পড়বে, রোযা রাখবে, হজ্ব করবে সেই আত্মশুদ্ধি দিয়েই জিহাদ করতে হবে।

যেমন নামাজ, রোযার ক্ষেত্রে নতুন করে ঈমান মজবুত করার প্রয়োজন নেই, আত্মশুদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। ঠিক তেমনিভাবে জিহাদের ক্ষেত্রেও ঈমান নবায়ন করার প্রয়োজন নেই। বরং নামাজ, রোযার মত জিহাদের মাধ্যমেও ঈমান বৃদ্ধি পায়। কেননা এটাও নেককাজ আর নেককাজের দ্বারাই ঈমান বৃদ্ধি পায়।

সামধান -৬

পরিশেষে বলব, ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা বাতলে দেয়া উচিত যে, এই পর্যন্ত পৌছলে ঈমান পরিপূর্ণ হবে আর তারপর থেকেই জিহাদের কাজ করা যাবে। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মত তো অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করবে। বলুন, সে সীমারেখা কতটুকু? কত বছর এভাবে টালবাহানা করে আর কতকাল জিহাদ থেকে বঞ্চিত হবেন?

সমাধান -৭

বাস্তব কথা হলো, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এমন একটি আমল কোন অপরিপূর্ণ ঈমানদারও যদি একাজ করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঈমানী শক্তি বাড়তে থাকে। কারণ, সে জিহাদের ময়দানে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য ও নুসরাত প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায়। শুহাদাদের রক্তের সুবাস তার ঈমানকে করে সুরভিত-তরতাজা। দেখার শওক থাকলে রনাঙ্গনে এসে পড়ুন। পবিত্র কুরআনও একথার ঘোষণা করে। জিহাদের ময়দানে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানও বৃদ্ধি পেত। তাই ইরশাদ হয়েছে-

"الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, [মক্কার কাফের] লোকেরা তোমাদের [সাথে যুদ্ধ করার] জন্য একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো। তখন এই সংবাদ তাদের ঈমান আরো বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।"

[সূরা আলে ইমরান-১৭৩]

"وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً"

'মুমিনগণ যখন (শত্রুদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাঁদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।' [সূরা আহযাব-২২]

পূর্ণ ঈমানের অপেক্ষা আর করবে কতকাল

এবার চল রণাঙ্গনে দেখবে ঈমান কি বিশাল।

যার অন্বেষণে হয়রান এই পূর্ণ জাহান

সে ফুল সাধন নিমিষেই করবে জিহাদের ময়দান।

সংশয় -২৫

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু কিছু মুজাহিদের আমল শরীয়তের পরিপন্থি। তারা টাখনুর নিচে সেলোয়ার পরে। দাড়ি ছাটে বা মুন্ডায়, ছবি তোলে, মাঝে মধ্যে নামায পড়েনা। এমনকি তাদের ঘরোয়া পরিবেশ ইসলামী আদর্শ পরিপন্থি। সুতরাং এদের আমলকে জিহাদ বলে স্বীকৃতি দেয়া যায় না। যারা গুনাহে লিপ্ত তারা আবার কিসের জিহাদ করবে? প্রকৃতপক্ষে তারা যদি মুজাহিদ হত অবশ্যই তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতো। তারপর জিহাদ করতো।

সমাধান- ১

জিহাদ করা এক ফরয আর নামাজ পড়া আরেক ফরয। একইভাবে রোযা রাখা এক ফরয আর নামাজ পড়া আরেক ফরয। উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। এখন প্রশ্ন হলো, কোন ব্যক্তি রোযা রাখল কিন্তু নামায আদায় করল না, তাই বলে কি তার রোযা আদায় হবে না? অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, এতটুকু বলা যায় নামাজ না আদায় করার কারণে সে গুনাহগার হবে। রোযা ও আদায় হয়ে যাবে। তবে আদায়টা অসম্পূর্ণ হবে। অনুরূপভাবে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা যদি নামাজের

মত ফরয বিধান লংঘন করে তখনও জিহাদ ফরয থাকবে। এর ফরযিয়্যাত বাতিল হবে না। সর্বোচ্চ নামাজ না আদায় করার কারণে সবাই গুনাহগার হবে। কিন্তু জিহাদের আমল নষ্ট হবে না।

আরো একটু স্পষ্ট করে বলি, রাষ্ট্র-সরকার যদি জালিম, ফাসিক হয় তবুও জিহাদী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ফরয। কোন অবস্থায়ই জিহাদের ফরযিয়্যাত বাতিল হয় না। হাদীস শরীফে আমরা একথাই উপলব্ধি করতে পারি,

عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم : ...... والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،

- سنن أبي داؤود: ٣٤٢/١ باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:٢٥٣٢ - سنن البيهقي الكبرى : ٢٩٢/٩ باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:١٨٤٨٠

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "আমার সময় থেকে নিয়ে দাজ্জাল হত্যা পর্যন্ত জিহাদ চলমান থাকবে। কোন জালিম কিংবা ন্যায় বিচারক বাদশাহ পর্যন্ত জিহাদ বিলুপ্ত করতে পারবে না।"

সমাধান -২

নামাজের হেকমত ও দর্শন কুরআনুল কারীম এভাবে বিশ্লেষণ করেছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (سورة العنكبوت-٤٥)

"নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা যদি কেউ এভাবে করার চেষ্টা করে, যারা অশ্লীল ও বেহায়া কাজে লিপ্ত রয়েছে, যাদের ঘরে টিভি আছে, ছবি আছে অথবা যেসব মহিলোরা পর্দা করেনা; তারা নামাজ পড়ে লাভ কি? তাদের তো নামাজ কবুল হয় না। কারণ, নামাজ বলা হয় যা মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এভাবে রোযার উপকারিতাও প্রজ্ঞাময় কুরআন যেভাবে বলেছে- "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"

'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।'

[সূরা বাকারা-১৮৩]

এখানে কি এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? যারা দাড়ি মুন্ডায়, দাড়ি ছোট করে রাখে, টাখনুর নিচে সেলোয়ার পরে, অন্যান্য গোনাহের কাজ করে, তাদের রোযা রেখে ফায়দা কি? এদের জন্য রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ, প্রকৃত অর্থে রোযা বলা হয়, যা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। সুতরাং রোযা রাখার পরেও যদি গুনাহের কাজ করে; এরকম রোযা রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কথাতো কেউ বলে না। আর যদি বলেও তা ভুল হিসাবে প্রমাণিত হয়। এখানে যেমন গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও নামাজ, রোযা ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করলে আদায় হয়ে যায়, তেমনিভাবে কোন মুজাহিদ যদি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গুনাহ থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করে তার জিহাদও আদায় হয়ে যায়।

সমাধান -৩

আমরা প্রত্যক্ষ করি, একজন ব্যক্তি দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে সফর করে। কিন্তু কোন কোন সময়ে সে নামাজের ব্যাপারে অলসতা করে, নামাজ আদায় করে না। আবার কারো ঘটনা আরো একটু জটিল। একদিকে যেমন দ্বীন শেখা ও দ্বীনের তাবলীগ করা, ইসলাম শেখা ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে সফর করে। অপরদিকে আবার নেশার কাজও চালু রাখে। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে যদি অভিযোগ ওঠে এবং তার দায়িত্বরত জিম্মাদারকে বলা হয়, এ ব্যক্তিকে সতর্ক করুন। এসব কাজ ছাড়তে বলুন। আর না হয় জামাত থেকে বহিষ্কার করে দিন। তখন জিম্মাদারের পক্ষ থেকে উত্তর আসে, আরে ভাই! তাকে জামাতে থাকতে দাও। তাকে যদি বের করে দাও সে তো আরো খারাপ হয়ে যাবে। তাকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। মেহনতের বরকতে একদিন ভালো হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!

এমনই কোন ঘটনা যদি মুজাহিদদের ব্যাপারে আসে তখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। জিহাদরত মুজাহিদের মাঝে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি যদি নজরে আসে, ঐ ব্যক্তির নিন্দা ও দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং জিহাদের পবিত্র বিধানকে কলুষিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সুতরাং তাদের এই কপটতা ও দু'মুখী আচরণকে জিহাদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। কারণ, তাদের অন্তরে যদি জিহাদ আর মুজাহিদদের প্রতি ইশক ও মুহাব্বত থাকত তাহলে অবশ্যই এ কথা বলতো, আরে ভাই! তাদেরকে কাজ করতে দাও। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ!

সমাধান -৪

মুজাহিদরা শরীয়ত পরিপন্থি কাজ করে এমন কথা বাস্তব সম্মত নয়। বরং এটা মিথ্যা অপবাদ। আসল কথা হলো, নির্দিষ্ট কিছু মানুষ কোনদল বা সংগঠনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুজাহিদ ও জিহাদের নাম ব্যবহার করে। এতে করে মুজাহিদদের ভাবমূর্তি ও চরিত্র কলুষিত করার পিছনে থাকে এক গভীর ষড়যন্ত্র। সুতরাং এমন ছদ্মবেশী মানুষ দেখে জিহাদের সমালোচনা করা আদৌ ঠিক হবে না। কোন চোর যদি নামাযী ও মুসল্লির রূপ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে জুতা চুরী করে তখন আপনাকে বুঝতে হবে, মসজিদে কোন নামাযী চুরি করতে আসেনি। বরং যে চোর সেই নামাজির রূপ নিয়ে চুরি করে পালিয়েছে। এজন্য একজন চোরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দ্বীনদার মুসল্লিদের সমালোচনা করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অনুরূপভাবে জিহাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কেনিয়ার নাইরোবি শহরে আমি একবার জিহাদি সফরে ছিলাম। শুনলাম পাকিস্তানি একটি জামাত এখানে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে এসেছে। এমনকি তারা এক সালের জন্য বের হয়েছে। বর্তমানে তারা মারকাজে অবস্থান করছে। সংবাদ পেয়ে আমি তাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসি। পরস্পর কুশল বিনিময় ও পরিচিত হবার পর যখন মূল কথায় আসি, দারুণভাবে তারা আমাকে হতাশ ও নিরুৎসাহীত করতে থাকে। একজন দেশী ভাই হিসাবে তারা আমার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে পারতো। কিন্তু তা না করে করেছে উল্টো। নানা রকম আপত্তি, অভিযোগ ও সমালোচনার মাধ্যমেই তারা আমার মেহমানদারী করেছিলো। এই জামাতে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের ওযীরাবাদ শহরের অধিবাসী। তার একমাত্র সন্তান মুজাহিদ হয়ে গেছে। এটাই ছিলো তার সবচে' বড় মাথা ব্যাথার কারণ। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বললেন, মাওলানা! যেখানে মুজাহিদরা ছবি তোলে, ভিডিও করে, দাড়ি মুন্ডায়, রাস্তার ধারে অলী-গলীতে ছবি-ফেষ্টুন কুস্পুত্তলিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শ্লোগান দেয়, আমেরিকার কাছে কাশ্মীর স্বাধীনতার দাবী জানায়, এর নামই কি জিহাদ? এগুলো কি সুন্নত পরিপন্থি নয়? এরা আবার কিসের জিহাদ করতে চায়? ডাক্তার সাহেবের কথায় আমি বুঝতে পারলাম কোন্ ধরনের লোক দেখে তিনি জিহাদের বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারপর আমি বললাম, এখন কারো জিহাদ যদি শরয়ী জিহাদ না হয় তাহলে আপনাদের দাওয়াতে তাবলীগও শরয়ী দাওয়াত বলে গণ্য হবে না। কারণ, এখানেও কিছু কিছু মানুষ মাথায় সবুজ পাগড়ি পরে সুন্নতের দাবি করে। অথচ তারা সুস্পষ্ট

কুফুরী এবং বিদয়াতি মতবাদের প্রচার করে ঘুরে বেড়ায়। তাহলে কুফুর, বিদআতী প্রচার করার নামও কি তাবলীগ? ডাক্তার সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, না। আমরা এসব কাজ করি না। যারা এসব কাজ করে আমরা তাদের চেয়ে ভিন্ন এক জাতি। এদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের উপর প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। এবার আমিও তাকে বললাম, ডাক্তার সাহেব! আপনি যেসব আপত্তি ও অভিযোগের কথা বলেছেন, আমরাও এগুলো করি না। যারা করে তারা আমাদের চেয়ে ভিন্ন এক শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং তাদেরকে কেন্দ্র করে আমাদের ব্যাপারে কোন সমালোচনা করাও ঠিক হবে না। কিছু বিদআতী লোকের কাজ দেখে যেমন আহলে হকের দাওয়াত ও তাবলীগ নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না, হাতেগোণা দু'চারজন মানুষের কর্মকান্ড দেখে জিহাদের পবিত্র বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করবেন না।

সমাধান -৫

কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করা অবস্থায় জিহাদের কাজ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যায়, তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এমন প্রতিশ্রুতি বাণী হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। শুধু গুনাহ মাফ হবে তাই নয়; বরং তাকে আরো শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করা হবে। সে সত্তরজন আপন লোককে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে, যাদের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো। সে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তার সুপারিশ মঞ্জুর করবেন।

নববী যুগের একটি ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। এতে আপনারা বুঝতে পরবেন, কোন গুনাহগার ব্যক্তি যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, আমরা তাদের সাথে কেমন আচরণ করছি আর স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আচরণ করেছেন!

عن ابن عائذ يقول خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة رجل فلما وضع قال عمر بن الخطاب : لا تصل عليه يا رسول الله فإنه رجل فاجر فالتفت رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الناس فقال : هل رآه أحد منكم على عمل الإسلام فقال رجل نعم يا رسول الله حرس ليلة في سبيل الله فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و حثى التراب عليه و قال أصحابك يظنون أنك من أهل

النار و أنا أشهد أنك من أهل الجنة و قال يا عمر إنك لا تسأل عن أعمال الناس و لكن تسأل عن الفطرة .

- شعب الإيمان للبيهقى : ٤٢٩٧ السابع و العشرون من شعب الإيمان و هو باب في المرابطة في سبيل الله عز و جل. مشكاة المصابيح : ٣٣٦ كتاب الجهاد الفصل الثالث .

'ইবনে আয়েয রা. বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এক ব্যক্তির জানাযা পড়ার জন্য তাশরিফ আনলেন। মায়্যিতকে যখন সামনে আনা হলো ওমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়বেন না। কারণ, সে গুনাহগার। একথা শুনে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ কি এ ব্যক্তিকে কোন নেকআমল করতে দেখেছ? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের ময়দানে সে একটি রাত পাহারা দিয়েছিল। তারপর রাসূল ﷺ তার জানাযা পড়লেন এবং বরকতময় হাতে তার কবরে মাটি দিয়ে বললেন, তোমার সাথীরা তো মন্তব্য করে তুমি জাহান্নামী। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি নিশ্চিত জান্নাতী। এরপর রাসূল ﷺ হযরত ওমর রা. কে বললেন, হে ওমর! তোমাকে মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার আমল সম্পর্কে।'

[মেশকাত:৩৩৬ কিতাবুল জিহাদ]

মুহতারাম দোস্ত-বুযুর্গ ! এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমাদের এলাকায় যদি এমন ব্যক্তির জানাযা আসে আমরা কি করবো? কোন ব্যক্তি জিহাদে গিয়ে কিছুদিন যুদ্ধ করলো। [আল্লাহ না করুক] সে আবার কোন গুনাহে লিপ্ত হলো। অথবা কোন গুনাহগার ব্যক্তি খাঁটি মনে তাওবা করে জিহাদে অংশগ্রহন করত: শহীদ হয়ে গেলো। এদের ব্যাপারে আমরা যে চরম বিব্রতকর মন্তব্য করি, আমাদের ছোট মুখ থেকে যে বিষ-বাষ্প ও অগ্নিমালা ছুঁড়ে থাকি এ থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। এক্ষেত্রে রাসূল ﷺ যে নীতি গ্রহণ করেছেন আমরাও তাই করবো। রাসূল ﷺ এর বরকতময় আমলই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও দলীল। সুতরাং যারা স্বল্পজ্ঞানী নামকা ওয়াস্তে ধার্মিক ও ইসলামের লেবাসধারী তাদের কথায় বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে দ্বীন বুঝার তাওফীক দান করুন! আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

ব্যক্তিগত অভিমত

আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলবো, জিহাদ যখন ফরযে আইন হয়ে যায়, [বর্তমান যুগে জিহাদ ফরযে আইন] কোন মুজাহিদ যদি জিহাদরত অবস্থায় নামায না পড়ে, সে ওই আবেদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান, যে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে; কিন্তু জিহাদ করে না। প্রথম কারণ, তারা উভয়ে কবীরা গুনাহে লিপ্ত। মুজাহিদ নামায না পড়ার কারণে কবীরা গুনাহে লিপ্ত আর বাইতুল্লাহর আবেদ জিহাদ না করার কারণে। কবীরা গুনাহের দিক থেকে উভয়ে সমান। কিন্তু উভয়ের গুনাহের মাঝে রয়েছে আসমান-যমীনের ব্যবধান। মুজাহিদ নামায না পড়ার কারণে যে ক্ষতি হবে সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর আবেদ জিহাদ পরিত্যাগের কারণে যে ক্ষতি হবে সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সে ব্যক্তিগত ভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত তার কারণে গোটা মুসলিম জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত।

দ্বিতীয় কারণ, মুজাহিদ যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যায় তার গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি হাদীস শরীফে পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان السيف محاء للخطايا

-مسند أحمد: ٤٥٤/١٣ رقم الحديث:١٧٥٨٨، - الصحيح لإبن حبان: ٥١٩/١٠ رقم الحديث:٤٦٦٣ ، - الجهاد لإبن المبارك: ٦٢

হযরত উতবা বিন অবদুস সুলামী রা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- 'তলোয়ার গুনাহসমূহকে মুছে দেয়।'

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْقَتْلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

-صحيح مسلم. باب مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلاَّ الدَّيْنَ.

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- 'আল্লাহর পথে জিহাদ করার দ্বারা ঋণ ছাড়া সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

কিন্তু আবেদের জন্য এই ফরজে আইন (জিহাদ) পরিত্যাগ করার ক্ষতিপূরণ কিভাবে হবে? এর জন্য তো কোন প্রতিশ্রুতি নেই। বরং তার ব্যাপারে মুনাফিকী মৃত্যুর আশংকা আছে। জিহাদ পরিত্যাগের কারণে কিয়ামতের দিন শরীরে দাগ ও আলাদা চিহ্ন থাকার ভয় আছে। তবে আল্লাহ্ তা'য়ালা যদি কারো উপর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ করেন সেটা ভিন্ন কথা।

সতর্কবাণী

পূর্বে উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা আমার এটা উদ্দেশ্য নয় যে, মুজাহিদদের ভিতরে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। বরং দোষ-ত্রুটি আছে এবং থাকবে। কারণ, মুজাহিদরাও মানুষ ফেরেশ্তা নয়! তাদের দ্বারা ভুল হতেই পারে। বরং কোন কোন সময় ভুল হয়েই যায়। কিন্তু এ ভুলের কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করার কোন অবকাশ নেই। আবার কয়েকজন মুজাহিদের আমলের উপর ভিত্তি করে জিহাদের উপরে আপত্তি করার তো প্রশ্নই আসে না। হ্যাঁ, মুজাহিদদের সংশোধনের জন্য উত্তম পন্থায় চেষ্টা করার অবকাশ রয়েছে।

মুজাহিদগণ শরীয়তের পাবন্দি হবে

একথা একেবারে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'য়ালার সাহায্য ও মদদ সে সময় আসে যখন মুজাহিদরা আল্লাহ তা'য়ালাকে সন্তুষ্ট রাখে এবং নিজেদের কাজের সফলতার চিন্তা করে। সাহাবায়ে কেরামের বিজয় যদি শুধু মেসওয়াকের সুন্নত ছুটে যাওয়ার কারণে বিলম্ব হয় তাহলে আমরা আবার কে? আমরা কোন বাগানের বুলবুলি? এ জন্য মুজাহিদ ভাইদেরকে নিজেদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের জীবনকে দ্বীনের অনুসারী করতে হবে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। সাধারণ লোকদের চেয়ে নিজেদের আমলকে বেশীসুন্নত মোতাবেক করার চেষ্টা করতে হবে। ফরয, ওয়াজিব ছাড়াও সুন্নত এবং মোস্তাহাবের প্রতি যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ইশকের নামাজ

কেউ কেউ বলে, জিহাদের জন্য নামাজ এবং দাড়ি থাকা শর্ত। অথচ নামাজ স্বতন্ত্র ফরয, জিহাদ স্বতন্ত্র ফরয। আর দাড়ি স্বতন্ত্র ওয়াজিব। দাড়িও জরুরী, নামাজও জরুরী, জিহাদও জরুরী। আল্লাহর কসম! মুজাহিদ যে নামাজ আদায়

করে অন্য কারো পক্ষে সে নামাজ নসীব হয় না। "ইশকের নামায আদায় হয় তলোয়ারের ছায়ায়"

একদিকে গুলির বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে আর অপর দিকে মুজাহিদ নামাজে দাঁড়িয়ে বলছে,"الحمد لله رب العالمين"এই মুহূর্তে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করায় যে প্রশান্তি অনুভব হয়, জিহাদের বাহিরে থেকে কোথাও তা অনুভব হওয়ার নয়। তারপর যখন বলছে, "اهدنا الصراط المستقيم!" হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক পথে চালাও, যে পথে নবীগণ চলেছেন, সিদ্দীকীগণ চলেছেন এবং শুহাদাগণ চলেছেন। মৃত্যুর সামনে দন্ডয়মান হয়ে নামাযে যে স্বাধ অনুভব হয় তা আর কোথাও হয় না। যখন অন্তরে একীন হয়ে যায়, যে কোন সময় গুলির আঘাতে জীবন বিনাশ হতে পারে এবং নামাজ পড়তে পড়তে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে পৌছে যেতে পারে। তার ঈমান তখন কতোটা মজবুত হয়ে উঠে কল্পনা করা যায়? যদি মুজাহিদরা বে-নামাযী হয় তাহলে আসমান থেকে ফেরেশ্তা সাহায্য করতে আসবে না। রাশিয়ান জেনারেলরা শপথ করে বলেছিল যে, আমরা স্বচক্ষে ফেরেশতাদের অবতরণ করতে দেখেছি। ফ্রান্সের একজন সাংবাদিক আফগানিস্তানের জিহাদের রিপোর্টিংয়ের জন্য আসেন। কিছু দিন অবস্থান করে তিনি মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন,"আমি তাদের প্রতিপালককে ময়দানে লড়তে দেখেছি। মুজাহিদরা যদি ফাসেক হত তাহলে এত বড় সফলতা কিভাবে অর্জন করত? জিহাদ তো অন্তরকে সংশোধন করে দেয়। এ কারণে রনাঙ্গণে শয়তান আসতে পারে না। ওরা ফেরেশতাদের দেখার পর সেখানে আর টিকে থাকতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে, মুজাহিদ যে দোয়া করে নবীদের ন্যায় সে দোয়া কবুল করা হয়। কারণ, মুজাহিদের কোন আমলে আত্মপূজা হয় না।

শহীদি হামলা

বর্তমান জামানায় কাফেরদের হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়ার সবচে বড় অস্ত্র শহীদি (আত্মঘাতি) হামলা। কিন্তু এ ধরনের হামলার বৈধতা নিয়ে নানা মহলো থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসছে। তাদের প্রশ্নগুলো এই-

এক.

নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও শত্রুর ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে নিজেকে এভাবে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া কি আত্মহত্যার শামিল নয়?

দুই.

আত্মঘাতি হামলা এমন সাধারণ জায়গায়ও করা হয় যেখানে কাফেরদের বয়োবৃদ্ধ পুরুষ, মহিলো, শিশু-কিশোরও নিহত হয়। অথচ শরীয়ত তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না।

তিন.

জিহাদ ফরয করা হয়েছে মুসলমানদের জান-মাল হেফাজতের জন্য। কিন্তু এ ধরনের আত্মঘাতি হামলার কারণে কোন কোন সময় মুসলমানদের প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটে। মুসলমানকে হত্যা করাতো কোন অবস্থায় বৈধ নয়। সুতারাং এধরনের হামলাও বৈধ নয়।

বর্তমান জামানায় যেহেতু এ ধরনের নানা প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে তাই উল্লিখিত সংশয়গুলোকে সামনে রেখে সঠিক সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে হক কথা বলা এবং লেখার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

সংশয়-২৬

আত্মঘাতি হামলা মানে আত্মহত্যা। আর শরীয়ত কখনো আত্মহত্যার বৈধতা দেয় না। সুতরাং আত্মঘাতি হামলাও বৈধ হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'য়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا(سورة البقرة-١٩٥)

"নিজ হাতে তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।"

সমাধান-

আত্মঘাতি হামলার ব্যাপারে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, যথাসম্ভব এর পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে।

এক. নিজের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও এধরনের হামলা!

দুই. সর্বাবস্থায় মুজাহিদদের যুদ্ধনীতি এমন হওয়া উচিত যেখানে মুজাহিদদের ক্ষয়-ক্ষতি না হয়। হলেও কম হয় এবং কাফেরদের ক্ষয়-ক্ষতি বেশী হয়। কিন্তু আত্মঘাতি হামলার ক্ষেত্রে তো প্রথমে মুজাহিদদের ক্ষতি হয় তারপর অন্যদের। যাই হোক, নিজের মৃত্যুর কথা নিশ্চিতভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও হামলা করাকে আপনারা নাম দিয়েছেন আত্মহত্যা। আর আমরা বলি আত্মঘাতি হামলা। এধরনের হামলা যে জায়েয ইতিহাসের বহু ঘটনাই তার দলীল ও প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাবে।

কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ না করে নবী যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আশা করি বিষয়টি বুঝার জন্য এমন একটি ঘটনাই যথেষ্ট হবে। ইনশাআল্লাহ!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হারেস ইবনে ওমায়ের রা. কে একটি দাওয়াতী পত্র দিয়ে শোরাহবীল ইবনে আমর গাস্সানীর নিকট পাঠালেন। কিন্তু এই হতভাগা জালিম হযরত হারেস রা. কে মূতা নামক স্থানে শহীদ করে দেয়। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিন হাজারের একটি সশস্ত্রবাহিনীকে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা. এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় বলে দিলেন, যদি যায়েদ রা. শহীদ হয়ে যায় তোমরা জা'ফর ইবনে আবি তালেবকে আমীর বানাবে। তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে আমীর বানাবে। তারপর তিনিও যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে তোমরা পছন্দমত একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে। বড় বড় তিনজন আমীর শহীদ হয়েছেন বিধায় এই যুদ্ধটিকে 'গাযওয়া জাইশুল উমারা'ও বলা হয়।

এই বাহিনী যখন মদীনা শরীফ থেকে বের হয়, তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিলো যে, এই যুদ্ধে আমাদের তিনজনেরই শাহাদাত নিশ্চিত। সুতরাং মৃত্যুর খবর নিশ্চিতভাবে জানা সত্ত্বেও হামলা করা যদি আত্মহত্যার শামিল হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কস্মিনকালেও একাজ করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁদেরকে যুদ্ধে যেতে বলতেন না।

আমি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করছি যে, কোন ধরনের হামলা হলেই যে কারো মৃত্যু হতে হবে এটাও নিশ্চত নয়। বরং বোমা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি এমন ঘটনাও বিদ্যমান। শরীর ভেদ করে বুলেট বেরিয়ে গেছে তবুও মৃত্যু হয়নি। এগুলো অসম্ভব কোন ঘটনা নয়। নিকট আফগান যুদ্ধে এধরনের বহু ঘটনা বর্তমান। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ব্যাপারে শাহাদাতের সংবাদ দিবেন আর সে শহীদ হবে না এটা অসম্ভব। তাহলে শরীরের সাথে বোমা বেঁধে আত্মঘাতি হামলাকারী নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে যতোটা নিশ্চিত, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারে তার চেয়ে বেশী নিশ্চিত হয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। আরে! শত্রুর পরাজয় ও মৃত্যুর কথা তাদের যতোটা বিশ্বাস না ছিলো; তার চেয়ে আরো বেশী নিশ্চিত ছিলো নিজেদের মৃত্যুর কথা। অতএব মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণ করার নাম যদি হয় আত্মহত্যা? তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কখনো একাজ করতেন না। নবীজিও তাঁদেরকে একথা বলতেন না।

সর্বাবস্থায় মুজাহিদদের যুদ্ধনীতি এমন হওয়া উচিত, যাতে করে মুজাহিদদের কোন ক্ষতি না হয় এবং কাফেরদের ক্ষতি বেশী হয়। তাহলে ভাই! আপনাকে

বলবো, অবস্থা যদি এতোই কঠিন হয়, যেখানে নিজের ক্ষয়-ক্ষতি ছাড়া শত্রুর ক্ষতি করা এবং শত্রুর উপর আঘাত করা মোটেই সম্ভব নয়। আফগান যুদ্ধে আমরা এমনটাই দেখেছি। শত্রুরা ক্যাম্প ও ঘাঁটি তৈরী করে অনেক দূর পর্যন্ত মাইন পুঁতে রেখেছে। রাতের অন্ধকারে মুজাহিদগণ এসব মাইন উত্তোলন করে ক্যাম্প দখলের রাস্তা পরিষ্কার করেছেন। কিন্তু সেনা ক্যাম্পের নিকটতম যেসব মাইনগুলো উত্তোলন করতে সক্ষম হয়নি সেখানে পথ একটাই। হামলা করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে একজন মাইনের উপর দিয়ে যাবে। এভাবে সে নিজের জীবন কুরবান করে অন্য মুজাহিদ ভাইদের সংগ্রামের পথ পরিষ্কার করে দিবে। শরীয়ত এধরনের হামলা অনুমোদন দিয়ে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা অনেক ঘটনাই এমন দেখতে পাই।

নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামাতুল কায্যাব যখন বাগান বাড়ির দূর্গম কেল্লার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বেষ্টিত। কেল্লার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আছে উপর্যপূরী রক্ষী বাহিনী। এ কঠিন অবস্থায় অন্দর মহলে ঢোকার কোন পথ নেই। তবে একটাই পথ আছে, কিছু লোক যদি নিজের জীবন কুরবান করতে পারে তবেই ভিতরে ঢোকা সম্ভব হবে। এ জন্য হযরত বারা ইবনে মালেক রা. সাথী-সঙ্গীদের বললেন, তোমরা আমাকে কাঠের ওপর বসিয়ে কোনরকম দেয়াল ও প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছাও। আর বাকীটা আমার উপর ছেড়ে দাও। তারপর পরিকল্পনা মতো বারা ইবনে মালেক রা. কে ভিতরে প্রবেশ করানো মাত্রই তিনি ক্ষীপ্রগতীতে আক্রমণ করলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শত সৈনিককে ধরাশায়ী করে মূল ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন। পরিশেষে তিনি ফটক খুলে দেন। অমনি মুসলিম বাহিনী ভিতরে প্রবেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসায়লামার শিরোশ্ছেদ করেন। এখানে মুসলমানদের বিজয়ের পেছনে মূল রহস্য একটাই। তাহলো নিজেকে মৃতুমুখে ঠেলে দেওয়া।

এই আয়াতের উল্লেখিত ব্যাখ্যার অসারতা সাহাবায়ে কেরাম থেকেই প্রমাণিত। হযরত আবু ইমরান রা. বলেন, কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধের সময় এক মুহাজির সাহাবী যখন একাকী শত্রুর কাতারে ঢুকে তুমুল যুদ্ধ শুরু করলেন, তখন কেউ বলল, হায়! সে কী করছে? সে তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ কথার সূত্র ধরে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. বললেন, এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের ভালো করেই জানা আছে। কারণ, এ আয়াত আমাদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইসলাম ধর্মকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয় দান করলেন তখন কয়েকজন আনসার সাহাবী রা. পরস্পরে আলোচনা করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবতে থাকা এবং তাঁর যথেষ্ট খেদমত করার তাওফিক দান করেছেন। আমরা অনেক

যুদ্ধ-জিহাদ করেছি। ইসলাম জয়ী হয়েছে আর কুফর নিস্তানাবুদ হয়ে গেছে। এখন সর্বত্র ইসলামী পরিবেশ বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন আমরা যুদ্ধ-জিহাদে ব্যস্ত থাকায় নিজেদের ঘর-বাড়ি, ছেলে-সন্তান, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যদির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারিনি। এবার একুট সময় হয়েছে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।"وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" জিহাদ ছেড়ে ছেলে-সন্তান আর চাষাবাদের কাজ-কর্মে ব্যস্ত হয়ে নিজেদেরকে ধংসের মুখে ঠিলে দিয়ো না।

সুতরাং হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. এর বর্ণনা ও আয়াতের শানে নুযূল অনুযায়ী আয়াতের মর্মবাণী তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা জিহাদের ময়দানে যায় না। যারা জিহাদের জন্য নিজের জান-মাল ব্যয় করে না। তারাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আজ আমাদের জন্য অত্যন্ত দু:খের বিষয় হলো, কিছু মূর্খ ও স্বল্পজ্ঞানী লোকেরা মনে করে, জিহাদের ময়দানে গিয়ে জীবন কুরবান করা মানে জীবন ধ্বংস করা। প্রিয় পাঠক! এখন এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি করবেন? এটা আপনার কাছে আমানত। আপনি কি মূর্খ ও স্বল্পজ্ঞানী লোকের মত মনগড়া ব্যাখ্যা করবেন নাকি সাহাবায়ে কেরাম রা. এর মত ব্যাখ্যা করবেন?

আরেকটি বর্ণনায় আছে, কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব রা. কে জিজ্ঞাসা করলো, আমি যদি একাকী শত্রুর কাতারে ঢুকে তুমুল যুদ্ধ করি এবং এ অবস্থায় নিহত হই, আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমি কি আত্মহত্যাকারী হবো? হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বললেন, 'না' বরং আল্লাহ তা'য়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ দিয়েছেন,

"فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" (سورة النساء-٨٤)

হে নবী ! আল্লাহর পথে লড়াই করতে থাকুন। আপনিতো শুধু আপনার জীবনের ব্যাপারেই আদেশ প্রাপ্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে তাদের ব্যাপারে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে। মুফাস্‌সিরীনগণ এই আয়াত সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা একত্র করেছেন। বিস্তারিত জানতে তাফসীর গ্রন্থসমূহ অধ্যায়ন করা যেতে পারে।

মূল কথা

নিজের জীবনের প্রতি মায়া না করে শত্রুর কাতারে ঢুকে পড়া, শত্রুর উপর অতর্কিত হামলা করা, নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়া এবং নিজের জীবনকে

উৎসর্গ করে শত্রুদের মৃত্যু ও ধ্বংসের ব্যাবস্থা করা। এটা চরম দুর্ভাগ্য নয়; বরং পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু প্রকৃত অর্থে দুর্ভাগ্য ও পোড়াকপাল এবং ধ্বংস ও বরবাদী তাদের জন্য যারা ভীতু-কাপুরুষ। জিহাদ থেকে দূরে থাকে। যারা কার্পণ্যতা প্রকাশ করে এবং জিহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আকলে সালীম দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

ঐতিহাসিক ফতোয়া

আত্মঘাতি হামলার বিষয়ে সাপ্তাহিক 'যরবে মুমিন' ৫ ও ১১ ই রবিউল আওয়াল ১৪২১ হিজরী, ৯ ও ১৫-ই জুন ২০০০ সালে একটি ফতোয়া প্রচার করে। *নওজোয়ান মুজাহিদ আফাক আহমাদ শহীদ রহ. কর্তৃক এক ভয়ংকর আত্মঘাতি বোমা হামলায় শ্রীনগরের ইন্ডিয়ান সেনা বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে ছোট খাট কেয়ামত ঘটে যায়। এরপর থেকেই নানা মহলো থেকে প্রশ্ন আসে, এধরনের হামলার শরয়ী বিধান কি? আফগান ও কাশ্মীর জিহাদের ২০ বছরের ইতিহাসে এধরণের হামলা ছিলো প্রথম। ইতিপূর্বে আর কখনো আত্মঘাতি হামলা হয়নি। তাই এধরনের হামলার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আসাটা স্বাভাবিক। উক্ত বিষয়ে 'যরবে মুমিন' তার প্রিয় পাঠকের সঠিক অবগতির জন্য দেশের নির্ভরযোগ্য ও গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরী টাউন, দারুল ইফতায় ফতোয়া তলব করে যে, নিজের গাড়িতে বোমা ও বিস্ফোরক ভর্তি করে অথবা নিজের শরীরের সাথে বোমা বেঁধে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিংবা অন্য কোন যালিম-কাফিরদের উপর হামলা করে নিজের জীবন শেষ করে দেয়া জায়েয হবে কি না?*

কেউ কেউ এরকমের হামলাকে আত্মহত্যা নামে অভিহিত করায় অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এধরনের হামলা করা যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে জিহাদ বলা যাবে কি না?

উচ্চতর গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন এর দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ এর স্বনামধন্য মুফতী সাহেবগণ সম্মিলিত ভাবে ঐতিহাসিক ফতোয়াটি লিখিত আকারে প্রকাশ করেন। ফতোয়ার জবাব ছিল এই, এধরনের আত্মঘাতি হামলা শুধু জায়েযই নয়; বরং এটা হচ্ছে জিহাদ ও শাহাদাতের সর্ব্বোচ্চ মর্যাদা। ফতোয়ায় এধরনের হামলাকে অত্যন্ত প্রসংশা করে মুজাহিদদের শাহাদাতকে শ্রেষ্ঠ শাহাদাতের মর্যাদা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত ফতোয়া থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে আসে যে, আল্লাহর পথে জীবনবাজী রাখা এবং জীবন কুরবানী করার চেয়ে উত্তম কোন সুরত ও নমুনা হতে পারে না। যারা এটাকে আত্মহত্যা মনে করেন তারা জ্ঞানহীনতা ও সল্পজ্ঞানেরই পরিচয় দেন। শুধু তাই নয়; বরং আত্মহত্যার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ। কারণ, আত্মহত্যাকারী দুনিয়ার বালা-মুসিবত ও জ্বালা-যন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়, তারপর আল্লাহর হুকুম পরিপন্থি নিজের জীবন ধ্বংস করে। কিন্তু আত্মঘাতি হামলার বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মঘাতি হামলাকারী মুজাহিদদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বিধান জিহাদের আমলের মাধ্যমে কুফুরী শক্তিকে নিস্তানাবুদ করা। কাফেরদের মাঝে ভয়ও আতংক সৃষ্টি করা। মুসলমানদের বীর বাহাদুরী প্রকাশ করা। অবিস্মরণীয় শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া।

দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ এর পক্ষ থেকে আত্মঘাতি হামলার বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের আলোকে এই পরামর্শ দেয়া হয়েছে, বর্তমান যুগে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়ার জন্য যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাফেররা এবং তাদের মিত্ররা জোট গঠন করেছে, বিশ্ব মানচিত্র থেকে ইসলমের নাম মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। আর এক্ষেত্রে কাফের প্রধানরা নিজেদেরকে নিরাপত্তার বেষ্টনীতে নিরাপদ মনে করে ক্রমশ মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অপর দিকে মুজাহিদদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম না থাকায় কাফেরদের বরবরতা ও পাশবিকতা বেড়েই চলছে। তাই এমন পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য এধরনের হামলার কোন বিকল্প নেই। প্রয়োজনে এধরনের হামলাকে আরো উন্নত ও আধুনিকায়ন করা উচিত, যাতে বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তি ও টেকনালোজীর ধজ্বাধারী কাফেররা এধরনের হামলার মুকাবিলা করার সাহস না পায়।

ফতোয়া আনুযায়ী এরকম অকুতভয় হামলার পেছনে ঈমানী শক্তি, দ্বীন রক্ষার প্রেরণা, ইসলামের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার আত্মাভিমান, জিহাদের জযবা আর শাহাদাতের অদম্য আকাংখার কথা উল্লেখ করা হয়। যালেম কাফেরদের আতংকিত করে তোলার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত এবং বীর-বাহাদুরী প্রকাশের চুড়ান্ত সীমা এই হামলার বিকল্প আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, খাইরুল কুরুন-সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুজাহিদগণের অবস্থা এবং ফিক্বাহ শাস্ত্রের কিতাব থেকে দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে আফাক শহীদ রহ. এর আত্মঘাতি হামলাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, ইসলামের হেফাজত এবং বীরত্ব ও বাহাদুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এই ফতোয়াটি জামেয়া বিন্নুরী টাউন এর ফতোয়া বিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী (হাফিযাহুল্লাহ) [যিনি বর্তমানে বংলাদেশে হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রধান মুফতী] জামেয়ার শাইখুল হাদীস ও ফতোয়া বিভাগের পরিচালক মুফতী নিযাম উদ্দীন শামযায়ী এবং মুফতী আব্দুল মজিদ দ্বীনপুরী প্রমূখ উলামায়ে কেরামের স্বাক্ষর ও সীলসহ ফতোয়াটি প্রকাশ করা হয়।

একটি স্বপ্ন

এক যুবক স্বপ্নযোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত নসীব করেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কাঁধে তুলে রেখেছেন। এ স্বপ্ন দেখার পর যুবকের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যায়। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানাতে এক বুযুর্গের নিকট ছুটে গেলেন। বুযুর্গ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মাধ্যমে ইসলামের বড় ধরনের কোন কাজ নিবেন। এজন্য এখন সঠিক পথে চলে আসুন। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাচ্চা আশেক ও দেওয়ানা হয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই যুবক হলেন কমান্ডার শহীদ বেলাল রহ.। যাঁর নাম পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত। ১৪২১ হিজরীর ২৮ শে রমযান, সোমবার দিন, দুইটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় একটি প্রাইভেটকারে আড়াই মন গোলা বারুদ ভর্তি করে "কালিমায়ে তাইয়িবা" পড়া অবস্থায় শ্রীনগরে অবস্থানরত ইন্ডিয়ান বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে এক ভয়ংকর আত্মঘাতি হামলা করেন। এ হামলায় কয়েক ডজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয় এবং কয়েকটি ভবন মাটির সাথে মিশে যায়।

[সূত্রঃ যরবে মুমিন ৫ ও ১২ই রবিউল আওয়াল, ১৪২১ হিজরী।]

সংশয়-২৭

বর্তমানে আত্মঘাতী ও ফিদায়ী হামলায় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু নিহত হয়। অথচ হাদীস শরীফে সুস্পষ্টভাবে তাদের হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপরেও এধরনের হামলা করা হয় কেন?

সমাধান -

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা যুদ্ধে শরীক না হবে। পক্ষান্তরে এরা যদি যুদ্ধে শরীক হয় অথবা বুদ্ধি-পরামর্শ ও অর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কাফের সৈন্যদের সাহায্য করে, কিংবা

এদেরকে যুদ্ধের জন্য উস্কেদেয় এবং এদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করে। মোটকথা যে কোন পন্থায় তারা যদি কাফেরদের সাহায্যকারী সাব্যস্ত হয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা জায়েয। বরং এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

হোক না শিশু কিংবা পাগল, দুর্বল, বৃদ্ধ-নারী

নিশ্চয় সে শত্রু হবে যে শত্রুর সাহায্যকারী।

ইমাম আবূ জাফর আহমদ বিন মুহাম্মদ ত্বহাবী রহ. স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব (শরহু মা'আনির আসার) এর মধ্যে নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

"باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا -"

জিহাদের মধ্যে বৃদ্ধদেরকে হত্যা করা যাবে কি না? এই শিরোনামে নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে একটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন।
হাদীস শরীফঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধ থেকে অবসর হয়ে সৈন্যবাহিনীকে আবূ আমেরের হাতে সোপর্দ করে আওতাসের দিকে রওয়ানা করেন। সেখানে হযরত রবী ইবনে রফী রা. দুরাইদ ইবনে সম্মাকে পেয়ে তার উটের লাগাম ধরে ফেললেন। প্রথমে ধারণা করেছিলেন কোন মহিলাা হবে পরে দেখেন এতো বৃদ্ধপুরুষ। দুরাইদ হযরত রবী রা. কে বললেন, তোমার মনের বাসনা কি? হযরত রবী রা. বললেন, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই। তিনি তলোয়ার চালালেন কিন্তু তার কিছুই হলো না। তখন দুরাইদ বলল-

"بِئْسَمَا سَلَّحَتْكَ أُمُّكَ ، خُذْ سَيْفِي هَذَا مِنْ مُؤَخَّرِ رَحْلِي ، ثُمَّ اضْرِبْ وَارْفَعْ عَنْ الْعِظَامِ ، وَارْفَعْ عَنْ الدِّمَاغِ فَإِنِّي كَذَلِكَ كُنْتُ أَقْتُلُ الرِّجَالَ"

তোমার মা তোমাকে ভাল করে শিখায়নি। আমার পিছন থেকে তলোয়ার নাও। এরপর আঘাত কর। হাড্ডি দ্বি-খন্ডিত কর। মগজ বিচ্ছিন্ন করে দাও। কেননা এভাবেই আমি মানুষকে হত্যা করতাম। আল্লামা ত্বহাবী একটু অগ্রসর হয়ে বলেন-

"فَلَمَّا قُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَانٍ ، لَا يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَمْ يَعِبْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْفَانِيَ يُقْتَلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَأَنَّ حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الشُّبَّانِ لَا حُكْمُ النِّسْوَانِ."

যখন দুরাইদের মত বৃদ্ধ [যে নিজের প্রতি আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না] কে হত্যা করা হলো আর রাসূল ﷺ এতে কোন দোষারোপ করলেন না। তখন এটাই প্রমাণিত হয় যে, বয়োবৃদ্ধ লোককেও দারুল হরবে হত্যা করা বৈধ। তাদের হুকুম যুবকদের হুকুমের মত; মহিলোাদের মত নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে বৃদ্ধকে হত্যা করতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যেমন হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন."لا تقتلوا شيخًا كبيرًا"'তোমরা বৃদ্ধকে হত্যা করবে না।' এই হাদীসের উত্তর দিতে গিয়ে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন-

"فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لامعونة لهم على شئ من أمرالحرب من قتال ولارأي وحديث دريدعلى الشيوخ الذين لهم معونة فيا لحرب كماكان لدريد"

দারুল হরবের বৃদ্ধকে হত্যা না করার বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব বৃদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে কাফেরদের কোন সহায়তা করে না। না সরাসরি আক্রমণ করে, আর না পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করে। দুরাইদের হাদীস সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধে বৃদ্ধদের হাত থাকে। যে বৃদ্ধ যুদ্ধে সহায়তা করে অথচ স্বশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না তাকে হত্যা করা বৈধ। কারণ, যুদ্ধের সময় পরামর্শ ও মতামত দিয়ে সহায়তা করাটা অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের চেয়ে মারাত্মক হয়ে থাকে। ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন-

"فلابأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لان تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثيرمن القتال ولعل القتال لايلتئم لمن يقاتل إلابها فإذاكان كذلك قتلوا"

'সুতরাং সহায়তাকারী বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতে কোন বাধা নেই। কেননা তাদের এসব সহায়তা অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার চেয়েও ক্ষতিকর। অনেক ক্ষেত্রে যোদ্ধারাও তাদের সহায়তা বুদ্ধি-পরামর্শ ছাড়া যুদ্ধই করতে পারে না। তাই তাদের এহেন কর্মকাণ্ডে তারা হত্যাযোগ্য বলে বিবেচিত।'

যেসব নারী যুদ্ধে সহায়তা করে তাদের হত্যা করা জায়েয। এ ব্যাপারে ইমাম ত্বহাবী রহ. বলেন–

"وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لابأس بقتل المرأة إذاكانت أيضا ذاتدبيرفي الحرب كالشيخ الكبيرذي الرأي في أمورالحرب"

দুরাইদ ইবনে সম্মাকে যুদ্ধে সহায়তা করার অপরাধে হত্যা করা এ কথার প্রমাণ বহন করে, যে নারী যুদ্ধে সহায়তা করবে তাকেও হত্যা করা বৈধ। তেমনিভাবে সহায়তাকারী বৃদ্ধ ও নারীর মত সহায়তাকারী না বালেগ বাচ্চাকেও হত্যা করা বৈধ। ফিক্বহের কিতাবে ফুক্বাহায়ে কেরাম একথাগুলো স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এ বিষয়ে ছোট-বড় যে কোন কিতাব দেখা যেতে পারে।

ফায়েদাঃ দুরাইদ ইবনে সম্মাকে যখন হত্যা করা হয় তখন তার বয়স ছিল একশত ষাট বছর। [রমযুল হাক্বায়েক]

বিঃ দ্রঃ কারো মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বর্তমানে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর নানা জিহাদী কার্জক্রম চলছে। এরই জেরধরে কিছুদিন আগে আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হয়েছে। সেখানে বৃদ্ধ, নারী ও শিশু সকলেই আক্রান্ত হয়েছে। এর শরয়ী সমাধান কি? এ বিষয়ে আমি এ কথা আরজ করব যে, তখনকার গবেষণা এবং অনুসন্ধান অনুযায়ী পৃথিবীতে এমন কোন নারী-পরুষ পাওয়া যায় না যারা সধ্যানুযায়ী ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে সহায়তা করছে না। মূলত উপরোক্ত প্রশ্নটি আমাদের ভুল বোঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। নতুবা কাফেরদের প্রত্যেকটি সদস্য যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে সকলেই সাধ্যানুযায়ী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করে আসছে। আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকেও এই ধরনের চেতনাশক্তি দান করুন। সবাই যদি ময়দানের দিকে মনোযোগী হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ! কাফেরদের পরাস্ত করা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

১৪২২ হিজরীর ১৯ রজব রাতে ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের উপর আমেরিকা কর্তৃক আক্রমণের পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ এক বার্তায় একথা স্পষ্ট করে বলেছিল, আমেরিকার প্রত্যেকটি নাগরীক যুদ্ধবাজসৈনিক।

[দৈনিক আওসাফ, ২০ রজব ১৪২২ হিঃ ১৮ই অক্টবর ২০০১ সোমবার।]

কাফেররা যখন নিজেরাই একথার বাস্তবতা স্বীকার করছে যে, কাফেরদের প্রত্যেকটি নাগরিক যুদ্ধবাজ সৈনিক তখন তাদের জনসাধারণকে হত্যা করতে কি সন্দেহ থাকতে পারে?

সংশয় -২৮

আত্মঘাতী হামলা বা ফেদায়ী হামলা যখন কোন সাধারণ লোকালয়ে করা হয় তখন তো মুসলমানও মারা যায়। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বড় কঠিন ও মারাত্মক গুনাহ। সুতরাং এ ধরণের হামলায় অন্যান্ন মুসলমানদের মারা হচ্ছে কেন?

সমাধান-

মুসলমানকে হত্যা করা মারাত্মক গুনাহ এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মুসলমানকেই হত্যা করা উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এখানের অবস্থা ভিন্ন।

আমাদের আলোচনা এই বিষয়ে যে, আমরা শুধু কাফেরকে হত্যা করাই ইচ্ছা করি। তবে এ জন্য সাধারণ লোকালয় টার্গেট করার কয়েকটি কারণ হতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ: সেখানে কাফেরদের ব্যবসায়ীক কেন্দ্র হতে পারে যার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক সামর্থ অর্জন করছে। অথবা উক্তস্থান জিহাদের জন্য বড়ই অনুকুলের অথবা সেখানে এমন কোন প্রভাবশালী কাফেরের উপস্থিতি থাকতে পারে যাকে হত্যা করলে অন্যদের মানসিকতা ভেঙ্গে যায় কিংবা লোকালয়ে আক্রমণ করে জনসাধারণকে হুকুমত ও রাষ্ট্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়ে দেয়া যায়। মোটকথা এ রকম নানান হিকমত ও উদ্দেশ্যে লোকালয়ে আক্রমণের উত্তম জায়গা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।
মোটকথা, যেখানে কাফেরদের হত্যা করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মুসলমানকে নয়; কিন্তু মুসলমানকে হত্যা করা ব্যতীত উক্ত কাফেরকে হত্যা করা যদি সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে ফুক্বাহায়ে কেরামের এর দিক নির্দেশনা হলো, মুসলমান মারা যাওয়ার পরোয়া না করে আল্লাহর নামে কাজ করে যাবে।

মাসআলা

যদি কোন দূর্গের উপর আক্রমণ করা হয় আর তার মধ্যে কোন মুসলিম ব্যবসায়ী অথবা বন্দী থাকে, এমতাবস্থায় দূর্গের উপর হামলা করলে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ীও আক্রমণের শিকার হবে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে পুরো দূর্গের কাফেরদের হত্যা না করে ছেড়ে দেয়া তুলনামূলকভাবে অনেক ক্ষতিকর। তাই বড় লাভের আশায় ছোট ক্ষতি বরদাশত করতে হবে। [হিদায়া]

মাসআলা

কাফেরদের উপর আক্রমণ করলে তারা যদি নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য মুসলমান সন্তানদেরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যে, মুসলমান সন্তানদের কারণে যেন তাদের উপর আক্রমণ করা না যায়। আর মুসলমানরা নিজেদের সন্তানদের হত্যা করা ব্যতীত কাফেরদের হত্যা করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সন্তানদেরকে হত্যা করতে পিছপা হওয়া চলবে না। [মুখতাছারুল কুদুরী]

মাসআলা

এ সকল পরিস্থিতিতে যদি কোন মুসলমান হামলার শিকার হয়ে নিহত হয় তাহলে কোন দিয়ত বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কেননা দিয়ত একটি জরিমানা বা অর্থদণ্ড আর জিহাদ একটি ফরয বিধান। কোন ফরয বিধান আদায় করলে দিয়ত ওয়াজিব হয় না।

সংশয়-২৯

আত্মঘাতি হামলা অর্থ আত্মহত্যা। শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যা হারাম। তাহলে মুজাহিদদের জন্যে আত্মঘাতী হামলা বৈধ হয় কিভাবে?

সমাধান -

এই প্রশ্নের জবাব যদিও আমি রাওল পিণ্ডির আঢয়ালা জেলে ৩০২ নং হত্যা মামলায় বন্দী থাকাবস্থায় কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে বই আর প্রকাশ হয়নি। আমার কারামুক্তির এক বছর পর দ্বিতীয়বার বরং ছয়বার আটক হওয়ার পর একমাস নজরবন্দী রেখে আমাকে সারগোধা জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ আবার দিলে নতুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত লিখব। আত্মঘাতী হামলার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনকারীদের নিম্নোক্ত আপত্তিগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরে এর পর্যালোচনা ও উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো।

এক. তারা বলে আত্মঘাতী হামলা অর্থ আত্মহত্যা।

এর জবাব হলো, এটা আত্মহত্যা নয় বরং এটা কুফুরহত্যা। কেননা যারা এই হামলা সম্পাদন করে তারা জানে যে, এটা নিজের প্রাণ বিসর্জন নয় বরং কুফুরের প্রাণ বিনাশ করার জন্যই করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই থাকে, কাফেররা যে নিরাপত্তায় বেষ্টিত থাকে সেখানে পৌছা যদিও সহজ নয়; কিন্তু এই চূড়ান্ত অপারেশন দ্বারা সেখানে পৌছা সহজ হয়ে যায়। ভিন্ন আঙ্গিকে বলতে পারি যে,

এটা কোন আত্মহত্যা নয় যাকে শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিংবা এ ব্যাপারে কঠিন থেকে কঠিনতম কোন ধমকি এসেছে। বরং এটা হলো আত্মবিসর্জন অর্থাৎ মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু নিজের প্রাণকে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করে দেয়া। এ আমল নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয়। কবির ভাষায়-

প্রাণ যদি যায় প্রাণ হরণে
শত্রুতা নয় প্রেম বরণে;
নয়তো এটা আত্মহত্যা কাফের নিধন হয় যাহাতে
ধ্বংস তো নয় ভাগ্য এটা জ্ঞাণীজনই যায় তাহাতে।

দুই.

জিহাদের জন্য কোন অবস্থায় যিনা ও মদপানের আশ্রয় নেয়া জায়েয নেই। যদিও পলিসিগতভাবে এর দ্বারা চরাবৃত্তিসহ অন্য কোন ফায়দা হোক না কেন? ঠিক তেমনিভাবে আত্মঘাতী হামলাও কোন অবস্থায় জায়েয নয়। কারণ, এটাও এক ধরনের হারাম কাজের [যিনা ও মদ পানের] আশ্রয় নেয়ার মতোই।

সমাধান -১

এ ধরণের আপত্তি তারাই উত্থাপন করে যারা আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলা বা ফেদায়ী হামলার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। কেননা আত্মহত্যা ও আত্মঘাতী হামলার মাঝে এতটা পার্থক্য যতটা পার্থক্য মৃত ব্যক্তির দুর্গন্ধময় শরীর ও শহীদের মোবারক ও পবিত্র দেহের মাঝে। আত্মহত্যাকারী নিজের জীবনের প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতা, আল্লাহ তা'য়লার প্রতি অসন্তুষ্টি এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের থেকে নিরাশ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কুফুরীর প্রাণনাশ ও ফেদায়ী হামলা করে প্রাণোৎসর্গকারী ব্যক্তি শাহাদাতের পাগল হয়, আল্লাহ তা'য়ালার দীদারের প্রতি হয় প্রবল আগ্রহী এবং আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের প্রত্যাশী।

দ্বিতীয়তঃ যিনা, মদপান ও হত্যার মাঝে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান। যিনা না মুসলমান মহিলোর সাথে না কাফের মহিলোর সাথে। তেমনি মদ না মুসলমানের জন্য বৈধ আর না কাফেরের জন্য। পক্ষান্তরে মুসলমানকে হত্যা করা অবৈধ ঠিকই; কিন্তু কাফেরকে হত্যা করা শুধু জায়েযই নয় বরং অনেক বড় ইবাদত। সুতরাং উভয়ের মাঝে এত বড় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হত্যাকে মদ-যিনার সাথে তুলনা করা নিছক নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই পার্থক্য বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তিন. 'আত্মঘাতী ও ফেদায়ী হামলায় অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তিও মারা যায়।'

এ কথার জবাব হলো দুটি
এক. কাফের ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক কিংবা হিন্দু হোক সকলেই সমষ্টিগতভাবে অপরাধী, কেউই নিরপরাধ নয়। বরং এখনতো তাদের মহিলোাদেরকেও তাদের অপারাধের অংশীদার রূপে দেখতে পাই। কারণ, তাদের কেউ সরাসরি অপরাধী আর কেউ অপরাধীর সাহায্যকারী। নিরপরাধ কেউ নেই। সুতরাং আপনারা তাদেরকে নিরাপরাধ মনে করেন কিভাবে?
এ ধরণের কাজে শুধু মূল লক্ষ্যই ধর্তব্য হয়। আনুসাঙ্গিক বিষয় ধর্তব্য নয়। আর ফেদায়ী হামলায় টার্গেট হয় রাঘব বোয়ালকে খতম করা অথবা ওদের বাণিজ্যিক সেন্টারকে ধ্বংস করা। এতে যদি অন্যান্য জিনিস এর আওতায় চলে আসে সেগুলিও এক সাথে ধ্বংস করে দেয়া হবে। এতে ক্ষতি কিসের? [১০ ই রমজানুল মোবারক ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ৬ই নভেম্বর ২০০৩ ইং, সিকিউরিটি ওয়ার্ড, ডিসট্রিক্ট জেল, সারগোধা।]

আত্মঘাতী হামলা কুরআন থেকে প্রমাণিত

রুচিশীল লিখক ও সৃজনশীল বইয়ের চাহিদা হলো কুরআনে কারীমের দলীলকে প্রথমে আনা। কিন্তু এই দলীলটি সর্বশেষ আমার হাতে পৌঁছার কারণে আলোচনার শেষেইউল্লেখ করছি। আমি এ দলীলটি পেয়েছিলাম ১৪২৫ হিজরীর পহেলো রমজান শুক্রবার দিন। সে দিন গুখারমন্ড জেলার গুজরানওয়ালাতে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে জিহাদের বিষয়ে সবক প্রদানের জন্য আসলে ছাত্ররা আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। আমি আমার সামান্য ইলমী যোগ্যতা অনুযায়ী তার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি। ফিরে আসার পথে আমাদের গ্রাম থেকে ৮৭ মাইল দক্ষিণে সারগোধা জেলার মসজিদে গেলাম। সেখানে শাইখুত তাফসীর মাওলানা মুনীর আহমদ সাহেব [হাফিযাহুল্লাহ] আরেকটি বাৎসরিক তাফসীরুল কুরআন অনুষ্ঠানে দরস দিচ্ছিলেন। হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আমার দরসের প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কে তাকে অবিহিত করলাম। হযরত বিশেষভাবে আত্মঘাতী হামলা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আমি কি কি দলীল দিয়েছি তা জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দু'একটি দলীল বললাম। তখন হযরত বললেন, আমি তো আত্মঘাতী হামলা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের এই আয়াতের মাধ্যমে দলীল দিয়ে থাকি। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"

[হে মুসলমানগণ!]'তোমরা কাফেরদের মুকাবিলায় সামর্থ অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ কর সমরশক্তি এবং অশ্বের মাধ্যমে যেন তোমরা আল্লাহর শত্রু এবং নিজেদের শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখতে পার।' [সূরা আনফাল-৬০]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সে সকল হাতিয়ার প্রস্তুত করতে বলেছেন যেগুলোকে কাফেররা ভয় করে এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। আর বর্তমান যমানায় কাফেরদের ভীত ও আতংকিত করে রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো আত্মঘাতী হামলা। আত্মঘাতী হামলাকে কাফেররা যেরূপ ভয় করে সম্ভবত আর কোন কিছুকে এতটা ভয় করে না। সুতরাং কাফেরদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী হামলাকে মরণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণিত।

আলেম-উলামা এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলবো, আত্মঘাতী হামলার বৈধতা কুরআন থেকে 'দালালাতুননস' হিসাবে প্রমাণিত।

ফিক্বাহ শাস্ত্রে আত্মঘাতী হামলা

আহকামুল কুরআনের লেখক ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. ইমাম মুহম্মদ রহ. রচিত গ্রন্থ 'আসসিয়ারুল কাবীর' এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি একাই এক হাজার সৈনিকের উপর হামলা করতে চায়, তার জন্য একটি শর্ত অনুযায়ী এধরনের হামলা করা বৈধ হবে। শর্ত হলো, এ ধরনের হামলা করার পরেও যদি তার বেঁচে থাকার আশা থাকে, বিজয়ের আশা থাকে অথবা এর দ্বারা দ্বীনের কোন ফায়েদা হবে আর কিছু না হলেও কমপক্ষে মুসলমানদের জন্য কিছু না কিছু কল্যাণ বয়ে আনবে। তবেই এধরণের কোন হামলা বৈধ হবে। আর যদি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকে, বিজয়ের আশা না থাকে অথবা মুসলমানদের কোন উপকার না হয়, কিন্তু এ ধরনের হামলার কারণে কাফেরদের মধ্যে ভয়-ভীতিও সঞ্চার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহলেও এধরনের হামলা করা জায়েয। কেননা তার মাঝেও মুসলমানদের কল্যাণ এবং বিজয়ে অপেক্ষা করছে।'

বর্তমান যমানায় কাফেরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত আত্মঘাতী হামলা তাদের উপর কি পরিমাণ ভয়-আতংক ছড়িয়েছে। এটা তাদের রিপোর্ট থেকেই অনুমান করা যায়। ইসলামের শত্রুদেরকে আতংকিত ও সন্ত্রস্ত করে রাখা যেহেতু শরীয়তের উদ্দেশ্য; এজন্য বলা যায় যে, আত্মঘাতী হামলাই মুসলমানদের বিজয় প্রতীক।

সংশয় -৩০

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন কাফেরকে হত্যা করেননি। তিনি শুধু কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়েছেন। যাতে সব কাফের জান্নাতবাসী হয়ে যেতে পারে। তাহলে আপনারা কাফেরদের হত্যা করে যাচ্ছেন কেন?

সমাধান-

ইসলামী শরীয়তে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও করেননি। কিন্তু তাতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সাহাবীদেরকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন: আযান, ইক্বামাত। এগুলিও নবীজীর সুন্নত। যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কখনও তা করেননি। অন্য কথায় বলা যায়, শরীয়তের কিছু আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাজের দ্বারা প্রমাণিত আর কিছু কথার দ্বারা প্রমাণিত। কাফেরদের হত্যার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা এবং কাজ উভয় ভাবে প্রমাণিত। উভয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিচে লক্ষ্য করুন।

কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উৎসাহ ও সুসংবাদ প্রদান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এতে জান্নাতের সুসংবাদ ও দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন,

"أفشوا السلام وأطعموا الطعام واضربواالهام تورثوا الجنان."

- جامع الترمذی :٧/٢ باب ماجاء في فضل إطعام الطعام .رقم الحديث:١٨٤٨ - كنز العمال: ٢٥٢٥١ - مشكاة : ٣٣٢ كتاب الجهاد – الفصل الثانی. أخرجه البخاری ومسلم عن أبی كريب عن أبی أسامة ، - مسلم :باب من فضائل أبي موسى وأبی عامر ٣٠٣/٢ ، - صحيح البخاری باب غزوة أوطاس ٢١٩/٢ ،

'বেশী বেশী সালাম কর, খানা খাওয়াও, কাফেরের মাথার খুলি উড়িয়ে দাও তাহলে জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে।'

ধৈর্য-ক্ষমা যথাস্থানে ছিল নবীর শান
তাই বলে কি যুদ্ধে যেতে করেননি আহ্বান?
তাঁর জীবনে কাফের হত্যা নয় কি প্রমাণিত
রণাঙ্গনে করেননি কি সেনা সুসজ্জিত?

কাফের হত্যায় নবীজীর আনন্দ প্রকাশ

বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের হত্যার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনী দেন এবং শুকরিয়ার সিজদা আদায় করেন।

কোন কোন বর্ণনায় নবীজী শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। নবীজীর প্রতি বেয়াদবীপূর্ণ আচরণকারী ইসমা নামক ইহুদী নারীকে যখন হযরত উমায়ের ইবনে আদী রা. হত্যা করলেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

"إذاأحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عميربن عدي"

الصارم المسلول على شاتم الرسول لإبن تيمية رح ٣/٩٤

'কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে দেখতে চাও, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেছে তবে উমায়ের ইবনে আদীকে দেখ।'

একবার হযরত উমায়ের বিন আদী রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

انطلقوابنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده

-الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٧٢٢

'তোমরা আমাকে বনী ওয়াকেফের চক্ষুস্মান ব্যক্তির নিকট নিয়ে চল। তাঁকে একটু দেখে আসি।'

দেখুন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুস্থ, চক্ষুস্মান বললেন অথচ উক্ত সাহাবী অন্ধ ছিলেন। তিনি অন্তর দিয়ে সত্যকে দেখেছিলেন অথবা তিনি চক্ষুস্মান ব্যক্তির ন্যায় কাজ সম্পাদন করেছেন; এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চক্ষুস্মান ব্যক্তি বলেছেন।

কাফের হত্যার বিনিময়ে পুরস্কার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. যখন নবীজীর শত্রু খালেদ বিন সুফিয়ানকে হত্যা করে অভিশপ্তটির মাথাটি দরবারে উপস্থিত করলেন তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরস্কার স্বরূপ তাকে একটি লাঠি প্রদান করে বলেন-

تخصر به في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل

- البداية والنهاية

"এই লাঠি নিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর লাঠি নিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীর সংখ্যা খুবই কম।" [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. আমৃত্যু উক্ত লাঠিটি সংরক্ষণ করেছেন এবং মৃত্যুর সময় এই ওসীয়ত করেছেন যে, এটাকে যেন তার কাফনের ভিতরে দিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে এমনটাই করা হয়েছিল।

রসূল ﷺ নিজ হাতে কাফের হত্যা করেছেন

উবাই ইবনে খলফ একটি ঘোড়া লালন-পালন করতো। খাবার খাইয়ে তাকে খুব মোটাতাজা করতো আর বলতো, এই ঘোড়ায় চড়ে আমি মুহাম্মদকে হত্যা করবো। যখন নবীজীর নিকট এ সংবাদ পৌছল তখন নবীজী বললেন, ইনশাআল্লাহ! আমিই তাকে হত্যা করবো। উহুদ যুদ্ধে সে যখন নবীজীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো তখন সাহাবায়ে কেরাম অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে, তাকে এক্ষুনি খতম করে দিব। নবীজী বললেন, তাকে কাছে আসতে দাও। যখন কাছে আসল নবীজী হযরত হারিস বিন সামিয়্যা রা. থেকে একটি বর্শা নিয়ে ওর গর্দানের উপর মারলেন। এতে তার মৃদু আঁচড় লগল এবং সে চিল্লাতে চিল্লাতে ফিরে এসে বলল, খোদার কসম! মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলেছে। লোকেরা তার আত্মমর্যাদা স্মরণ করে দিয়ে বলল, এই সাধারণ আঘাতে ষাড়ের মত চিল্লাচ্ছো? সে বলল, এটা মুহাম্মাদের আঘাত। সে তো মক্কায়ই বলেছিল, 'আমি তাকে হত্যা করবো।' খোদার কসম! যদি সে আমার প্রতি থুতুও নিক্ষেপ করত তাতেও আমি মারা যেতাম। যদি এই আঘাতের ব্যথা সমস্ত মক্কাবাসীকে ভাগ করে দেয়া হত তবে তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হত। সে এই অবস্থায় সারিফ নামক স্থানে মারা যায় এবং নবীজীর মোবারক হাতের আঘাত খেয়ে জাহান্নামে চলে যায়। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

হে কাপুরুষের দল! আল্লাহকে ভয় কর। নবীজীর মত মহাবীর পুরুষের উপর অভিযোগ কর না। 'রাসূল ﷺ কোন কাফেরকে হত্যা করেননি এমন মিথ্যাচার করো না। বরং নিজের কাপুরুষতার চিকিৎসা কর। বিবেক দিয়ে কাজ কর। দ্বীন বুঝার চেষ্টা কর। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীন বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয় -৩১

কাফেরদেরকে হত্যা করা তো দূরের কথা নবীজী ﷺ কখনো কাফেরদের জন্য বদ দোয়াও করেননি। তায়েফের দাওয়াতী সফরে যখন কাফেররা নবীজীকে পাথর মেরে শরীর মোবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত করল তখন হযরত জিবরীল আ. উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, কওমের প্রতি আপনার দাওয়াত এবং তাদের কটূক্তিমূলক জবাব আল্লাহ তা'য়ালা শুনেছেন। তিনি একজন ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যিনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। আপনি যা ইচ্ছা তাকে আদেশ করুন। উক্ত ফেরেশতা উপস্থিত হয়ে সালাম পেশ করে বললেন, যা আদেশ করবেন তা সম্পাদন করবো। যদি আদেশ হয় তবে উভয় পাহাড়কে একত্র করে ফেলবো। উভয় পাহাড়ের মাঝে সবাই পিষ্ঠ হয়ে মারা যাবে। অথবা আপনি যা বলেন তাই করবো। নবীজী ﷺ কোমল উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এই দোয়া করি, তারা যদি ঈমান না আনে তবে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে এমন লোক জন্মগ্রহণ করবে যারা আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত করবে।

সমাধান-

এ ধরনের কথাবার্তা বলা মূলত দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, নবীজীর সীরাত থেকে দূরত্বতা, অনির্ভরতা এবং কাফেরদের মুহাব্বতের কারণেই হয়ে থাকে। একথা অনস্বীকার্য যে, নবীজী ﷺ অসংখ্য স্থানে কাফেরদের কষ্ট সহ্য করেও তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেননি। কিন্তু এক কথাও সঠিক যে, নবীজী ﷺ অনেক স্থানে বদ দোয়া করেছেন। কোথাও কাফেরদের নাম নিয়ে আবার কখনও নাম ছাড়া। এর কয়েকটি উদহরণ এখানে পেশ করা হয়েছে-

এক.

নবীজী ﷺ এর বড় মেয়ে হযরত রুকাইয়া রা. আবু লাহাবের ছেলে উতবা ও ছোট মেয়ে উম্মে কুলসুম রা. আবু লাহাবের ছেলে উতাইবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। যখন সূরা লাহাব অবতীর্ণ হলো তখন আবু লাহাব কসম খেয়ে বলল, যতক্ষণ তোমরা মুহাম্মাদের মেয়েদেরকে না ছাড়বে; ততক্ষণ আমি তোমাদের সাথে কথা বলব না। তখন তারা উভয়কে তালাক দিয়ে দিল। কিন্তু হযরত উম্মে কুলসুম রা. এর স্বামী উতাইবা তালাকের সাথে সাথে নবীজীর শানে কদর্যপূর্ণ কথাবার্তা বলল। তখন নবীজী উতাইবার উপর বদ দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আপনার কুকুরের মধ্য থেকে একটি কুকুর তার উপর ন্যাস্ত করে দিন" পরবর্তিতে এই খবীস এভাবেই ধ্বংস হয়েছে।

[বিস্তারিত দেখুন- উসদুল গাবাহ]

দুই.

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন যে, চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে খন্দকের যুদ্ধে ব্যস্ততার কারণে যখন নবীজীর আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল তখন তিনি কাফেরদের জন্য বদ দোয়া করলেন এভাবে-

عن علي رضي الله عنه قال : لماكان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ملأالله بيوتهم وقبورهم نارا شغلوناعن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس"

- الصحيح البخارى: ٤١٠/١ باب الدعاءعلى المشركين بالهزيمة والزلزلة.رقم الحديث:٢٩٣١ - سنن إبن ماجة. ٥١ باب المحافظة على صلاة العصر.

'হে আল্লাহ! কাফেরদের কবর ও ঘরকে আগুন দ্বারা ভরে দাও। তারা আমাদেরকে আসরের নামাজ থেকে বিরত রেখেছে।'

তিন.

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে হযরত মুনযির ইবনে আমর রা. কে সত্তরজন সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে 'রা'আল ও যাকওয়ান' এর দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে কাফেররা ঐ সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। যাঁরা ছিলেন আসহাবে সুফফা এবং কুরআনের হাফেজ। শুধু একজন সাহাবী হযরত ওমার ইবনে আমীর রা. বেঁচে গিয়েছিলেন। নবীজী ঐ কাফেরদের উপর যার পর নাই অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে এক মাস ফজরের নামাজে তাদের উপর কুনুতে নাযেলা পড়ে বদ দোয়া করেছেন।

চার.

নবম হিজরীর পহেলো সফর নবীজী ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আউ'সাজাহ রা. কে কতিপয় সাহাবীসহ বনু হারিসার প্রতি প্রেরণ করলেন। কিন্তু বনু হারিসা ইসলাম কবুল করল না। নবীজী তাদের উপর বদ দোয়া করলেন, তাদের বুদ্ধি যেন অকার্যকর হয়ে যায়। আজও পর্যন্ত তাদের মাঝে এমন রোগ-ব্যধি ছড়িয়ে আছে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা সীরাতের কিতাবসমূহে বিদ্যমান।

কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নিজেরাও কাফেরদের উপর বদ দোয়া করেছেন। এমনকি যে সকল মুসলমান তাঁদেরকে কষ্ট দিয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছেন আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের দোয়া কবুলও করেছেন।

ধৈর্য দয়ার প্রতীক নবী নেই কোন সংশয়

নিজের কষ্টে ওঠেনি কভু বদ দোয়ার হস্তদ্বয়।

বীর-বাহাদুর ছিলেন তিনি কাফেরের মোকাবেলায়

প্রত্যয়ে কভু ভাটা পড়েনি বিপদ-বিভিষিকায়।

অভিশাপ কভু দিয়েছেন তিনি ফিৎনাবাজদের তরে

কেঁদেছেন তবে প্রভুর দুয়ারে বিজয় যাচনা করে।

হযরত উসমান রা. এর বদ দোয়া মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর এর ক্ষেত্রে এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. এর বদ দোয়া সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে যে কুফায় গভর্ণর থাকাকালে তাঁর উপর অভিযোগ উত্থাপন করেছিল। এগুলি দীর্ঘ আলোচনার চাহিদা রাখে, সংক্ষেপণের উদ্দেশ্যে তা উল্লেখ করলাম না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সঠিক বুঝ ও পরিপূর্ণ দ্বীন বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সংশয় -৩২

অনেক লোক আছেন যারা দ্বীনের বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু কাপুরুষতা, ভগ্ন মনোবল, হিম্মতের অভাব এবং মৃত্যুর ভয়ে তারা জিহাদে যান না। আবার জিহাদে না যাওয়ার স্বপক্ষে নানা রকম টালবাহানা দাঁড় করিয়ে বলে, ভাইজান! বর্তমান সমায়ের যুদ্ধ জিহাদগুলো সাহবায়ে কেরামের জিহাদের মত নয়। এজন্যই আমরা জিহাদের অংশগ্রহণ করি না।

সমাধান -

এই স্বল্পবুদ্ধি ও বিকৃত দেমাগের অধিকারী ব্যক্তিদের কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, আমাদের অন্যান্য সকল আমলের অবস্থা কি সাহাবায়ে কেরামের মত? আমাদের নামাজ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্ব, আমাদের যাকাত, আমাদের সদ্কা ও অন্যান্য সকল আমল কি সাহাবায়ে কেরামের আমলের মত? আমাদের আমল যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের আমলের মত নয় তাই বলে কি শরীয়তের সব আমল ছেড়ে দিব? আমাদের বিবাহ কি সাহাবীদের বিবাহের মত হয়ে থাকে? তাই বলে কি ইন্ডিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর মত চিরকুমার হয়ে জীবন কাটিয়ে দেব? আমাদের জানাযা কি সাহাবায় কেরামের জানাযার মত হয়? তবে কি মুর্দারদেরকে জানাযা ব্যাতীত দাফন করে দেব? আমাদের খাওয়া-দাওয়া

সাহাবাদের খাওয়া-দাওয়ার মত নয়। এজন্য কি পেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে? আমাদের পোষাক-পরিচ্ছেদ সাহাবাদের মত নয় এর অর্থ এই নয় যে, এগুলি পরিধান করা যাবে না। মোট কথা আমাদের জীবনে এমন কোন আমল আছে যা সাহাবায়ে কেরামের আমলের মত? তাহলে কি সব আমল ছেড়ে দিয়ে হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবো?

তাহলে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও ছেড়ে দিন। কারণ, আমাদের এই দাওয়াত ও তাবলীগ সাহাবাদের দাওয়াত ও তাবলীগের মত নয়! প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কাফেরদেরকে দাওয়াত দিতেন ঈমান আনার জন্য। আর আমরা মুসলমানদেরকে দাওয়াত দিই আমল ঠিক করার জন্য। উপরন্তু তাঁদের মত ইখলাসও আমাদের মধ্যে নেই। তালীম-তাদরীস বন্ধ করে দাও। দ্বীনি মাদ্‌রাসাগুলো বন্ধ করে দাও। দ্বীন শেখার বিষয়টিকে অস্বীকার কর। কারণ, আমাদের মাদ্‌রাসাগুলো সুফ্‌ফার মাদ্‌রাসার মত নয়। মসজিদসমূহকে ভেঙ্গে ফেল। কারণ, এ মসজিদগুলো সাহাবায়ে কেরামের মত ইখলাসের সাথে নির্মাণ করা হয়নি। বরং ঈমানকেই অস্বীকার কর। কেননা আমাদের ঈমানে যতই শক্তি সঞ্চারিত হোক না কেন তা কখনো সাহাবাদের ঈমানের মত হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ! এই একটি মাত্র বাক্য দ্বীনের সব ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। দ্বীনের সবকাজ করা জরুরী। কিন্তু আমাদের কোন কাজই সাহাবায়ে কেরামের মত নয়। তারপর সবকাজ করে যাচ্ছি। তাহলে শুধু জিহাদের সাথে এত বৈপরীত্ব মনোভাব কেন?

আছে কি সেই পূর্বসূরীদের জিক্‌র ও তেলাওয়াত
আছে কি সেই সাহাবীদের আত্মনিমগ্ন সালাত?
তবু কেন এই বাহানা চলে শুধু জিহাদের পথে
ত্যাগের সাথে মিল নেই কেন পূর্বসূরীদের সাথে?

প্রকৃত কারণ সুস্পষ্ট। এদের অন্তরে নেফাক্ব রয়েছে। জিহাদ করে না এজন্য যে, মৃত্যুকে ভয় করে। তাই আমার বন্ধুগণের প্রতি আমার মাশওয়ারা হলো, দয়া করে আপনি একটু ময়দানে শরীক হোন, যদিও মন না চায় । ইনশাআল্লাহ ঈমানও তৈরী হবে আমলও সহীহ্ হবে, এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহে মৃত্যুর মুহাব্বতও সৃষ্টি হবে। এক-আধ ফোঁটা রক্ত বের হওয়ার দ্বারা মস্তিষ্কও ঠিক হয়ে যাবে।

শরীয়তের বিধানসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। কাম ও কাইফ। কাম অর্থ সংখ্যা বা পরিমাণ। যেমনঃ দিনে রাতে কয় ওয়াক্ত নামায ফরয? প্রত্যেকটি কয় রাকাত

বিশিষ্ট? নামাযের ফরয কয়টি? ওয়াজিব কয়টি এবং সুন্নত-মুস্তাহাব কয়টি? এরকমভাবে ওজুর ফরয এবং সুন্নত-মুস্তাহাব কয়টি? এমনিভাবে রোজা, হজ্জ ও যাকাতের ফরয কয়টি? এখানে 'কাম' দ্বারা এগুলোই উদ্দেশ্য যে, শরীয়ত কর্তৃক যে আমলের পরিমাণ যতটুকু নির্ধারিত আছে ততটুকুই আমল করতে হবে। এতে কমবেশী করা যাবে না। আর 'কাইফ' মানে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত। প্রতিটি আমলে এই ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যতের স্থান সর্বোচ্চ মর্যাদায়। তাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

حديث جبريل:....."أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنَّكَ إِنْ لا تَكُنْ تَرَاهُ ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،"

- صحيح البخارى: ١٢/١ باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة . رقم الحديث:٥٠ - صحيح مسلم: ٢٧/١باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى - مسند أحمد : ٣١٧/١ رقم الحديث:٣٦٧

আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদত এভাবে কর যে, তুমি তাঁকে দেখছো। কিন্তু এই স্তরে যদি পৌঁছতে না পার কমপক্ষে এতটুকু ধ্যান কর যে, তিনি আমাকে দেখছেন।

এই গুণগত মান খুব সহজে হাসিল হয় না। এর জন্য পরিপূর্ণ ওলীর সাহচর্য এবং সুদীর্ঘ মোজাহাদার প্রয়োজন। নামাজের সময় অন্তরে আল্লাহর স্মরণ নিয়ে নামাজ পড়া শর্ত। এই স্তর নবীজীর সাহচর্যে সাহাবায়ে কেরাম যেমন পেয়েছিলেন; পরবর্তী লোকেরা সেটা কোথায় পাবে? এজন্য নবীজী ﷺ ইরশাদ করেন- আমার সাহাবীরা যদি এক মুঠো যব দান করে আর পরবর্তী ওয়ালারা উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা দান করে তবুও তাঁদের সমান হতে পারবে না। এটা কোন্ কারণে? একমাত্র ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যতের গুণে। সুতরায় আমলের ক্ষেত্রে আমরা 'কাম' পরিমাণের মুকাল্লাফ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আমলের পরিমান যতটুকু প্রমাণিত আছে ততটুকু আমল করতে হবে। এতে কমবেশী করা যাবে না। কিন্তু তাঁদের মতো ইখলাস, লিল্লাহিয়্যত গুণগত মানে উন্নিত হওয়ার মুকাল্লাফ নই। আর সে স্তর অর্জন করা সম্ভবও নয়। সুতরাং অন্যান্য সকল ইবাদাতের ন্যায় জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর অবস্থাও অভিন্ন।

আমরা এ বিষয়ে আদিষ্ট যে, জিহাদের শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কাফেরদের মস্তক উড়িয়ে দিব। কোন মুসলমানের উপর হাত উঠাবো না। কিন্তু এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম যেমন ইখলাসের সাথে কাজ করেছেন সে স্তরের ইখলাস অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় । যখন সম্ভবই নয় তখন তারপ্রতি আদিষ্টও নই। সুতরাং এ বিষয়ে আপত্তি তোলা অনর্থক ও বেহুদা কাজ। এটাই হলো নবীজীর হাদীসের রহস্য। তিনি ইরশাদ করেন, 'হে আমার সাহাবাগণ! তোমরা যদি দ্বীনের একশ ভাগের দশভাগ কাজ ছেড়ে দাও আর পরবর্তী আগতরা যদি নব্বই শতাংশ ছেড়ে দিয়ে দশভাগের উপর আমল করে তবুও তারা সফল হবে। কেননা তোমরা আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে ঈমান এনেছ। আর তারা আমাকে না দেখে ঈমান এনেছে।' [ইহয়াউ উলুমিদ্দিন]

সংশয় -৩৩

কেউ কেউ বলেন- কাফেরদেরকে খারাপ বলা যাবে না, তাদেরকে পশুর নামে ডাকা যাবে না। কুকুর, শুকর ইত্যাদি বলা যাবে না। কেননা কাফের হলেও তারা মানুষতো। মানুষকে মানুষ হিসাবে মূল্যায়ন না করে অপদস্ত করা ঠিক নয়। কাফেরদেরকে কাফের বলা যাবে না এবং গাল-মন্দও করা যাবে না। কেননা কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ"

[হে মুসলিমগণ!] 'যারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে [ভ্রান্ত মাবুদদেরকে] ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না। তাহলে তারাও শত্রুতাবশত সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালমন্দ করবে।' [সূরায়ে আনআম:১০৮]
সুতরাং তাদের সাথে নরম ভাষায় এবং উত্তম চরিত্রের সাথে কথা-বার্তা বলা উচিত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা আ. কে ফেরআউনের কাছে পাঠানোর সময় আদেশ করলেন-

"فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً"

'তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে।' [সূরা ত্বহা-৪৪]

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো, বর্তমান সময়ের মুজাহিদরা এসব বিষয়ের বিপরীত আমল করেন কেন?

সমাধান -১

আসুন! আমরা সর্বপ্রথম কুরআনে কারীমের হিকমতপূর্ণ কিছু আয়াতের প্রতি একটু চিন্তা করি যে, পবিত্র কুরআনে কাফের ও মুশরিকদেরকে কোন শব্দে স্মরণ করেছে। তাহলে বিষয়টি বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হবে।

এক.

আল্লাহ তা'য়ালা কাফের, মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

"صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ"

'এরা বধির, বোবা, অন্ধ।' [সূরা বাক্বারা-১৮]

তাহলে কি এ সকল কাফেদের বাকশক্তি, কান ও চক্ষু সচল ছিল না? না, না। সচল অবশ্যই ছিল। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হলো তাদের চোখ, কান ও জিহ্বা ঠিকাই ছিল; কিন্তু তারা এগুলোকে শুধু এই ধ্বংসশীল দুনিয়ার জীবন-যাপনের জন্য ব্যবহার করতো। আখেরাতের কাজে ব্যবহার করতো না। এজন্য তারা বধির, অন্ধও বোবার সমতুল্য। তাদের এই চোখ, কান ও জিহ্বা থাকা সাত্ত্বেও যেন তাদের কোন উপকারে আসেনি?

দুই.

আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই তাদের উপমা দিয়েছেন-

"فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ"

'তার উদাহরণ হলো কুকুরের মত।' [সূরা-আরাফ- ৭৬]

এ আয়াতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বালআম ইবনে বাউরা ছিল ইসরাঈলী আবেদ। সে এক মহিলোার চক্রে গোমরাহ হয়ে যায়। হযরত মূসা আ. এর প্রতিপক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তা'য়ালা তার করুণ পরিণতি সম্পর্কে বলেন- 'তার অবস্থা কুকুরের মত।'

তিন.

আল্লাহ তা'য়ালা এদেরকে মৃত বলে উপামা দিয়েছেন-

"إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ"

'আপনি মৃত ও বধির ব্যক্তিকে আপনার আহ্বান শোনাতে পারবেন না।'

[সূরা-নামল- ৮০]

এই আয়াতে কারীমায় জীবিত কাফেরদেরকে মৃত বলার উদ্দেশ্য হলো মৃত ব্যক্তি যেমন কথা শোনার পরেও কোন ফায়েদা হাছিল করতে পারে না অনুরূপভাবে কাফেরদের অবস্থাও এমনই।

চার.
কুআন তাদেরকে গাধা-গর্দভ নামে অভিহিত করেছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে-
"مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً"

'যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল তারা সে দায়িত্বভার বহন করেনি। তাদের দৃষ্টান্ত হলো পুস্তক বহণকারী গাধা-গর্দভের মত।'
[সূরা জুমু'আ-৫]

পাঁচ.
"كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ"
'মুশরিকরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ থেকে পলায়ন করে।'
[মুদ্দাসসির:৫০]

ছয়, উপরন্তু আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে কারীমে কাফের ও মুশরিকদের ব্যাপারে একটি মূলনীতি বলে দিয়েছেন-

"أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ"

ঐ সকল কাফেররা জানোয়ার ও পশুর মত বরং তারচে আরো নিকৃষ্ট।'
[সূরায়ে আ'রাফ:১৭৯]

[পশুদের মধ্যে কুকুর, শুকর, শিয়ালও রয়েছে।] এখন একটু চিন্তা করুন, কুরআনে কারীম কাফেরদের ব্যাপারে কিরূপ শব্দ ও উপাধি ব্যবহার করেছে। সুতরাং কোন নির্বোধ কাফেরকে গাধা বলা, চালাক-চতুর কাফেরকে শিয়াল বলা অথবা চরিত্রহীন কাফেরকে শুকর বলার দ্বারা কোন ধরণের কাফেরদের লাঞ্চনা করা হয়েছে? ভালো মানুষের লাঞ্চনা করা হয়েছে নাকি খারাপ মানুষের? মানুষের সম্মান তো তখনই থাকে যখন সে মানুষ থাকে, অন্যথায় সে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। মানুষ মানুষ হয় ঈমানের বদৌলতে। যদি ঈমান না থাকে এমন মানুষের চেয়ে পশু শতগুণ উত্তম।

পরিস্কার ভাবে দেখে নাও তুমি নেফাক্বের কীটগুলো

যাদের কাছে লাগে ভালো না কাফেরের লাঞ্চনাময় দিনগুলো ।

পশুনামে অভিধায় করছেন যাদের প্রভূ

সেই পাপীদের তোষামোদ সুখকর নয় যে কভূ।

সমাধান-২

মুল্লা জিউন রহ. তাফসীরাতে আহমাদিয়াতে লিখেছেন-

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ [سورة الأنعام-١٠٨]

এই আয়াত সূরা হজ্জ এর ৭৩ নং আয়াত "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ" 'উপাসক এবং উপাস্য তারা উভয়ে দুর্বল' এর দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে এই আয়াতের কেনো কার্যকারীতা নেই। এবং "إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ" এই আয়াত দিয়েও রহিত হয়ে গেছে। [সূরা হজ্জ-৯৮] 'নিশ্চই তোমরা [মুশরিক] এবং তোমরা যেসব দেবতার পূঁজা কর সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন।' সুতরাং মানসূখ-রহিত আয়াত দিয়ে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই।

সমাধান-৩

এবার আসুন! আমরা হাদীস শরীফের প্রতি একটু নজর দেই। কাফেরদের সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন-

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاهدواالمشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"

- سنن أبي داؤود : ٣٣٩/١ باب كراهية ترك الغزو. رقم الحديث:٢٥٠٤ - سنن النسائى : ٤٣/٢ بَا بوُجُوبِ الْجِهَادِ

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'তোমরা মুশরিকদের সাথে তোমাদের সম্পদ, জান-মাল ও জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর।' জিহাদ বিল লিসান এর পদ্ধতিগুলো "লামাআত" এর গ্রন্থাকার এভাবে উল্লেখ করেছেন-

"بأن تخوفوهم وتوعدوهم بالقتل والأخذ والنهب ونحو بذالك."

তোমরা তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখাও এবং এই বলে হুংকার ছাড় যে, তোমাদেরকে হত্যা করা হবে, বন্ধি করা হবে, সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হবে।

"وبأن تذموهم وتسبوهم إذا لم يؤد ذالك إلى سب الله سبحانه."

তাদের নিন্দা কর, গালি দাও ততক্ষণ পর্যন্ত যাতে তারা আল্লাহ তা'য়ালাকে গালি দেয়ার সুযোগ না পায়।

"وبأن تدعوا عليهم بالخذلان والهزيمة وللمسلمين بالنصر والغنيمة."

তাদের লাঞ্ছনা ও পরাজয়ের জন্য বদ দোয়া করবে আর মুসলমানদের জন্য বিজয় ও গণীমত লাভের দোয়া করবে।

"وبأن تحرضوا الناس على الغزو ونحو ذالك" (لمعات شرح مشكاة)

মানুষকে যুদ্ধ জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

[লামআত, শরহে মেশকাত]

এখন একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করুন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী কাফেরদের তিরস্কার করা, খোঁচা মেরে কথা বলা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যবান থেকে চালু হয়েছে। অথচ আমাদের কিছু অজ্ঞ দোস্তের খামখা মাথা ব্যথা যে, মুজাহিদীনে কেরাম কেন কাফেরদেরকে মনস্তাত্বিক ভাবে খোঁচা মেরে কথা বলে?

সমাধান-৪

এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল ও নীতিগুলো একটু পর্যালোচনা করি।

এক. হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রূপে আগত উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফীর সাথে কথোপকথনের এর পর্যায়ে যখন পরিবেশ একটু গরম হয়ে ওঠে তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর রা. তাকে এমন এক গালি শুনিয়ে দেন যার ফলে তার চৌদ্দগুষ্টি পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আবু বকর রা. আত্যান্ত চাপ কণ্ঠে বললেন-

أمصص بذر اللآت - الصواعق المحرقة في الرد على البدع والذندقة ، إبن حجر مكى ،

'যা, চুপ কর! তোর দেবতা লাতের লজ্জাস্থান চাট গিয়ে।'

এর পরেও কি কোন বুযুর্গ এ কথা বলবেন যে, হযরত আবু বকর রা. গালি দেননি। বরং কিছুটা শক্ত কথা বলেছিলেন। এজন্য হযরত ইদ্‌রীস কান্ধলভী রহ. এর বর্ণনা নকল করছি। উরওয়া বলল, হে মুহাম্মদ! [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তুমি কি শুনেছ যে, কোন কওম তার স্বীয় কওমকে ধ্বংস করেছে? যদি দ্বিতীয় কোন পরিস্থিতি এসে যায় অর্থাৎ কুরাইশ বিজয় লাভ করে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কওম থেকে যে সকল লোক তোমার সাথে একত্র হয়েছে তারা তোমাকে ছেড়ে পালাবে।

হযরত আবু বকর রা. নবীজীর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উরওয়াকে গালি দিয়ে বললেন- কী! আমরা নবীজীকে ছেড়ে পালাব? উরওয়া বলল সে কে? সাহাবীরা বললেন, আবু বকর রা.। উরওয়া বলল- খোদার কসম! আমার উপর যদি তার অনুগ্রহ না থাকত যার বদলা আমি এখনও দিতে পারিনি তবে অবশ্যই তার জবাব দিতাম।

সম্মানিত পাঠক! নবীজীর উপস্থিতিতে আবু বকর রা. কর্তৃক কাফেরকে গালি দেওয়া এবং নবীজী তাঁকে বাধা প্রদান না করাই তো এটা জায়েয হওয়ার সবচে বড় প্রমাণ।

দুই. রোমানরা যখন দেখল হযরত আলী ও মুআবিয়া রা. এর মাঝে তুমুলভাবে যুদ্ধ-সংঘর্ষ চলছে তখন তারা নিজ স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে হযরত মুআবিয়া রা. এর সাথে হাত মিলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চিঠি পাঠালো- "আমরা শোনেছি, আপনি সত্যের উপর আছেন তারপরও আলী রা. আপনাদেরকে পেরেশান করে রেখেছে এবং আপনাদের উপর বাড়াবাড়ি করছে। আমরা আলীর মোকাবেলায় আপনার সাহায্য করতে প্রস্তুত। আপনাদের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। [ইতিবাচক উত্তর হলে] তৎক্ষনাৎ সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেব। হযরত মুআবিয়া রা. রোম সম্রাটের উত্তরে চিঠি লিখলেন-

والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يا لعين لأصلحن أنا وابن عمى عليك ولأخرجنك من جميع بلادك ، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت ،

'আল্লাহর কসম! তুই যদি ক্ষান্ত না হস্ এবং নিজের দেশে ফিরে না যাস্, তবে- হে অভিশপ্ত মালাউন! আমি ও আমার ভাই আলী সন্ধি করে তোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাব এবং তোকে তোর দেশ থেকে বের করে দেব এবং প্রশস্ত পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে দেব।' উপরোক্ত ইবারতে রেখাযুক্ত শব্দ "يا لعين" অর্থাৎ হে অভিশপ্ত শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন। এটা কত শক্ত কথা। অন্য বর্ণনায়

এসেছে- হে রোমীয় কুত্তা! আমাদের ইখতিলাফ ও দন্দ্ব দেখে ধোকা খেওনা। তুই যদি মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করিস তবে আলী রা. এর পক্ষে সর্বপ্রথম যে সেনা তোর মোকাবেলা করবে সে হবে মুআবিয়া। এই কথাগুলো নিয়ে বারবার চিন্তা করলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে ইনশাআল্লাহ!

সমাধান-৫

এ বিষয়ে কুরআনে কারীমের আয়াতদ্বয়ের আলোচনা রয়ে গেছে। তা বলার আগে একটি মূলনীতি মনে রাখা প্রয়োজন। কুরআনে কারীম নবীজীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং সাহাবীদের উপস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। আবার সাহাবীগণ নবীজীর থেকে সরাসরি কুরআন শুনেছেন, শিখেছেন এবং বুঝেছেন। সুতরাং কুরআনে কারীমের ইলমী তাফসীর ও আমলী প্রতিচ্ছবি একমাত্র সাহাবায়ে কেরাম। যারা উম্মতে মুসলিমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সত্যের মাপকাঠি'। যার অর্থ হলো, তাঁদের প্রত্যেকটি কথা কাজ-কর্ম আমাদের জন্য দলীল। সুতরাং আমরা যদি কুরআনে কারীমকে তাঁদের আমলী যিন্দেগী, ইলমী তাফসীর ও ব্যাখ্যা থেকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কুরআন বুঝে আসবে। অন্যথায় বুঝে আসবে না। আরও স্পষ্ট করে আত্মা তৃপ্তি ও প্রশান্তির জন্য উক্ত আয়াতসমূহের সঠিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করছি।

সমাধান-৬

কুরআনে কারীমের আয়াত "فقولا له قولا لينا"অথাৎ তোমরা উভয়ে তার [ফিরআউনের] সাথে নরম ভাষায় কথাবার্তা বল- একথা আপন জায়গায় ঠিক আছে। আমরাও একথা মানি। কিন্তু এটা দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পৃক্ত। হযরত শাইখুল ইসলাম শাব্বীর আহমাদ উসামানী রহ. এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে লেখেন- 'দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহতের সময় নরম, কোমল ও সহজ ভাষায় কথা বল। কেননা অবাধ্যতা ও সীমালংঘণ দেখলে সহজে দাওয়াত কবুল করবে বলে আশা করা যায় না। এজন্য আমরা এদিকে লক্ষ্য রাখবো তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে নসীহত কবুল করতে পারে। অথবা আল্লাহ তা'য়ালার বড়ত্ব ও অসীম ক্ষমতার কথা শোনে ভয় পেয়ে আনুগত্যের প্রতি অনুরক্ত হতে পারে।' 'নরম ভাষায় কথা বল' দাঈ-মুবাল্লিগদের জন্য অনেক বড় নীতি এবং কার্যকর আমল বলে মনে হয়। কেননা অন্যত্রে ইরশাদ হয়েছে-

"ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"

'আপনি আপনার রব্বের পথে ডাকুন হিকমত ও ভাল নসীহতের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।' [সূরা নাহলো -১২৫]

এই আয়াতের সম্পর্ক দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে আর আমাদের কথা হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত। উভয়ের কথাবার্তার ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাকে একথা বুঝানো হয় যে, আমি তোমার কল্যাণকামী এবং তোমার প্রতি আমার মুহাব্বত রয়েছে। কিন্তু মুহাব্বতের বহির্প্রকাশ শক্ত ভাষায় সম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াজ ও নসীহতের পদ্ধতি বলতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

এক.

"ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"

'আপনি হিকমত ও সুন্দর নসীহতের মাধ্যমে [মানুষকে] আপনার রবের পথে ডাকুন।'

দুই . قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

'আপনি বলুন, এটা আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার সাথে। [সূরা ইউসুফ-১০৮]

তিন. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'মন্দের প্রতিহত কর মাধূর্য আচরণে।' [সূরা হামীম-সিজদা-৩৪]

পক্ষান্তরে যুদ্ধের ভাষা কঠিন হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ করেন-

এক. وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ 'তাদের উপর কঠোরতা কর।' [সূরা তাওবা-৭৩]

দুই. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

'তোমরা কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর এবং তাদের আঙ্গুলগুলো কেটে দাও।' [সূরা আনফাল-১২]

তিন. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

[হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 'যুদ্ধকালে যদি তোমরা কাফেরদের নাগালে পাও তবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও, তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও ছিন্ন ভিন্ন করে দাও যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে।' [সূরা আনফাল-৫৭]

উদাহরণ স্বরূপ মাত্র দু-চারটা আয়াত এখানে উল্লেখ করেছি। যাতে আলোচনা দীর্ঘ না হয়। এবিষয়ে আরো অনেক আয়াত এবং হাদীস রয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর এবং হাদীসের ব্যাখ্যা পড়ুন। তাহলে এ ধরনের ভুল বোঝার সৃষ্টি হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সমাধান-৭

"وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"

'তোমরা মুশরিকদেরকে গালি দিওনা নতুবা মূর্খতা বশত তারা আল্লাহ তা'য়ালাকে গালি দিবে।' [সূরায়ে আনআম:১০৮]

এই আয়াতের উত্তরে একটি কথা স্মৃতি পটে ধারণ করুন যে, আয়াতের মধ্যে নিঃশর্তভাবে কাফের ও মুশরিকদেরকে ঘৃণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং এই আয়াতে এ বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা ওদের দেবতাদেরকে খারাপ বল না। এর দলীল আয়াতের শেষাংশেই বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা তোমাদের রবের প্রতি গালি দেবে। আর তা মা'বুদের মোকাবেলায় মা'বুদের অলোচনা আনা হয়েছে। যদি কাফেরদেরকে গালি দেয়া থেকে নিষেধ করা হত তাহলে এভাবে বলতেন, তোমরা কাফের ও মুশরিকদেরকে গালি দিওনা। অন্যথায় তারা তোমাদেরকে গালি দিবে। হাদীস শরীফে রয়েছে, তোমারা পিতা-মাতাকে গালি দিওয়া। তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে কিভাবে গালী দিতে পারে? নবীজী ইরশাদ করলেন- যখন তোমরা কারো পিতা-মাতাকে গালি দিবে তখন তারাও তোমাদের মাতা-পিতাকে গালি দিবে। এটা কেমন যেন নিজেই নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার নামান্তর।

আয়াতের জবাব

দ্বিতীয় কথা হলো, আয়াতে কারীমায় দেবতাদেরকে গালি না দেয়ার কারণ এটা বলা হয়েছে যে, [তোমরা যদি তাদের দেবতাকে গালি দাও তাহলে] তারাও তোমাদের সত্য রবকে গালী দিবে। কিন্তু আজকের দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাফের-মুশরিক আজ শুধু আল্লাহ তা'য়ালা ও নবীদেরকে গালী দিয়েই ক্ষান্ত হয় না,

[নাউযুবিল্লাহ!] আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিকৃতি [ওদের ধারণা অনুযায়ী] সাদা দাঁড়ি বিশিষ্ট মানুষের আকৃতির তৈরী করে খালি ময়দানে নিয়ে সেটাকে টার্গেট করে ফায়ার করে এবং মুসলমানদের রবের জানাযায় বের হওয়ার আহবান করে। যেমন কমিউনিষ্টরা রাশিয়াতে করেছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্র করেছে। বিশেষ করে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হযরত ওমর এবং হযরত মুআবিয়া রা. এর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. এর নামে কার্টুন বানিয়ে কুকুরের গলায় ঝুলানো হয়।

তারা পুরুষ ও নারী সাহাবায়ে কেরামদেরকে এত খারাপ ও নষ্ট গালি দিয়ে যাচ্ছে এগুলো ভাষায় লিখা সম্ভব নয়। আমরা নিরব থাকা সত্ত্বেও কাফের-মুশরিকরা যেভাবে গালমন্দ করেছে, আমরা কি তাদের দৃষ্টান্তমূলক উত্তর দিতে পারিনা? এঅবস্থায় যদি আমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, 'কাফেরদের কটাক্ষ্য করে কিছু বলোনা।' এটা হবে চরম হাস্যকর বিষয়!

এখন যেমন মুজাহিদ ভাইয়েরা কাফেরদেরকে এবং তাদের নেতাদেরকে গালি দিয়ে জিহাদ বিল লিসান করত: নিজেদের ধর্মীয় প্রতিশোধ নিচ্ছে; এটা তাদের অধিকার। কেননা কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি কেউ কদর্যপূর্ণ কথা বলে তার বিপরীতে সে যদি কদর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে প্রতিশোধ নিতে পারে তাহলে ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপর আরোপিত বিদ্বেষের জবাব কেন দেয়া যাবে না? বরং আমাদের অধিকার হলো কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল গালমন্দের জবাব যেযাবৎ দিতে না পারব। আমাদের জিম্মায় তা ঋণ হিসাবে থেকে যাবে। এদায়িত্ব আদায় করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে নিজেদের যাবতীয় কর্তব্য পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংশয় -৩৪

কিছু কিছু দ্বীনি হালকা এবং দ্বীনপ্রিয় ব্যক্তিদের মাঝে একটি কথা খুব জোর দিয়ে বলা হয় যে, বড় বড় আলেম-উলামা এবং মেধাবী ছাত্ররা জিহাদে শরীক হওয়া ঠিক নয়। কারণ, বড় বড় আলেম-উলামা ও মেধাবী ছাত্ররা যদি ময়দানে যাওয়া শুরু করে এবং তারা শহীদ হতে থাকে তাহলে দ্বীনের অন্যান্য কাজ কে করবে?

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এগুলোর যথার্থ মুকাবিলা করার জন্য ইলমী তাহকীক ও গভীরজ্ঞান থাকা বাঞ্চণীয়। এলক্ষ্যে উলামায়ে কেরামের উচিত জিহাদের ময়দানে না গিয়ে ইলমী ময়দানের ফিৎনাসমূহের মুকাবিলা করা এবং উম্মতের পথ প্রদর্শন করা।

বাস্তব ঘটনা

আমি নিজেই এ ঘটনার শিকার হয়েছি। ছাত্র যমানায় যখন আমি আফগানিস্তানে জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা করি তখন পাকিস্তানের একজন বিজ্ঞ বড় আলেম এবং বড় পীর সাহেবের খানকায় গিয়ে পরামর্শ করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমার জন্য আফগানিস্তানে যাওয়া হারাম।' কারণ, এখানে যে সব ফিৎনা রয়েছে তা মুকাবিলা করার জন্য ইলমী ব্যক্তিদের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেই ফিৎনার মুকাবিলা করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ইলমী যোগ্যতা ও পান্ডিত্ব দান করেছেন। আমি বললাম, জিহাদের ময়দানে কি ইলমী ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন নেই? বড় কোন আলেমের প্রয়োজন নেই? তাহলে কি জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ ফরয ও শরীয়তের হুকুম নয়? ওখানে তো প্রত্যেকটি পদক্ষেপে বড় বড় আলেম-উলামাদের প্রয়োজন। যদি জিহাদের ময়দানে বড় বড় আলেম-উলামা না থাকে তবে জিহাদ তো ফিৎনার রূপ ধারণ করবে। শরীয়তের এত গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধানটি ভুল পথে পরিচালিত হবে। যার ক্ষতিপূরণ ও সম্ভব নয়। তখন তিনি উত্তর দিলেন হাদীস শরীফে এসেছে-

"قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن المستشار مؤتمن."

- سنن الترمذى: ١٠٩/٢ باب إن المستشار مؤتمن. رقم الحديث:٢٨٢٨

'পরামর্শদাতা আমানতদার।' সুতরাং আমানতদারীর সাথে আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে সেটাই আমি তোমাকে পরামর্শ দিয়েছি।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তা'য়ালার দয়া ও অনুগ্রহে উক্ত ইলমী ও রূহাণী মারকায জিহাদের বাস্তবতা অনুভব করে তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তখন তাদের মানসিকতায় একবিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে। দেখুন! আমি তখন 'জামিয়া উলূমে শরইয়্যাহ সাহওয়াল' মাদ্‌রাসায় মিশকাত শরীফ পড়ি। তাঁরা আমার

সাথে করাচী থেকে টেলিফোনে যোগাযোগ করে আদেশ করলেন, তুমি জুনদুল্লাহ [কমান্ডো ট্রেনিংয়ের] জন্য আফগানিস্তানে চলে যাও। তখন আমি একটু রসিকতার ছলে বললাম, আমি তো হাদীস শরীফ পড়ছি? নেসাব এখনো শেষ হয়নি কি করে যাই? তখন বললেন, আগে যুদ্ধে যাও, পরবর্তীতে আবার পড়াশোনা করতে পারবে। সুবহানাল্লাহ!

সমাধান-

দ্বীনের মূল ভিত্তি নবী ও নবূয়াত, রসূল ও রিসালাত। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম আম্বিয়া আ. এ আমল দেখা জরুরী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ"

'যারা আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে নিশ্চই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'[সূরায়ে মুমতাহানাহ:৬]

নবীদের সীরাত

নবীদের আমল তো এটাই যে, তাঁরা জিহাদের ময়দানে উপস্থিত থাকতেন। দেখুন, হযরত হিযক্বীল আলাইহিস সালাম হযরত শামবীল আলাইহিস সালাম হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুণ আলাইহিস সালাম এবং খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নীতি-আদর্শ হলো জিহাদের ময়দানে স্বশরীরে শরীক হয়ে লড়াই করা।[৫]

কোন নবীরতো এ ধারনা হয়নি যে, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তবে দ্বীনের কি অবস্থা হবে? দ্বীনের কাজ কে করবে? বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো যে কোন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরামের সামনে থাকতেন। হযরত আলী রা. বলেন, যখন ভয়াবহ যুদ্ধ হত তখন আমরা নবীজীর আড়ালে আশ্রয় নিতাম। আল্লাহু আকবার! এটাই ছিলো নবীদের নীতি ও আদর্শ। তাহলে আপনারাই চিন্তা করুন, আমরা যারা নবীদের ওয়ারীস আমাদের নীতি ও আদর্শ কেমন হওয়া দরকার?

---

[৫]আর নবীদের চেয়ে ইলমী ব্যক্তিত্ব ও মেধাবী পুরুষ দুনিয়াতে আর কেউ নেই। (অনুবাদক)

সাহাবীদের আমল

এরপর সাহাবায়ে কেরামের আমল দেখুন, কোন সাধারণ সাহাবীও জিহাদের ময়দান থেকে অনুপস্থিত থাকতেন না। [সাধারণ বলা যায় তাঁদের পরস্পরের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে। নতুবা আমাদের নিকটে তাঁরা সকলেই অতিসুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।] বরং তাঁরা মনে করতেন, জিহাদে শরীক না হওয়া মুনাফিকদের কাজ। বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রা. যারা দ্বীনের ভিত্তি স্বরুপ আমরা তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখব-

নবীজীর শশুর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
নবীজীর শশুর দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
নবীজীর জামাতা তৃতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
নবীজীর জামাতা চতুর্থ খলীফা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
আমীনুল উম্মাহ হযরত আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত মুফাস্সির
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত মুহাদ্দিস
হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত মুজতাহিদ
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত ফক্বীহ
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত ক্বারী
হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত কাতেবে ওহী
হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মত হাদি ও মাহদী, কাতেবে ওহী

হযরত হুযাইফা ইবনে য়ামান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু [যিনি নবীজীর গোপন কথা সম্পর্কে অবগত ছিলেন] এর মত প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য বড় বড় সাহাবীরাও জিহাদের ময়দানে তলোয়ার চালাতেন। তলোয়ার রক্তে রক্তিম করতেন। কিন্তু কখনো এমন চিন্তা করতেন না যে, আমরা শহীদ হলে গেলে দ্বীনের কি হবে? বরং তাঁরা কাফেরদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতেন। তাঁদের জীবন-ইতিহাসে এমনটাই আমরা দেখতে পাই।

তাবেয়ীনদের আমল

সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত হাসান বসরী রহ. এর মত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ, সুফী যখন কাবুল বিজয়ের অভিযানে যেতে

ডাক্তার তাকে বাধা দিয়ে বলল, আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে। তখনও তিনি জিহাদের আগ্রহে বসে থাকতে পারলেন না। ময়দানে শরীক না হওয়া ব্যতীত তার স্থীরতা অর্জন হলো না। শেষ পর্যন্ত তিনি ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন।

তাবে তাবেয়ীনদের আমল

তাবে তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর মত মুহাদ্দিসের প্রতি লক্ষ্য করুন, যার শাগরিদের সংখ্যা হাজারেরও অধিক। তিনি এক বছর দরস প্রদান করতেন আর এক বছর জিহাদে চলে যেতেন। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে দুশমনের সাথে সম্মুখ যুদ্ধ করে কি সমপরিমাণ অপার্থিব স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করতেন তা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

একবার হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায রহ. মক্কা শরীফ থেকে এক ব্যক্তির মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর প্রতি একটি চিঠি প্রেরণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তখন জিহাদের ময়দানে ছিলেন। চিঠিটির ভাবার্থ কিছুটা এমন- 'আপনার মতো আলেম ও মুহাদ্দিসের শান তো এটাই হওয়া উচিত যে, আপনি দরসের মসনদকে অলংকৃত করে তালিবে ইলমের পিপাসা নিবারণ করবেন এবং উলূমে নবুয়্যতের খেদমত করে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদাতের হক আদায় করবেন।' তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. তাঁর জবাবে লিখেন-

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ... لعلمت أنك فى العبادة تلعب

من كان يخضب خده بدموعه ... فنحورنا بدمائنا تتخضب

أو كان يتعب خيله فى باطل ... فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ... رهج السنابك والغبار الأطيب

ولقد أتانا من مقال نبينا ... قول صحيح صادق لا يكذب

لا يستوى غبار خيل الله فى ... أنف امرىء ودخان نار تلهب

هذا كتاب الله ينطق بيننا ... ليس الشهيد بميت لا يكذب

الوسيط للسيد الطنطاوى وابن كثير

ধ্যানে মগ্ন সাধু সাধক হায়রে মক্কা মদীনায়

দেখলে মোদের বলতে তুমি আছ নিজে খেল-তামাশায়।

তোমরা বক্ষ ভাসিয়েছ নয়নের জল বুনে

আমরা গন্ড রঙ্গিণ করি বুকের তাজা খুনে।

যুদ্ধের মাঠে অশ্ব-ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়ে

তখন তোমার শ্রান্ত ঘোড়া প্রবৃত্তির সাথে লড়ে

মৃগনাভীর গন্ধ যদি তোমার কাছে লাগে প্রিয়

যোদ্ধা ঘোটকের ক্ষুরধূলি ভাই আমারও পছন্দনীয়।

প্রিয় নবীর অমর বাণী আসছে মোদের কানে

সত্য, সঠিক-শুদ্ধ যেটা কে তাহাকে মিথ্যা জানে?

জাহান্নামের ধোঁয়া সেথায় ঢুকবে কেমন করে

জিহাদের ধুলিকণা লেগেছে যার নাসিকা জুড়ে?

কুরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে সব মানবের তরে

শহীদ কখনো যায় না মরে, কে বলেছে মিথ্যা তারে?

হযরত ইমাম আওযায়ী রহ. এর মত মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদকে দেখুন, তিনি ইলমী ময়দানকেও শামাল দিতেন সাথে সাথে জিহাদের ময়দান থেকেও পিছে থাকতেন না।

আকাবেরে দেওবন্দের আমল

বেশী পিছনে যাওয়ার দরকার নেই; নিকটবর্তী অতীতে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, তাঁদের পরিচয় হলোহকপন্থী ও সত্যবাহী, তাঁদের দ্বারা দ্বীনের হেফাজত হয়েছে, মুসলমানরা তাঁদের থেকে ইলম পেয়েছে, কুফুরী শক্তির পরাজয় হয়েছে। তাঁরাই এসব কিছু করেছেন। এই উপমহাদেশের তাসাউফের ইমাম, সায়্যিদুত ত্বায়িফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কি রহ. ফকিহুন নাফস বা দ্বিতীয় ইমাম আবু হানিফা হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., হুজ্জাতুল ইসলাম কাসিমুল উলূমি ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ. হাফেজ যামেন শহীদ রহ. প্রমুখ আলেমগণ সবাই জিহাদের ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

তাঁদের অন্তরে তো এই ওয়াসওয়াসা আসেনি, [আল্লাহ না করুন] যদি আমারা শহীদ হয়ে যাই তাহলে তো দ্বীনের ক্ষতি হবে। বরং হযরত নানুতুবী রহ. কে একবার বলা হলো, হযরত! এভাবে যদি আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকি তাহলে তো দারুল উলূম শেষ হয়ে যাবে। তখন তিনি বললেন, "দারুল উলূমের ইঁটগুলো যদি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় সেটা বরদাশত করতে পারবো; কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ছাড়তে পারবো না।"

দেওবন্দের মূল প্রাণশক্তি ও ভিত্তিস্থাপক, মাল্টা দ্বীপের কারাবন্দি, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. কে একবার কেউ বলল, "আপনার কবরের জায়গাটা আপনার আসাতিযা ও আকাবিরদের পাশে নির্দিষ্ট করে দিন।" হযরত বললেন, এ তুমি কি বলছো? আমি তো চাই যে, আল্লাহর রাস্তায় আমার শরীর টুকরা টুকরা হয়ে যাক। যাতে এগুলোকে একত্র করতে না পারে এবং দাফনের কোন প্রয়োজন না হয়।

[মুহব্বতে ইলাহিয়্যা পৃ:৩৫০ মুফতী রশীদ আহমাদ লুধীয়ানবী রহ.]

তৎকালীন মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল জিহাদ। মাদ্‌রাসাগুলো ছিল মুজাহিদ দূর্গ ও ছাউনি। যদি ছাউনিতে অবস্থানরত সেনাদল ও কমান্ডাররা যুদ্ধ ছেড়ে দেয় তাহলে যুদ্ধ করা কি সম্ভব? না, না, কখনই না।

এজন্য বিনীত নিবেদন এই যে, রনাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে যদি উলামায়ে কেরাম জিহাদে শরীক হয়, জখম হয়, শহীদ হয়, এর দ্বারা অতীতে কখনো দ্বীন-ধর্ম নি:শেষ হয়নি ভবিষ্যতে ও হবে না ইনশাআল্লাহ! বরং এর দ্বারা ইলম আরও বৃদ্ধি পাবে, মাদ্‌রাসার উন্নতি হবে এবং দ্বীনে ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হবে। কারণ, এ পথে যতবেশী মূল্যবান রক্ত ঝরে ততবেশী ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

অজস্র মূল্যবাণ প্রাণ যদি হয় বিলীন
পৃথিবীতে চমকাতে থাকবে খোদার প্রিয় দ্বীন
বাগান টিকে থাকতে ফুলের মুখাপেক্ষী নয় ভূবনে
তবুও সে বিমোহিত করে সৌরভ-সমিরণে।

আমাদের সামনে জলন্ত প্রমান তাসখন্দ, সমরকন্দ, তিরমিয, বুখারা প্রবৃতি অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম জিহাদের ময়দানে বের না হওয়ায় মাদ্‌রাসাসমূহকে আস্তাবলে পরিণত করা হয়েছে, মসজিদ গুলিকে মদের আসর বানানো হয়েছে, বরং মসজিদগুলিকে বেশ্যালয় বানানো হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই শাহাদাত জিহাদ এর আওতায় ছিল না তাই তাদের কুরবানীগুলো কোন ফলাফল দেখতে পরেনি।

আফগান জিহাদে উলামায়ে কেরামের অবদান

আফগানিস্তানের উলামায়ে কেরাম যখন জিহাদের ময়দানে বের হয়ে শস্ত্র জিহাদ শুরু করেছেন, শরীরের তাজা রক্ত ঝরিয়েছেন এবং ময়দানে যুদ্ধরত অবস্থায় শাহাদাতের অমৃত সুধাপান করেছেন, সুবাহানাল্লাহ! তাঁদের এই কুরবানীর বিনিময়ে গোটা আফগান জাতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা কতইনা চমৎকার বিজয় অর্জন করেছেন। সুপার পাওয়ার ও পরাশক্তির ধজাধারী রশিয়া যেখানে সারা পৃথিবী শাসন করার স্বপ্ন দেখতো। তারাও সেখানে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হতে বাধ্য হয়েছে। বরং স্বীয় রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাদের হাতে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফগাণ জাতী তখন বিজয়ের মধ্য দিয়ে কয়েক শতাব্দির মৃত খেলাফতকে পূণরুজ্জিবীত করেছেন। আগের তুলনায় শত শত মাদরাসা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করেছেন। এতে করে মাদ্‌রাসার ছাত্রদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর আইন বাস্তবয়ন হয়েছে এবং আলেম-উলামাদের শাসন ও স্বাধীনতা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এজন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার! আপনারা আপনাদের অন্তর থেকে কাপুরুষতা ও হিনমন্নতা পরিহার করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শাহাদাতের অমৃতসুধা পান করাকে নিজের সৌভাগ্য মেনে করুন। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এ পথের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

সংশয়-৩৫

আজ কাল খুব জোরেশোরে, ঢাকঢোল পিটিয়ে এবং নির্লজ্জতার সাথে বলা হচ্ছে যে, ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে নয়; বরং আখলাকের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. ও কখনো কাফেরদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তলোয়ার উঠাননি। বরং তাঁরা তো ডাকাতদের থেকে হেফাজতের জন্য তলোয়ার ব্যবহার করতেন। যদি আমরা 'দাওয়াত' এর কাজ সঠিকভাবে প্রচার করতে পারি তাহলে কাফেররা আপনা-আপনি মুসলমান হয়ে যাবে। আমাদের কাউকে হত্যা করা বা কেউ নিহত হওয়ার প্রয়োজন হবে না। আজ আমাদের আমল ঠিক না হওয়ার কারণে কাফেররা মুসলমান হচ্ছে না। যদি আমাদের আমল ঠিক হয়ে যায় এবং 'আখলাক' সুন্দর হয়ে যায় তাহলে কাফেররা স্ব-উদ্যোগেই মুসলমান হয়ে যাবে! এমন মনোমুগদ্ধকর প্রস্তাব অনেকেই উপস্থাপন করেন।

সমাধান-১

আসুন, প্রথমে আমরা দেখি, 'আখলাক' কাকে বলে?

এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ এবং মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআনে কারীম ঘোষণা করেছে-

"وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ"

'আপনিই তো মহান চরিত্রের অধিকারী।' [সূরা কালাম: ৪]

দুই. উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. কে কেউ জিজ্ঞাসা করল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'আখলাক' কি ছিল? তখন উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. বললেন"كان خلقه القرآن"- অর্থাৎ রাসূল ﷺ 'আখলাক' তো সম্পূর্ণ কুরআন, এতে যা আছে তাই রাসূল ﷺ 'আখলাক'।

তাহলে একটু ভেবে দেখুন, কুরআনে কারীমে জিহাদের হুকুম সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো এই বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল ﷺ আখলাকের অংশ। তাহলে জিহাদও যখন রাসূল ﷺ এর আখলাক ও চরিত্রের অংশ তবে 'তলোয়ার'কে আখলাক থেকে পৃথক করা বা আখলাক এবং তলোয়ারকে পরস্পর বিরোধী বানানো কুরআনে কারীম থেকে দূরত্ব বৈ আর কী ?

সমাধান -২

যদি রাসূল ﷺ মোবারক নামসূমহ লক্ষ করা হয় তাহলে দেখা যায়, যেখানে রাসূল ﷺ কে "نبي الرحمة" রহমতের নবী "نبي التوبة"তওবার নবী বলা হয়েছে সেখানে "نبي الملاحم" যোদ্ধা নবী এবং "نبي السيف"তরবরী ওয়ালা নবীও বলা হয়েছে। তাহলে কি রাসূল ﷺ কে এসব নামে অভিহিত করার কারণে কি তাঁর মধ্যে অসদাচরণের লেশমাত্রা থাকার সন্দেহ হতে পারে? নাউযুবিল্লাহ!

সমাধান -৩

যতক্ষণ তরবারী চলে ততক্ষণ কাফেরদেরকে তরবারীর শক্তি দ্বারা গোলাম বানানো যায় এবং এর ফলে কাফেররা মুসলমানদের নিকট থেকে সুন্দর অখলাক অবলোকন করার সুযোগ পায়। অতপর তারা মুসলমানদের 'আখলাক' দেখে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়।

অন্যভাষায় বললে, কাফেরদের সেনাপতি ও জেনারেল যারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে গর্ব করে, তরবারী তাদের গর্ব-অহংকার ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। তখন তাদের নিজেদের অবস্থা চিন্তা করার পর সুযোগ হয় এবং সমস্ত উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও দুর্বল মুসলমানদের নিকট অপদস্থ হওয়ার পর আল্লাহ তা'য়ালার একত্বতা স্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না। তখন সে আল্লাহর একাত্বতা ও রাসূলের রেসালতের উপর ঈমান আনার মধ্যেই নিরাপত্তা বুঝতে পারে। যেমন এক হাদীসে এসেছে, কিছু লোক জান্নাতে যেতে চায় না। কিন্তু তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে জান্নাতে নেওয়া হবে।

সমাধান -৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.(ابن مردويه عن أبي هريرة).

- كنز العمال: ١٠٤٨٩ حرف الجيم. - الجامع الصغير للسيوطى: ٥٣٠ رقم الحديث:٨٧٥٤

'যে ব্যক্তি তরবারী কোষমুক্ত করল সে যেন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে বাইআ'ত গ্রহণ করল।'

দুনিয়ার পীর-মাশায়েখগণ তো বাইআ'ত করেন উত্তম চরিত্র সাধনের জন্য তাহলে কি জিহাদের হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা অনুত্তম চরিত্রের জন্য বাইআ'ত করাচ্ছেন? দয়া করে একটু ভাবুন। হায় আল্লাহ! আমাদের সহীহ বুঝদান করুন।

সমাধান -৫

মেসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায় আর পাগড়ী পরে নামাজ আদায় করলে সত্তর রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।[৬]

---

৬. যদিও এ হাদিসটি সহীহ নয়, কিন্তু সবসময় পাগড়ী পরিধান করা সুন্নত। এ সুন্নতসকলের নিকট পালনীয়। তাহলে অস্ত্র নিয়ে নামাজ আদায় করাও তো সুন্নত, তবে এ সুন্নত কেন পালনীয় হবে না !! (অনুবাদক)

[ইবনে ইসহাক দাইলামী]

এটাও একটা আখলাক এবং অনুস্বরণীয় সুন্নত। কিন্তু অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাজ আদায় করলেও তো সত্তর রাকাত নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়।এটা কি আখলাক এবং অনুসরণীয় সুন্নত নয়? [মাশারিউল আশওয়াক:৩০৫]

মেসওয়াক করা, পাগড়ি পরিধান করা, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামায পড়া এ তিনটির সবগুলোই যখন রাসূল ﷺ এর সুন্নত এবং চরিত্র তখন দুটিকে আখলাকের অন্তর্ভূক্ত করা আর একটিকে আখলাকের বহির্ভূত করা কাদিয়ানী ও দাজ্জালী পথ ছাড়া মুসলমানের কোন পথ হতে পারে না। আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

সমাধান -৬

রাসূল ﷺ এর প্রেরণের উদ্দেশ্য তো সাধারণভাবে এমনটা বর্ণনা করা হয়-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كذا روي عن الدراوردي .

- سنن البيهقى الكبرى: ٣٥٦/١٠ باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل المروءة. رقم الحديث:٢٠٧٨٢

হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন-
আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আমি মানুষের আখলাক সংশোধন করি।

অথবা প্রেরণের উদ্দেশ্য এভাবে বয়ান করা হয় যে,انما بعثت معلما 'আমাকে মানব জাতির শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।'

কিন্তু আরেকটি হাদিস রয়েছে, জানি না সেটাকে বর্ণনা করতে কেন ভয় হয় ! রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

بعثت بين يدي الساعة با لسيف

- مصنف إبن أبي شيبة ٢١٧/١٠ ماذكرفي فضل الجهادوالحث عليه.رقم الحديث:١٩٧٤٧ - مسند أحمد : ٥١٦/٤ رقم الحديث:٥١١٥

'আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত তলোয়ার দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।'

রাসূল ﷺ এর পাঠদান ও আত্মশুদ্ধিকরণ যেমন আখলাক একই সাথে তরবারীও আখলাখ। কারণ, এ ব্যাপারেও রাসূল ﷺ কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আর যা কিছু রাসূল ﷺ কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পুরোটাই আখলাক।

এ কারণে রাসূল ﷺ এর ২৭টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ, ১১টি তরবারী, ৭টি লৌহবর্ম, ৬টি কামান, ২টি ধনুক, ৪টি ঢাল, ২টি শিরাস্ত্রাণ ও মিনজানিক [প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র] যুদ্ধ প্রশিক্ষণ এবং হযরত আবু বকর রা. কে মুসলমান বানানো, উবাই ইবনে খালাফকে নিজ হাতে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠানো; সবগুলোই তাঁর আখলাক এবং রহমত। কারণ, রাসূল ﷺ এর শানে ঘোষণা করা হয়েছে- "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" 'নিশ্চই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' [সূরা কলাম:৪]

আরো ইরশাদ করা হয়েছে-
"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ" 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।' [সূরা আম্বিয়া: ১০৭]
আর আমাদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"

'রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা আদেশ দিয়েছেন সেটা গ্রহণ কর। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা কঠোরশাস্তি প্রদানকারী।' [সূরায়ে হাশর: ৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"

'নিশ্চই রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

[সূরা আহযাব: ২১]

সুতরাং আমাদের পক্ষ থেকে কাফেরদের দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানানো যেমন আখলাক তেমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাফেরদের হত্যা করে মানব সভ্যতা ও শিষ্টাচারকে কুফুরীর অন্ধকার এবং অপবিত্র ছায়া থেকে পবিত্র করাও আখলাক।

সমাধান -৭

যদি শিশুর খৎনার জন্য শরীরের স্পর্শ কাতর অঙ্গ কাটা, মানবদেহের ক্যান্সার যুক্ত অঙ্গকে ফেলে দেয়া, চোরের হাত কাটা, ডাকাতের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া, মদ্যপায়ী এবং অবিবাহিত ব্যভিচারীকে দোররা মারা, বিবাহিত হলে প্রস্থরাঘাতে হত্যা করা, সেচ্ছায় হত্যাকারীকে হত্যার বদলে হত্যা করা (যদি) আখলাক এবং রহমত হয় তাহলে পাপীষ্ট-দুরাচারী ও বিশৃঙ্খলাকারী কাফেরকে হত্যা করা চরিত্র বহির্ভূত হবে কেন?

সমাধান -৮

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আমরা যদিও নিজেদের মা-বোনদের গালি দেয়া সহ্য করতে পারি না। ঘরে ধনসম্পদ হেফাজতের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকি। এমনকি এরজন্য আদালতেও মামলা দায়ের করি। তার প্রতিবাদও প্রতিরোধের জন্য হাত-মুখ যা ব্যবহার করা দরকার, সবই করি। কিন্তু যখন আল্লাহর দ্বীনের বিষয় আসে, যখন মসজিদ শহীদ করা হয়, মাদ্রাসা ভেঙ্গে দেয়া হয়, মুসলিম মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু হরণ করা হয়, ইসলামের নিদর্শন ও বিধি-নিষেধ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়, রাসূল ﷺ ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কুরআনের অবমাননা করা হয় তখনো এসব কমবখত্ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস হয় না। কিন্তু তদের সব অন্যায়-অপরাধ চোখবুঝে সহ্য করে নিতে পারেন; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদ ভাইদেরকে একটু সুনজরে দেখার হিম্মতটাও কি হয় না? এটাই কি আখলাক! এটাই কি উদারতা!!

সমাধান -৯

"বাকী রইল ইসলাম তরবারীর বিনিময়ে নয়; বরং আখলাকের বিনিময়ে প্রসারিত হয়েছে।" এ কথাটি ভিত্তিহীন ও অর্থহীন মনে হয়। কারণ, আমরা প্রথমেই আরজ করেছি, তরবারী আখলাক থেকে আলাদা কোন কিছু নয়; বরং আখলাকেরই অংশ। তরবারীর কাজ হলো, অবাধ্য, বিশৃঙ্খল ও গোঁয়ার প্রকৃতির কাফেরদের মুণ্ড ঠিক করা। যে পথের কাঁটা হতে চায় তাকে দূর করা। কিন্তু

তরবারীর জোরে কালেমা পড়ানো শরীয়তের হুকুম নয়। বরং কাফেররা এ ব্যাপারে স্বাধীন যে, কালেমা পাঠ করে মুসলমান হতে পারে নতুবা কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করে জাহান্নমের ইন্ধনও হতে পারে। সোজা কথা, ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার ক্ষেত্রে এরা সম্পূর্ণ মুক্তি সাধন। এদের উপর কোন রকম জোর-জবরদস্তী করা যাবে না।

ইসলাম তো এটা চায় যে, কাফেরদের শক্তি যেন ভেঙ্গে যায় এবং তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান না থাকে। যদি কাফেররা জীবিত থাকতে চায় তাহলে জিযিয়া বা আয়কর টেক্স দিয়ে মুসলমানদের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে লাঞ্ছনার সাথে জীবন যাপন করবে। ইসলাম ও শরীয়তের নীতিমালার আলোকে একথা বলা ঠিক হবে না যে, "কাফেরদের কালেমা পড়তে বাধ্য করা হয়"।

সমাধান -১০

"আমাদের আমল ঠিক নেই, তাই কাফেররা কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করছে না।" এ বক্তব্য ঠিক আছে আমরাও এটা স্বীকার করি। কিন্তু কোন আমল? শুধু কি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের নামই আমল ? জিহাদ করা কি আমল নয়? মুহতারাম দোস্ত! এগুলো আ'মল, ইসলামের রোকন ঠিক আছে; কিন্তু যে আমলগুলো কাফেরকে ইসলামের কাছে নিয়ে আসে এগুলো সে আমল নয়! জিহাদের আমল ঠিক না থাকার কারণে কাফেরেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে না।

আসল বিষয় হলো, মুসলমানদের ঐক্য, শক্তি-ক্ষমতা এবং তাদের মান-সম্মান কোথাও সংরক্ষিত নেই। আর বাস্তবতা হলো, যখন মুসলমানদের মান-মর্যাদা সংরক্ষিত না থাকে তখন তারা গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়। তাদের জান-মাল কাফেরদের দয়া ও করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ অবস্থা হলে তো কাফেররা এরকম গোলামদের দেখে কালেমা পড়বে না। যা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, "الناس على دين ملوكهم" 'প্রজারা রাজার ধর্মের অনুসারী হয়, গোলামের ধর্মের নয়। আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে যদিও কতক বুযুর্গের দাওয়াতে কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু ব্যপকভাবে পুরো জাতি তখনই ইসলাম গ্রহণ করেছে যখন ইসলামের ক্ষমতা এবং বিজয় হয়েছে। শুধুমাত্র রাসূলের যুগের দিকে লক্ষ্য করুন, কুরআনের ভাষায় ঘোষনা হচ্ছে-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً

'যখন আল্লাহর সাহায্য এল, মক্কা বিজয় হলো এবং ইসলামের জয় ও শক্তি অর্জন হলো তখন লোক দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগল।'

এর আগে তো একজন একজন করে ইসলাম গ্রহণ করছিল। প্রিয় ভাইয়েরা! এজন্য বলছি, যেখানে অন্যান্য আমলের প্রয়োজন সেখানে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং খেলাফত কায়েমের মত আমলও অনেক বেশী প্রয়োজন। এ জন্য বিশেষভাবে এ দিকে দৃষ্টিপাত করুন যাতে ইসলাম প্রসারিত হতে পারে এবং সহীহ ও প্রকৃতরূপে ইসলাম জিন্দা থাকতে পারে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এপথে কবুল করো। আমীন!!

সমাধান -১১

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলাম বাস্তবায়ন করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। ইসলাম গ্রহণ করার মাসআলায় সকল ইমামগণের ঐক্যমত্য সিদ্ধান্ত হলো, ইসলাম গ্রহণ করার বিধানের ক্ষেত্রে কারো উপর জোর বা বল প্রয়োগ করা যাবে না। কারো গলায় ছুরি রেখে কালেমা পাঠ করার তাগিদ দেয়া যাবে না এবং "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" আয়াতের মর্মবানীও এটাই যে, 'ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।' কিন্তু যেখানে ইসলাম বাস্তবায়ন করা এবং তার প্রচার-প্রসার ও বিধিবিধান প্রচলনের কথা আসবে সেখানে যে বাধাই আসবে তা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।

সাইয়্যেদুনা হযরত আবু বকর রা. যারা শুধু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল; তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে কিয়ামত পর্যন্ত এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ধোকাবাজি ও প্রতারণা সহ্য করা হবে না। তাই এ মাসআলাকে ঘোলাটে করার পরিবর্তে পূর্ণ ব্যাখ্যার সাথে বোঝা প্রয়োজন। কারণ, ইসলামের মেজাযও স্বভাব-চরিত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন ও হেরফের করার কোন সুযোগ নেই।

যদি আমরা ইসলাম সম্প্রসারণ করতে তরবারীকে উপেক্ষা করি তাহলে সাহাবায়ে কেরামের কুরবানীকে অনর্থক সাব্যস্ত করা হবে। যে, 'ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তরবারীর কোন প্রয়োজন ছিল না; সাহাবায়ে কেরাম অনর্থক তরবারী ব্যবহার করেছেন।' [নাউযুবিল্লাহ] অথচ অধিকাংশ এলাকা সাহাবায়ে কেরাম তরবারী দ্বারা বিজয় করেছেন এবং তরবারী মাধ্যমেই অসার বস্তুগুলো পরিষ্কার করেছেন।

ভোর-প্রভাতে যখন মুসলমানগণ বিজয়ের সম্মান নিয়ে কোন এলাকায় প্রবেশ করতেন তখন সাধারণ জনগণের জন্য ঐ সকল বীরদের আখলাক দেখার সুযোগ হত এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে। আর বাস্তবতা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেসব দাঈর দাওয়াতের পিছনে তরবারী শক্তি ছিলো তাঁরা-ই বেশী কামিয়াব হয়েছেন। এ ব্যাপারে মুফতী শফী রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"

'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে।'
[সূরা আলে ইমরান:১১০]

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার কারণ হলো, তাঁদের দাওয়াতকে কেউ তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে না। কারণ, তাঁদের দাওয়াতের পিছনে জিহাদের শক্তি রয়েছে, যে তাদের দাওয়াতকে মানবে না; জিহাদের মাধ্যমে তাদের শেষ ফায়সালা করা হবে। আগের উম্মতের মাঝে দাওয়াতের আমল ছিল ঠিক; কিন্তু তাঁদের দাওয়াতের পিছনে জিহাদের শক্তি ছিল না।

শেষ আবেদন

অনেক হাদীস শরীফে বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রের অসংখ্য ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন- এক হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ তা'য়ালা তরবারী উত্তলনকারীর নামাজ নিয়ে ফেরেস্তাদের মাঝে গর্ব করেন। আরেক হাদীসে ইরশাদ করেন- তরবারী সাথে নিয়ে নামাজ আদায়কারীর নামাজ অন্যদের নামাজের তুলনায় সত্তরগুন বেশী উত্তম। কোন কোন হাদীসে দুশমনকে তীর মারার ফজিলত এসেছে। মোটকথা, এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অনেক। তাহলে আখলাকের ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাকারী যারা আখলাককে তরবারীর বিরোধী বলেন তারা এ হাদীসগুলোর ব্যাপারে কী বলবেন? নাউযুবিল্লাহ! এগুলো কি তাহলে বদ আখলাকের দাওয়াত! কস্মিনকালেও না। আমাদের নবী "نبي السيف" তলোয়ার ওয়ালা নবী ছিলেন তিনি "نبي الملاحم"যুদ্ধাবায নবী ছিলেন এবং তিনি সর্বোত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোত্তম আখলাকের অনুস্মরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

সংশয় -৩৬

ইদানিং কিছু মানুষ নিজেদেরকে দীনের ঠিকাদার দাবী করে বলেন, যে সমস্ত এলাকায় আখলাক ও দাওয়াতের দ্বারা বিজয় হয়েছে সেখানে আজ পর্যন্ত ইসলাম বিদ্যমান আছে পক্ষান্তরে যে সমস্ত এলাকা জিহাদ এবং তারবারীর জোরে বিজয় করা হয়েছে সে এলাকা গুলো পরবর্তীতে কুফুরীতে ফিরে গেছে। যেমন: ইরান, সমরকন্দ, বুখারা প্রভৃতি অঞ্চল মুসলমানদের দখলে আর নেই। সুতরাং জিহাদের চেয়ে দাওয়াতের কার্যকারীতা একটু বেশী বলেই মনে হয়!

সমাধান -১

আসলে এই প্রশ্নের পিছনেও সেই খারাপ মনোভাবটাই কাজ করছে যাতে তরবারীকে আখলাকের বিরোধী এবং বিপরীত বুঝানো হয়েছে। অথচ এটা স্পষ্ট মুর্খতা, দ্বীন থেকে দূরত্বের আলামত এবং সীরাত সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া বৈ কিছু নয়।

সমাধান -২

যে সমস্ত এলাকা জিহাদ এবং তলোয়ারের দ্বারা বিজয় হয়েছে সেখানে পরবর্তীতে কুফুরী বিস্তার লাভ করেছে একথা একেবারে ভুল। কোন একটা রাষ্ট্রে এমন হওয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু একে মূলনীতি এবং সাধারণ নিয়ম হিসাবে পেশ করা অকাট্যভাবে ভুল। দেখুন, মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশে বনু কুরাইযা এবং বনু নযীরের এলাকা এবং খাইবার ও মক্কা মুকার্‌রামা বিজয় হয়েছে জিহাদ এবং তলোয়ারের শক্তিতে। দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম রা. সশস্ত্র অবস্থায় সেখানে গিয়েছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! তাঁরা কি কাফেদের কদমবুসী করতে করতে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন? নাকি উঁচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলতে বলতে মক্কা মুকার্‌রামায় বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেছিলেন?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পারস্যে এবং হযরত আবু ওবায়দা রা. এর নেতৃত্বে শামে এবং হযরত হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর নেতৃত্বে মিশরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ইসলামের এসব বীর বাহাদুরগণ কাফেরদের খুলি নিয়ে খেলতে খেলতে হযরত ফারুকে আযম রা. এর যমানায় সে সকল দেশ বিজয় করেন। তাদের ধনোভান্ডারের চাবি হযরত ফারুকে আযম রা. এর পদতলে এনে অর্পণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত মক্কা, খাইবার, হুনাইন, শাম এবং মিশরসহ অন্যান্য এলাকাগুলো ইসলামের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সমাধান-৩

যদি আপনার কথার দ্বারা এটাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়, জিহাদের দ্বারা এ সব এলাকা বিজয় করা সাহাবায়ে কেরামের ভুল ছিল। নাউযুবিল্লাহ! তাহলে আমি বলবো, এটি একটি কুফরী বাক্য। এর দ্বারা ইরতিদাদের নতুন রাস্তা উন্মোচিত হচ্ছে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম তো রাসূল ﷺ এর আদেশই পালন করেছেন। রাসূল ﷺ জীবনের শেষ মুহুর্তে হযরত উসামা রা. কে সেনাপতি বানিয়ে শামদেশে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণের কিছুক্ষণ পর ইন্তেকাল করেছেন। তারপর হযরত আবু বকর রা. সেই বাহিনীকে পূনরায় প্রেরণ করেছেন। তাহলে আপনার এই আপত্তি স্বয়ং রাসূল ﷺ এর মোবারক আমলের ব্যাপারেই করা হয়েছে। আর রাসূল ﷺ এর কোন আমল নিয়ে আপত্তি করা কি কুফুরী নয়? এমনিভাবে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- আমাকে গোটা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিম একত্র করে দেখানো হয়েছে এবং আমার রাজত্ব সকল এলাকা পর্যন্ত পৌছবে তাও আমাকে দেখানো হয়েছে। রাসূল ﷺ এর এই ওয়াদা ও ভবিষ্যৎবাণী হযরত ওসমান রা. এর যমানায় পূর্ণ হয়েছে।

একটু চিন্তা করুন! যেসব এলাকা যুদ্ধ-জিহাদ এবং তলোয়ারের দ্বারা বিজয় করা হয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে রাসূল ﷺ সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বিজয় করার আদেশও দিয়েছেন। কিন্তু আজ এটাকে দোষণীয় বিষয় মনে করা এবং নানা ধরণের আপত্তি করাই কি দ্বীনের খেদমত? এর দ্বারা কি ঈমান বনবে? নাকি যতুটুকু ঈমান অবশিষ্ট ছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে?

সমাধান-৪

একথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে মুসলমান বানানো নয়; বরং আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন এবং কালেমাকে উঁচু করা। কালেমা পড়া এবং না পড়ার ব্যাপারে কাফেরদের পূর্ণ ইচ্ছা এবং স্বাধীনতা রয়েছে। কাউকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো যায় না। বরং জিহাদের উদ্দেশ্য একমাত্র এই যে, এর দ্বারা যেন মুসলমানদের সম্মান এবং প্রভাব তৈরি হয় আর কাফেররা যেন পরাজিত এবং পরাভূত হয়।

একথা স্পষ্ট, যখন সাহাবায়ে কেরাম রা. কাফের রাষ্ট্র জয় করেছেন তখন সেখানে মানুষদেরকে কালেমা পড়ার জন্য বাধ্য করা হয়নি। যারা আনন্দচিত্তে মুসলমান হতে চেয়েছে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে আর বাকীরা জিযিয়া ও কর দিয়ে নিজেদের জান হেফাজত করে নিয়েছে। কিন্তু তারপর পরবর্তি প্রজন্মের

কর্তব্য ছিল, সেখানে জিহাদ চালু রাখা এবং ঐ সমস্ত এলাকায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নি:শেষ না হতে দেওয়া। কিন্তু যেসব দেশ মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়েছে সে অপরাধ তো পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের; সাহাবায়ে কেরামের নয়। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম আমাদের উপর অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা আমাদের জন্য ইসলাম প্রচার-প্রসারের পথসমূহ খুলে দিয়েছেন। কুফরকে নিস্তনাবুদ করে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আমাদের বিজয়ের পথ দেখিয়েছেন আর আমরা সে পথ হারিয়ে নিজেদের অন্যায়-অপরাধ ও ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য আমাদের দায়ভার তাঁদের মাথায় তুলে দিতে চাই। এটা কি আমাদের চরম জ্ঞানহীনতা ও নির্বুদ্ধীতা নয়? এটা কি তাঁদের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ নয়? এটা কি গোস্তাখি নয়?

ফুকাহায়ে কেরাম তো লিখেছেন, যে সমস্ত এলাকা জিহাদের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে সেখানে খতীব সাহেব তরবারী হাতে নিয়ে খুৎবা দিবেন, জনগনকে একথা অবিহিত করার জন্য যে, এ এলাকা তরবারীর মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। যদি মানুষ ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করতে চায় তাহলে যেন সে এ কথা স্মরণ রাখে যে, আজো পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে এই তরবারী বিদ্যমান আছে যা ইসলাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন কারীদের মন-মস্তিস্ক ঠিক করে দিবে। বিস্তারিত দেখুন, [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া খন্ড:১]

এখন যদি আলেম-উলামা এবং সালেহীনগণ তরবারী হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়ার পরিবর্তে তরবারীকে ইসলামের জন্য অসম্মানী বুঝতে থাকেন বরং তারা রীতিমতো বয়ান করতে থাকেন এবং তরবারীকে আখলাক, যুহুদ ও তাক্বওয়ার বিপরীত মেরুতে দাঁড় কারিয়ে দেন। জিহাদকে ইসলামের পথের বাধা মনে করেন। তাহলে এমতাবস্থায় পৃথিবীতে কুফুর বিস্তার লাভ না করে আর কি বিস্তার লাভ করবে?

সারকথা হলো, যে সমস্ত এলাকা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়েছে এবং দ্বিতীয় বার কুফুর ছড়িয়েছে তার কারণ ছিল একটাই, সেখানকার মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এ মুসিবত এসেছে জিহাদ ছাড়ার কারণে; জিহাদ করার কারণে নয়। হে আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করো। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

ফারুকী শাসন ব্যবস্থা

যদি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রা. শাসন ব্যবস্থাকে পরবর্তী শাসকরা ধরে রাখতো এবং মুসলমানরা তাঁর মতো আমল করতো তাহলে কাফেররা পূণর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরের কথা শ্বাস ফালানোর সুযোগটাও পেতো না তাদের নাভিশ্বাস উঠে যেতো।

দেখুন! ফারুকী শাসনামলে যারই কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করতো সরকারী খাতায় তার নাম তালিকাভূক্ত করা হতো এবং তাকে সরকারী ভাতা প্রদান করা হতো। আর যখন শিশুর বয়স পনের বছর হত এবং বগলে পশম উঠত তখন সে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে চলে যেত। [ইসলামী তাহযীব: মাওলানা আব্দুল করীম কুরাইশী, বীরশরীফ]

সংশয় -৩৭

আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামীয়ার পতনের পর অনেকে অনেক ধরণের প্রশ্ন করেছে। কেউ কেউ এমন প্রশ্ন করেছে, তালোবানরা যেহেতু জোড় করে লোকদের দাড়ি রাখিয়েছিল, জোর করে মহিলোাদেরকে বোরকা পরিয়েছিল, আর যে লোকগুলো তাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছিল, তাদের ঈমানের উপর শুরুতে মেহানত করা হয়নি; বরং ঈমানের মেহনত করা ব্যতীতই যুদ্ধের ময়দানে চলে গিয়েছিল। তাই আমেরিকা যখন আক্রমণ করেছে তখন লোকেরা দাড়ি কর্তন করা শুরু করে দিয়েছে। মহিলোরা বোরকা খুলে ফেলে দিয়েছে। অপরদিকে কিছু কিছু মুজাহিদ কমান্ডাররাও আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা ওমরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে। যার কারণে অল্প দিনের মধ্যে তালেবানদের শাসন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

সমাধান-

এ প্রশ্নের আসল উৎস হলো জিহাদ থেকে দূরত্ব এবং অন্তরে নেফাকী ও কপটতা যেগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে বক্তব্যের দ্বারা প্রকাশ হতে থাকে। যদি জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি নূন্যতম আন্তরিকতা থাকত তবে কখনো তার মুখে এমন কথা আসত না। আর যদি ইতিহাসের বাস্তবতা সামনে থাকত তাহলে এ ব্যাপারে তার অন্তরে কোন রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হত না। কারণ, এমন ঘটনা ইসলামের

ইতিহাসে আগেও ঘটেছে। কিছু লোক এমন ছিল যারা অন্তর থেকে ঈমান আনতো না; বরং পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শুধু বাহ্যিকভাবে মুখে ঈমান প্রকাশ করত। যখন তাদের স্বার্থের উপর আঘাত আসত এবং দ্বীনের জন্য কুরবানীর পালা আসত সাথে সাথে তাদের ভিতরে লুকানো কপটতা ও মুনাফিকী চরিত্রের কথা মুখ থেকে প্রকাশ হয়ে যেত।

আমি শুধু এর একটি উদাহরণ নবী আলাইহিস সালামের যুগ থেকে পেশ করছি, গাযওয়ায়ে ওহুদের সময় যখন রাসূল ﷺ এক হাজার সৈন্য নিয়ে রওয়ানা করলেন তখন তিনশ মুনাফিক এই অজুহাতে মদীনায় ফিরে এল যে, আমাদের পরামর্শ ছিল মদীনা মুনাওয়ারায় থেকে যুদ্ধ করার; কিন্তু আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। আর যে পদ্ধতিতে আপনারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন সেটাকে সমর নীতি অনুযায়ী যুদ্ধ বলা যায় না।

এখন আপনি, একটু চিন্তা করুন, এই যুদ্ধে রওয়ানাকারীর মূল সংক্ষা ছিলো মাত্র সাতশ এবং তাঁরা শেষ নি:শ্বাস পর্যন্ত রাসূল ﷺ সাথেই ছিলেন। আর মাঝ পথ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিল তিনশ মুনাফিক। কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তি ঐ তিনশ মুনফিকের কারণে রাসূল ﷺ এর উপর এই অপবাদ দেয়নি যে, রাসূল ﷺ তাদের উপর ঈমানের মেহনত না করে ময়দানে নিয়ে গেলেন কেন? এঘটনা সম্পর্কে শুধু মাত্র এতটুকু বলা হয় যে, মুনাফিকরা তো পালিয়ে গেছে। কিন্তু মুখলিসীনগণ জানের পরোয়া না করে রাসূল ﷺ এর সঙ্গে-ই ছিলেন। এই যুদ্ধে যদিও বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের পরাজয় হয়েছে; কিন্তু মুখলিস ও সত্যিকার নিবেদিত লোকেরা রাসূল ﷺ এর সাথেই ছিলেন।

তালেবান ও আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ রহ.-র ব্যপারটা এমন দৃষ্টি থেকেই দেখুন। যখন কঠিন মুহূর্ত সামনে আসল তখন মুনাফিকরা বেঁকে বসল, দাড়ি মুণ্ডিয়ে ফেলল এবং কাফেরদের সাথে গিয়ে সখ্যতা গড়তে লাগল। কিন্তু যারা মুখলিস ও নিষ্ঠাবান ছিলেন তাঁরা তো আজো হযরত আমীরুল মু'মিনীন রহ.'র সাথে আছেন। সুতরাং আমরা যেমনিভাবে ঐসব মুনাফিকদের ভীরুতা ও কপটতার সমালোচনা করি তেমনিভাবে হযরত আমীরুল মু'মিনীন এবং তাঁর একনিষ্ঠ নিবেদিত প্রাণ সাথীদের আনুগত্ব, জীবনোৎসর্গ, বীরত্ব ও দৃঢ়তার আলোচনা করা উচিত। আশ্চর্যের কথা হলো, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারী মুনাফেকদের আলোচনাও তো হাজারো

মানুষের সভা-সেমিনারে করা হয়; কিন্তু সুদৃঢ় একনিষ্ঠ মুজাহিদদের বীরত্বের কাহিনী শুধু চেপে রাখা হয়। হায় আফসোস!

প্রিয় পাঠক! এজন্য আমাদের উচিত যে, আমরা আমাদের ঈমানকে এমন দৃঢ় বানাব যেমনটা বানিয়েছেন হযরত আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদ রহ. শায়েখ উসামা বিন লাদেন রহ. এবং তাঁদের সাথী-সঙ্গীরা। যেখানে বড় বড় শক্তিধর শাসক গোষ্টি আমেরিকার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে গেছে তারপর তারা স্বজাতির বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেছে, কিন্তু এসব মর্দে মুজাহিদদের রাজত্ব ছুটেছে, অধিবাসী থেকে আবাসহীন হয়েছেন। আপন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে বাঁচার উপায়-উপকরণের ভরসা নিঃশেষ হয়ে গেছেন, অন্যদের ষড়যন্ত্রের শিকারতো হয়েছেন; আপনজনদের বিষাক্ত তীরের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু এতদ্বসত্বেও এক আল্লাহর উপর তাঁদের ঈমান এতো মজবূত ও সুদৃঢ় ছিলো যে, আলহামদুলিল্লাহ! আজো পর্যন্ত তাঁরা ঈমান বিক্রি করেননি এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র মত উঁচু পথ ছেড়ে দেননি; বরং পর্যায়ক্রমে তাঁদের শসস্ত্র জিহাদী আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে তাঁদের পথ অনুস্বরণ করে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সংশয় -৩৮

কেউ কেউ এমন বলেন যে, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া প্রভৃতী অঞ্চলের লোকেরা তাদের মন্দ কর্মের কারণে আযাবে পতিত হয়েছে। সেখানে জিহাদের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু আমল দুরস্ত করার। যখন তাদের আমল ঠিক হয়ে যাবে তখন এ আযাব আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, বসনিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানদের উপর কাফেরদের থেকে যুলুম-অত্যাচার তখন শুরু হয়েছে যখন মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং জিহাদের ঘোষণা করেছে। যদি এই মুসলমানগণ আমাদের মত আজ-ই কাফেরদের সাথে আপোষ করে নেয় তাহলে তাদের যুলুম-নির্যাতন ও দুঃখ-দুর্দশার অবসান হয়ে যাবে। বরং কাফেরদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য অনেক প্রাচুর্য ও সুযোগ-সুবিধা আসবে। [আহ! কি সুন্দর ভেল্কিবাজী!]

সমাধান -১

মুহতারাম দোস্ত-বুযুর্গ! কুফুরী শাসনকে মেনে নেয়া, কাফেরদের আইন-কানুন গ্রহণ করা, তাদের সাথে আপোষ করে চলা, তাদের সঙ্গে থেকে সর্বরকমের অন্যায়-অপরাধ অশ্লীলতা ও নির্লজ বেহায়াকাজ দর্শন করার দ্বারা কি আল্লাহ তা'য়ালা খুশি হয়ে আযাব উঠিয়ে নিবেন? নাউযুবিল্লাহ! আর যারা কুফরী শাসন এবং কাফেরদের আইন-কানুনের বিরোধীতা করে জিহাদ করেন। আল্লাহ বুঝি তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আযাব নাযিল করবেন? নাউযুবিল্লাহ! এ কেমন ফাযলামি কথাবার্তা।

সমাধান -২

দ্বীনের হুকুম-আহকাম জিন্দা করার জন্য যে সমস্ত মুসিবত এবং দু:খ-কষ্ট আসে তার নাম যদি 'আযাব' হয়, তাহলে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিম ওয়া সাল্লাম এবং রাসূল ﷺ ও তার সাহাবীগণের উপর যে সকল মুসিবত এসেছে সে গুলোকে কী বলা হবে?

যখন রাসূল ﷺ এর উপর ওহী নাযিল হয়নি এবং তিনিও তাওহীদের ঘোষণা দেননি তখন কাফেররা কিছুই বলেনি। আর যখন ওহী নাযিল হলো এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাওহীদের ঘোষণা দিলেন তখন কি কাফেররা অনাবরত অসহনীয় দু:খ-কষ্ট দিতে শুরু করেননি? এগুলি কি তোমার ভাষায় আযাব?

সমাধান -৩

মুসলমানের উপর যখন কোন কষ্ট আসে চাই সেটা যত বড় হোক অথবা যত ছোটই হোক না কেন হয়তো এটা তার জন্য আযাব-গযব হবে, না হয় তার গুনাহ ও পাপরাশী মোচন করে দিবে। আর না হয় তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য দু'টি মূলনীতি বুঝতে হবে।

প্রথম মূলনীতি

যদি কোন ব্যক্তি শুরু থেকেই গুনাহ থেকে দূরে থাকে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে তাঁর সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে এবং দ্বীনের উপর সে আমল করে এতদ্বসত্তেও যদি তার উপর কোন দু:খ-কষ্ট এবং মুসিবত আসে তাহলে সেই দু:খ-কষ্ট আল্লাহ

তা'য়ালার পক্ষ থেকে তার জন্য নেয়ামত এবং মর্যাদা বৃদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। যেমন আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং আল্লাহর ওলীগণের ব্যাপারে আমরা এমনটাই ধারণা করতে পারি।

আর যদি প্রথমে সে গুনাহ করতে থাকে এবং কোন কষ্ট অথবা মুসিবত আসার পর গুনাহ থেকে তওবা করে তাহলে এ মুসিবতও আল্লাহ তা'য়ালার নিয়ামত। কেননা এটা গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। [গুনাহকে মুছে দেয়] যেমন, সাধারণ গুনাহগার বান্দারা যারা কোন মুসিবতের পর তওবা করে থাকে। আর যদি শুরু থেকেই গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং মুসিবত আসার পরেও তওবা না করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে এটা তার জন্য আযাব। আর আসল আযাব তো আখেরাতেই হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

দ্বিতীয় মূলনীতি

খুব ভাল করে মনে রাখতে হবে, যে বিষয়টি সমষ্টিগতভাবে সকলের উপর ফরয এতে কোন রকম ত্রুটি ও কমতি করার কারণে সকলের উপর আযাব আসবে। আর যে বিষয়টি ব্যক্তি বিশেষের উপর ফরয এতে কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি করার কারণে যে আযাব আসবে সেটা তার মধ্যেই সীমিত থাকবে। "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" সবার উপর ফরয। সুতরাং এটা ছেড়ে দেওয়ার কুফল ও পরিণতি সকলেরই ভোগ করতে হবে এবং তা আদায় করলে সবাই এর দ্বারা উপকৃত হবে।

এই দু'টি মূলনীতি বুঝার পর এবার একটু চিন্তা করুন, যেসব দেশে জিহাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানে কি সামাজিক ও সমষ্টিগতভাবে কোন পরিবর্তন আসেনি?

সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে আফগানিস্তানকেই দেখুন! রুশ শাসন আমলে গোটা পৃথিবীতে চলমান জিহাদের জন্য মৌলিক অবদান রেখেছে আফগানিস্তান। সুতরাং নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে তৎকালীন সময় সারা পৃথিবীতে যতগুলো জিহাদী আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো এ সবই ছিলো আফগান জিহাদের বরকত। আর এখন এই মিশন ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে!

আফগানিস্তানে এখন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোরআন-সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সারা দেশে একজন বেপর্দা নারী নেই। একজন দাড়ি মুন্ডানো পুরুষ নেই। কোন সিনেমা ও টিভি ঘর নেই। কোন ছবি নেই। এমনকি কোন প্রাণীর ছবিও দৃষ্টি গোচর হয় না। সুদী কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। মোট কথা, এখানে সম্পূর্ন দ্বীন-ইসলাম যিন্দা হয়েছে। আল্লাহর শ্বাশ্বত বিধান প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!

তাছাড়া অধিকৃত কাশ্মীরে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সহ শিক্ষার প্রচলন থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সিনেমা ঘর বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং যুবক মুসলমানের চেহারায় পর্যন্ত বরকতময় সুন্নতের নূর ইত্যাদি দৃশ্যমান হচ্ছে।

এমনিভাবে বসনিয়া, চেসনিয়ার মত দেশগুলোতেও পরিবর্তন আসছে। আমি এ ব্যাপারে শুধু ইঙ্গিত করছি। বিস্তারিত কিছু বলছি না। শেষ কথা হলো, আল্লাহর রহমতকে কষ্ট এবং নেয়ামতকে আযাব বলা নির্বুদ্ধিতা এবং দ্বীন থেকে দূরত্বে থাকারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সত্য লেখার, হক কথা বলার এবং হক্বের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

সংশয়-৩৯

কেউ কেউ প্রশ্ন করে, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেসনিয়া এবং অন্যান্য দেশে যে যুদ্ধ কমান্ডগুলো চলছে সেগুলো নবুওয়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা ও চরিত্র বহির্ভূত। কারণ, নববী শিক্ষা হলো, যুদ্ধের আগে প্রথমে কাফেরদেরকে দাওয়াত দেওয়া। তারপর জিযিয়া বা টেক্স চাওয়া এবং তৃতীয় পর্যায়ে এসে যুদ্ধের ঘোষণা করা। কিন্তু এখনতো যুদ্ধের আগে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয় না। জিযিয়া তলব করা হয় না। খোলামেলাভাবে সামনা-সামনিও যুদ্ধ করা হয় না কেন?

সমাধান -১

প্রশ্নকারীর মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির কারণ হলো, সে শরীয়ত ও নবুয়তের প্রকৃত শিক্ষা আদর্শ-চরিত্র সম্পর্কে অবগত নয়। বরং সে হরহামেশা নিজের চিন্ত াধারাকে নববী শিক্ষা ও চিন্তাধারা নাম দিয়ে চালিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এই বক্রস্বভাব থেকে হেফাজত করুন। আমীন!

জিহাদের আগে পর্যায়ক্রমে কাফেরদের ঈমানের দাওয়াত দেয়া, জিযিয়া বা টেক্স দেয়ার জন্য বাধ্য করা এবং সর্বশেষ পর্যায়ে জিহাদের ঘোষণা করার

বিষয়গুলো আপন অবস্থায় ঠিক আছে। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। কিন্তু এখানে শুধু কমান্ডো অভিযান এবং গুপ্ত হামলা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মূল কথা হলো, রাসূল ﷺ সব ধরণের যুদ্ধে কাফেরদের ঈমানের দাওয়াত দেয়া এবং জিযিয়া প্রদানের কথা বলেননি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দাওয়াত ছাড়াই সরাসরি কাফেরদের নিস্তনাবুদ করার চেষ্টা করেছেন। আর এক্ষেত্রে গুপ্ত হামলাই সবচে বেশী ফলপ্রসু ও কার্যকর হয়ে থাকে। এধরনের আক্রমণের মাধ্যমে সহজেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়।

রাসূল ﷺ মদীনার অভ্যন্তরীন এবং বহির্গত অবস্থা সুসংহত করার পর জিহাদের সূচনা করেছেন গুপ্ত হামলা দিয়ে। সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করেন যাতে কুরাইশদের অর্থনৈতিক শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া যায় এবং তাদেরকে যুদ্ধের পূর্বে বড় ধরনের ক্ষতির দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া যায়। তারপর রাসূল ﷺ নিয়মতান্ত্রিকভাবে বড় বড় যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেছেন।

যেসব গুপ্ত হামলায় স্বয়ং রাসূল ﷺ উপস্থিত ছিলেন

(১) গাযওয়ায়ে 'আবওয়া' ২য় হিজরীতে সফর মাসে ষাটজন মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে রাসূল ﷺ কুরাইশদের কাফেলা এবং বনু জামরাহর উপর হামলা করার জন্য আবওয়ার দিকে সফর করেন। এসময় ঝান্ডা ছিলো হযরত হামযা রা. এর হাতে। আর মদীনায় রাসূল ﷺ এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা.

(২) গাযওয়ায়ে 'বুয়াত' ২য় হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানীতে দুইশত মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে রাসূল ﷺ 'বুয়াত' নামক স্থানের দিকে গমণ করেন। আর মদীনা মুনাওয়ারায় তখন রাসূল ﷺ হযরত সায়েব ইবনে উসমান রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

(৩) গাযওয়ায়ে 'উশাইরাহ' ২য় হিজরীর জুমাদিল উলায় দুইশত মুহাজির সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ কুরাইশ কাফেলার উপর হামলার জন্য "উশাইরাহ" দিকে রওয়ানা করেন। মদীনায় তখন হযরত আবু উসামা ইবনে আব্দুল আসাদ রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

(৪) গাযওয়ায়ে 'সফওয়ান' ২য় হিজরীতে রাসূল ﷺ কুরয ইবনে জাবের ফাহরীকে ধাওয়া করার জন্য সফওয়ানের দিকে সফর করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় তখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছ রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন।

যেসব যুদ্ধ রাসূল ﷺ মদীনায় বসে পরিচালনা করেছেন

(১) হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. ২য় হিজরীর রবিউল আউয়ালে অথবা রবিউস সানীতে ত্রিশজন মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের নেতৃত্বে সাদা ঝান্ডা দিয়ে আবু জাহেলের ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমনের জন্য হযরত হামযা রা. কে বাহিনীর প্রধান বানিয়ে "ইস" নামক স্থানের দিকে প্রেরণ করেন।

(২) সারিয়্যা উবায়দা ইবনে হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দা রা. এর সাথে ষাটজন অথবা আশিজন মুহাজির সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের অধীনে থাকা মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য 'বাতনে রাবেগ' নামক জায়গায় পাঠান।

(৩) সারিয়্যা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. ২য় হিজরীর যিল কা'দা মাসে কুরাইশের এক ব্যবসায়ী কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য হযরত সা'দ রা. কে বিশজন মুহাজির সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে রওয়ানা করান।

(৪) সারিয়্যা যায়েদ ইবনে হারেছা রা. ২য় হিজরীর জুমাদিল উখরা মাসে কুরাইশের একটি ব্যবসায়ী কাফেলার উপর হামলার জন্য একশজন সাহাবীর নেতৃত্ব দিয়ে তাকে 'কিরদার' দিকে রওয়ানা করান।

সমাধান -২

এছাড়াও রাসূল ﷺ ব্যক্তিগতভাবে কিছু কাফের দলনেতা, মানুষরুপী শয়তান স্বভাবজাত চরিত্রহীন বৃদ্ধ এবং দু:শ্চরিত্র মহিলোকেও হত্যা করেছেন। কিন্তু একাজগুলোর পরিচালনাও গোপনে এবং কমান্ডো আক্রমনের আদলেই হয়েছে।

(১) ২য় হিজরীর ২৬ রমজানে অন্ধ সাহাবী হযরত উমায়ের ইবনে আদী রা. রাতের আঁধারে এক ইয়াহুদী মহিলো ইয়াযীদ ইবনে যায়েদের স্ত্রী ইসমা বিনতে মারওয়ানকে হত্যা করেছেন। আর এর বিনিময়ে তিনি রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়েছেন।

(২) ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে হযরত সালেম ইবনে উমায়ের রা. ১২০ বছরের বুড়া আবু আফিক নামের ইয়াহুদীকে হত্যা করেছেন।

(৩) ৩য় হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়ালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে ইয়াহুদী নেতা আবু রা'ফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হাক্বীককে হত্যা করেছেন।

(৪) ৩য় হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়ালে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার মাধ্যমে মদীনার ইয়াহুদী সরদার কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করিয়েছেন।

(৫) ৪র্থ হিজরীর ৫ই মুহার্‌রমে খালিদ ইবনে সুফিয়ান হুযালীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. কে প্রেরণ করেছেন এবং সফল হয়ে ফিরে আসার পর তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। পুরস্কার স্বরূপ লাঠি মোবারক হাদিয়া দিয়ে বলেছেন, এটাকে আঁকড়ে ধরে জান্নাতে বিচরণ করবে।

সমাধান -৩

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় ১০ম হিজরীতে আসওয়াদ আন্‌সী ইয়ামানে নবুওয়াত দাবী করে। সে নাযরান দখল করে সানাআ'র দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানকার গভর্নর হযরত শাহ্‌র বিন বাযাম রা. কে শহীদ করে দেয় এবং হযরত শাহ্‌র বিন বাযাম রা. এর স্ত্রী হযরত আযায রা. কে জোরপূর্বক তার হেরেমে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে মিথ্যুক আসওয়াদ আন্‌সী পুরা ইয়ামানের উপর দখল নিয়ে নেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তখন ইয়ামানের তিনজন অধীপতি মুসলমান এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন। হযরত ওয়াবার ইবনে ইয়াখনাসকে দিয়ে সেই চিঠি পাঠান। যার মূল ভাষণ ছিল নিম্নরুপ 'সকল মুসলমান নিজ ধর্মের উপর অটল থাক। আর সকল মুসলমানের উচিত আসওয়াদ আন্‌সীকে হত্যা করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া। প্রকাশ্যে ময়দানের মুকাবেলা করে তাকে হত্যা করো অথবা গুপ্ত আক্রমণে হত্যা করো'। সুপ্রিয় পাঠক! আশা করি চিঠির ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দ্বীনের মেযাজ বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

অবশেষে হযরত ফিরুজ দাইলামী রা. তার চাচাতো বোন আয়ায, [যাকে আসওয়াদ আনাসী জোরপূর্বকভাবে তার হেরেমে নিয়ে গিয়েছিলো।] কায়েস বিন বুগুছ এবং যাশীশ ইবনে দাইলামীর সাথে একত্র হয়ে তাঁরা রাতের আঁধারে গেরিলা আক্রমণ করেন। যার ফলে আসওয়াদ আন্‌সী নিহত হয়। এর মাধ্যমেই তার রাজত্বের সমাপ্তি হয় এবং মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা পূনরুদ্ধার হয়।

সুতরাং যেসব ভূখন্ডে মুসলমানরা কাফেরদের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিনে রয়েছে। তাদের জন্য শরয়ী বিধান হলো, তার যেন কাফেরদের দাসত্ব গ্রহন না করে। তারা যেন কাফেদের শাসনক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ করার লক্ষ্যে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা যতো চেষ্টা করবে, যতো কষ্ট এবং ত্যাগ শিকার করবে এসবই শরয়ী জিহাদের মর্যাদায় শামিল থাকবে।

সংশয়-৪০

কাশ্মীর জিহাদের ব্যপারে ব্যপকভাবে এ প্রশ্ন করা হয় যে, কাশ্মীর জিহাদে অংশ গ্রহণকারী সংগঠন গুলোর উপর বিভিন্ন এজেন্ডাদের নিয়ন্ত্রন আছে এবং সেখানে এজেন্ডাদের চাহিদা অনুযায়ী-ই কাজ করা হয়। আর এজেন্ডা দ্বারাও কাশ্মীরের জিহাদ একনিষ্ঠ নয়। বরং তারা চায় এ কাজ চলতে থাকুক মুজাহিদরা মরতে থাকুক আর [এলোক গুলো] নিজেদের পকেট ভরতে থাকুক। কারণ, পাকিস্তানের প্রত্যেক রাষ্ট্র প্রধানই কাশ্মীরে কথা বলে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান উঁচু করে। যদি এ সকল ধাধা ও পলিসি শেষ হয়ে যায় তাহলে তদের রাজনীতি ও শেষ হয়ে যাবে। কাশ্মীর জিহাদ উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার ভিত্তিতে হচ্ছে এমনটাও নয়; বরং এটাও এজেন্ডাদের একটা চাল ও চক্রান্ত।

সমাধান -

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা যাহেদ আর-রাশেদী সাহেব দা.বা. এর আলোচনা হুবহু উল্লেখ করছি। যা 'আওসাফে আখবার' পত্রিকার কলাম 'নাওয়ায়ে কলম-কলমের আওয়াজ'শিরোনামে প্রকাশ হয়েছিলো। 'পাকিস্তানের কিছু গবেষনাগার প্রতিষ্ঠান এবং গবেষকদের প্রশ্ন হলো, কশ্মীরের জিহাদ আফগান জিহাদের মত নয়। কারণ, আফগান জিহাদের ফতোয়া উলামায়ে কেরাম দিয়েছিলেন। এই ফতোয়ার ভিত্তিতে জিহাদি দলগুলো রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলো। তারা নিজেদের কর্ম সিদ্ধান্তে মুক্ত ছিল। কিন্তু কাশ্মীর জিহাদ পুরোপুরি তার বিপরীত। এরা নিজেদের কর্ম-সিদ্ধন্তে মুক্ত-স্বাধীন নয়। এজেন্সীদের নিয়ন্ত্রণ তাদেরকে বেষ্টন করে রেখেছে আযাব নিয়ন্ত্রণকারীরা নিজেরাও জিহাদের কোন ঘোষনা দেয়নি। এজন্য কাশ্মীরের জিহাদকে আফগানিস্তানের ন্যায় শরয়ী জিহাদের মর্যাদ দেয়া যাবে না।'

কিন্তু আমার নিকট এই দিকটি একটি ভুল ছাড়া আর কিছুই না। কারণ, আপনার কল্পিত বিষয়টি তখনই গ্রহণ করা যেত যখন জিহাদী গ্রুপগুলোর মেহনতকে কাশ্মীর জিহাদের উৎস ধরা হত। কিন্তু বাস্তব বিষয়টি তার বিপরীত। আসল ইতিহাস হলো, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কাশ্মীরের উলামায়ে কেরাম যাদের মধ্যে আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. মাওলানা আব্দুল্লাহ কফলগায়ী, মাওলানা গোলাম হায়দার জান্ধালুভী, মাওলানা ইউসুফ খান আফপলন্দরী, মাওলানা আব্দুল হামীদ কাসেমী, মাওলানা আব্দুল্লাহ সিয়াখুভী, মাওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন নদভী সহ আরো অন্যান্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তারা ডোগড়া শসকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দেন এবং এর ভিত্তিতে নিজেরাও ময়দানে বের হয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য জিহাদের সূচনা করেন। যার ফলে আযাদ কাশ্মীরের বর্তমান কর্তৃত্ব অর্জন হয়। এর পরে না ঐ সকল উলামায়ে কেরাম এ ফতোয়া ফিরিয়ে নিয়েছেন না কাশ্মীরের জনগণ স্বাধীনতা আন্দোলনের কোশেশ ও মেহনত থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন।

একারণে আজ কাশ্মীর জিহাদের বর্তমান অবস্থা তারই ধারাবাহিকতার অংশ এবং এর দ্বারা শরয়ী ভিত্তি রগোড়াপওন হয়েছে। উল্লেখিত উলামায়ে কেরামের ঐ ফতোয়ার সূত্রে-ই গোগড়া উপোনিবেশ থেকে যুদ্ধ করে আযাদ কাশ্মীরের ভূখন্ড স্বাধীন করা হয়েছে।

আজো কাশ্মীর জিহাদের বড় অংশ দ্বীনি জামাত এবং মাদ্রাসার উলামায়ে কেরাম ও ছাত্রদের হাতেই রয়েছে এবং তাঁরাই এর মূল প্রাণশক্তি। আর পাকিস্তান সরকার ও এজেন্সিদের অবস্থান আজো সহযোগী হিসাবে আছে এবং থাকবে। যেমনটা ছিলো আফগান জিহাদেও। তবে সীমান্ত ও অসহায় এলাকাগুলোর অবস্থা সম্পূর্ন ভিন্ন। আর এ ভিন্নতাই কিছু মানুষের মেধা ও মস্তিস্ককে বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছে।

আমার মতে কাশ্মীর জিহাদের ব্যপারে সাবধানতা অবলম্বন কারীরা ইতিহসের পাতায় উদার দৃষ্টিতে তাকালে তাদের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে এবং সেও একথা স্বীকার করে নিবে যে, কাশ্মীরের জনগণের চেষ্টা ও সাধনা শরয়ী জিহাদের মর্যাদা রাখে। তাদের সহযোগীতা করা আমাদের দ্বীনি দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

শোনা কথায় কান দিওনা বন্ধু হে!
এটা রাজনৈতিক দাঙ্গা তোমায় বলছে কে?
এটা ইসলাম ও কুফুরের যুদ্ধ জনাব!
কাশ্মীরের যুদ্ধ নিশ্চিতই জিহাদ।

সংশয়-৪১

কাশ্মীরের যুদ্ধ তো নিরেট দেশীয় যুদ্ধ? ইসলামের যুদ্ধ নয়। কারন j.k.l.f এবং ন্যাশনাল ডেমক্রিটিক ফ্রন্ট ও অন্যান্য কিছু সংগঠন স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা দিয়েছে যে, আমাদের দাবী শুধু হিন্দুস্তান স্বাধীন করা এবং কাশ্মীরে কাশ্মীরীদের শাসনের অধিকার থাকবে। চাই সে কাশ্মীরী মুসলমান হোক অথবা হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান যাই হোক না কেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে তাদের যুদ্ধের মূল কথা এটাই যে কাশ্মীরে ভিনদেশীদের শাসন চলবে না। এ দাবী আদায় হলেই তাদের জিহাদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাহলে এখন আপনি-ই বলুন! এটা কি ইসলামী জিহাদ ?

সমাধান -১

সর্বপ্রথম আমরা অতি সংক্ষেপে কাশ্মীরের ইতিহাসের দিকে নজর বুলাই। এছাড়া কাশ্মীরের জিহাদ বোঝা সম্ভব নয়।

কাশ্মীরে ৮০০ সালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের আগমনের সূচনা হয়। কিন্তু ১২৯৫ সালে শায়েখ শরফুদ্দিন আব্দুর রহমান ওরফে বুলবুল শাহ ৯০০ জন মুরীদ নিয়ে সমবিহারে তিব্বতের পথ দিয়ে কাশ্মীরে আসেন। অসংখ্য লোক হযরতের হাতে মুসলমান হন। ঐ সময় ১৩২৫ সালে রাজরিঞ্চন স্বীয় স্ত্রী কোটারানীকে নিয়ে হযরতের হাতে মুসলমান হন। তখন হযরত বুলবুল শাহ তাঁর নাম রাখেন সদরুদ্দীন।

এভাবে ১৩২৫ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত কাশ্মীরে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠত থাকে। ১৮১৯ সালে বঞ্জিত সিং আক্রমন করে গোটা জম্মু ও কাশ্মীর দখল করে। এই রাজা রঞ্জিত সিংয়ের বিরুদ্ধেই আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ ও হযরত ইসমাইল শহীদ রহ. জিহাদে অবতীর্ণ হন। ১৮১৯ থেকে ১৮৪৫ সন পর্যন্ত রঞ্জিত সিং, খরৎ সিং, রাণী চাঁদ, কোরশের সিং, দিলিপ সিং গংরা পর্যায়ক্রমে শাসক হয়। রাজত্ব কালের শেষ সময়ে এসে ইংরেজদের মোকাবেলায় যুদ্ধে রাজার পরাজয় হয় এবং শিখদের উপর যুদ্ধে ভর্তুকি আসে ৫২ লক্ষ, কিন্তু রাজা রঞ্জিত সিং উক্ত ভর্তুকির বদলায় কোহিনুর, হিরা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কর্তৃত্ব ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়। কিছু দিন পর ইংরেজরা ৭৫ লাখের বিনিময়ে জম্মু ও কশ্মীরের ক্ষমতা রাজা গোলাপ সিংয়ের কাছে বিক্রি

করে দেয় এবং অস্ত্রবলে তা গোলাপ সিংয়ের দখলে এনে দেয়। এরপর মুসলমানরা ১৯৩১ সালের রাজা হরিসিংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে রাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরের কর্তৃত্ব ইংরেজ নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। কিন্তু ১৯৪০ সালে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তীব্রতর হয় এবং জমিনের উপরে ও নিচে সর্বোত্র জিহাদ শুরু হয়ে যায়। দেখতে দেখতে মুজাহিদরা গিলগিট, বেলুচিস্তান, চিলাস এর এলাকাগুলো অধিকার করে নেয়।

অতপর ১৯৭৪ সালের ১৬ই আগস্ট বারামুলা, মুজাফ্ফারাবাদ, মিরপুর, কোটলি, পুচঁ ও রাজুরের মুসলমানগণ জিহাদের ঘোষণা করেন। যার ফলে ডেগড়া ফৌজের পা উপড়ে যায়। তাদের হাজার হাজার সৈন্য মারা যায়। আর বাকি কাফেররা জম্মুর দিকে পালিয়ে যায়।

অবশেষে রাজা হরিসিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সাথে সমঝোতা করে স্বীয় পুত্র কিরণ সিংয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় একটি পদ বরাদ্ধ করার শর্তে পুরো জম্মু ও কাশ্মীর ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। এভাবেই ভারতীয় কাফের সরকার এই কাশ্মীর দখল করে নেয়।

ইতিহাসের সার কথা হচ্ছে, ১৩২৫ থেকে ১৮১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বছর কাশ্মীরে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এরপর কাফেররা দখল করে নেয়। যার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম আমীরুল মুমিনীন সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ রহ. ও তারপরে তাঁর সনাম ধন্য খলীফা মাওলানা সাইয়্যেদ ইসমাইল শহীদ রহ. জিহাদের সূচনা করেন। যা কোন না কোনভাবে আজো পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ! যতক্ষন পর্যন্ত কাশ্মীরে ইসালামী শাসনের পতাকা উড্ডিন না হবে জিহাদী সংগ্রাম চলবেই চলবে-

এই ভূমিকার পর আরজ হলো, ফিক্বহে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফুকাহায়ে কেরাম একথার উপর একমত যে, যদি মুসলিম দেশে কাফেররা আক্রমণ করে তাহলে সেখানকার মুসলমানদের উপর যুদ্ধ করা ফরযে আঈন। আর যদি সেখানকার মুসলমারা যুদ্ধ না করে অথবা শক্তি না থাকার কারণে যুদ্ধ করতে না পারে তবে উভয় অবস্থায় পার্শ্ববতী মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজে আঈন হয়ে যায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। এর জন্য ফতোয়া প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। আমি ফতোয়ার বিষয় নিয়ে কথা বলছি না। কারণ, ফতোয়া আমার আলোচ্য বিষয় নয়। এছাড়াও ফতোয়া এখন অনেক ব্যাপক হয়ে গেছে।

সমাধান -২

যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে, সেখানকার মুসলমানরা শুধু নিজেদের দেশের জন্য যুদ্ধ করছে তাহলে আমার প্রশ্ন হলো ,শরীয়ত কি এটার অনুমতি দেয় যে, কাফেররা আমাদের সম্পদ, জীবন, ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর আমারা অনুভূতিহীন বোবার ন্যায় বসে থাকব? কক্ষনও না। কিছুতেই না। বরং শরীয়ত পুরোপুরি ভাবে প্রতিশোধের অনুমতি দেয় এবং নিজের জীবন, সম্মান ও সম্পদ রক্ষার জন্য লড়াই করে নিহত হওয়াকে শাহাদাতের মর্যাদা প্রদান করে। হাদীস শরীফে আছে-

"ومن قتل دون نفسه فهو شهيد"

'যে তার জীবন রক্ষার জন্য নিহত হয় সে শহীদ।'

"ومن قتل دون أهله فهو شهيد"

'আর যে পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।'

"ومن قتل دون ماله فهو شهيد"

'যে তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।'

[আহ্কামুল কুরআন-৪য় খন্ড পৃষ্ঠা:৪৫]

সমাধান -৩

সুতরাং কাশ্মীরের আন্দোলন একটি বিশুদ্ধ শরয়ী আন্দোলন এবং সেখানকার জিহাদ বিশুদ্ধ শরয়ী জিহাদ। বাকী থাকল এই আপত্তি যে এদের মধ্য হতে কয়েকটি দল ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে শুধু কাশ্মীরের কাশ্মীরীদের শাসনেরই স্লোগান দেয় চাই শাসক হিন্দু হোক বা শিখ কিংবা খৃষ্টান ।

প্রথম কথা হলো, আলহামদুলিল্লাহ! কাশ্মীরে তাদের কোন গুরুত্ব নেই। লোকজন এখন জিহাদ বুঝে গেছে । আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, কিছু লোকের ভুল শ্লোগানের কারণে কি আমরা সঠিক শ্লোগান বর্জন করব? কেউ যদি এ কথা বলে যে মির্জা কাদিয়ানী যেহেতু মিথ্যা নবুওয়াত দাবী করেছে, তাই আমি সত্য নবীকেও মানব না। এটা কি সঠিক হবে? যদি না হয় আর তা নিশ্চিতই সঠিক নয়। তাহলে কিছু লোকের ভুল শ্লোগানের কারণে আমরা সত্য শ্লোগান কিভাবে বর্জন করতে পারি?

কাশ্মীর উপাত্যকার উপমা কিছুটা এমন, যেমন জমীনে জান্নাত নেমে এসেছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমাদের শাহরগ আমাদের থেকে পৃথক, তথাপি আমাদের কাফনে ভাঁজ পড়েনি। যে দেশ কখনও মুসলমানদের হাতে ছিল তার পূ:ণর্দখল মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য এবং ফরয।

সমাধান -৪

যদি একথা স্বীকৃত হয় যে, কাশ্মীরে ৫০০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসন চলছে এরপর তা কাফেররা ছিনিয়ে নিয়েছে। এদের থেকে কাশ্মীর আযাদ করা আমাদের সবার উপর ফরয ছিল এবং থাকবেও বটে । তাহলে বিষয়টি এভাবে বুঝুন, আমাদেরই কিছু লোক অলসতার কারণে ভুল শ্লোগান নিয়ে সামনে বেড়ে গেছে। আমরা যদি সামনে বাড়তাম তবে তাদের এই সুযোগ হতো না । তাহলে অপরাধ আমাদেরই।

অতএব, এসব লোকদের জন্য ময়দান খালি ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত সামনে বেড়ে আন্দোলনের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে নেয়ার চেষ্টা করা যাতে এই আন্দোলন বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন হিসাবেই জীবিত থাকে এবং এই জিহাদ বিশুদ্ধ ইসলামী জিহাদ হয়। যদিও তা প্রথম থেকেই শরয়ী ও ইসলামী জিহাদ। তথাপি আমি আমার আপত্তিকারী বন্ধুর ধারনা ও চিন্তার আলোকেই এমনটি বলেছি।

মহা সুসংবাদ

আলহামদুলিল্লাহ! আজ পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় জিহাদের আওয়াজ উঠছে। কিন্তু আমি বিশেষভাবে এ সময়ে কাশ্মীরে কর্তব্যরত মুজাহিদদেরকে যারা বাস্তবে গাযওয়ায়ে হিন্দে লিপ্ত একটি সুসংবাদ শুনাতে চাচ্ছি। সাধারণভাবে জিহাদের কিতাবে যার উল্লেখ থাকে না। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিন্দুস্তানের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – وذكرالهند يغزوالهند بكم جيش يفتح الله عليهم حتى يأتوابملوكهم مغللين بالسلاسل يغفرالله ذنوبهم،فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام.

- كنز العمال: ٣٩٧٧١٩ حرف قاف . ٢٥٧\٢٤ - جامع الأحاديث للسيوطي: مسند أبي هريرة : ٣٣٥\٣٩ - كنز المال للمتقي الهند : نزول عيسى ٦٩٨\١٤

'হিন্দুস্তানে একটি বাহিনী তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে যাদের উপর আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করবেন। এমনকি ঐ মুজাহিদগণ তাদের রাজাদের

গলায় শিকল পরিয়ে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তাঁদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। তাঁরা যখন বিজয় করে প্রত্যাবর্তন করবে তখন শামে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাবে।'

[কানজুল উম্মাল:৩৯৭৭১৯]

অনেক নিদর্শন দেখে মনে হচ্ছে যে, ঈসা আ. এর অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর হিন্দুস্তানের জিহাদ তো শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকেও ঐ কাফেলায় অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

সংশয় -৪২

মুজাহিদরা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে জিহাদ করে। কিন্তু তাদের দেশে কি কুফুর, শিরক, যুলুম, সীমালঙ্ঘন, অন্যায় পাপাচার, নগ্নতা, ব্যভিচার এবং যে সমস্ত খারাপ বিষয়গুলোর কারণে জিহাদ করতে হয় সেগুলো কি খতম হয়ে গেছে? যখন নিজ দেশেই জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার কারণগুলো বিদ্যমান তখন উচিত ছিল, প্রথমে নিজ দেশে জিহাদ করা পরবর্তীতে অন্য দেশে জিহাদ করা। কিন্তু এখন আমার এই নীতির বিপরীত করছি কেন?

সমাধান -১

যদি এ নীতি মেনে নেয়া হয় যে, যতক্ষন পর্যন্ত নিজ দেশে কুফুর, শিরক ও অন্যান্য অন্যায় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদেশে গিয়ে জিহাদ করা উচিত নয়। তাহলে এই নীতি কি শুধু জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য নাকি দ্বীনের অন্যান্য শাখায় কর্মরত নেককার উলামা, মুবাল্লিগ, দায়ীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে? যদি অন্যদের ক্ষেত্রেও সেকথা প্রযোজ্য না হয় তাহলে শুধু শুধু মুজাহিদদের টার্গেট করে এমন কথা বলা হয় কেন?

সমাধান -২

আমার মতে আমাদের উলামায়ে কেরাম শতকরা ৯৫ জন নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় দ্বীনের কাজ করছে। তাদের কি নিজ পৈত্রিক এলাকায় দ্বীনের কাজ পূর্ণ হয়ে গেছে? আল্লাহ না করুন তাদের এই দ্বীনি খেদমত কি বেকার হয়ে যাবে? তদ্রুপ দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মানুষ অন্য দেশে যায়। অথবা উলামায়ে কেরাম নিজ এলাকা ছেড়ে বিভিন্নদেশে সফর করেন। তাদের এই সফর বা অন্য বিষয়গুলো কি শরিয়ত পরিপন্থী এবং নাজায়েয? আল্লাহ না করুন! তাদের এসব আমল কি বৃথা যাবে?

সমাধান -৩

একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, আমাদের দেশ পাকিস্তানের অবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভিন্ন। এখানকার দ্বীনি মাদরাসাগুলো স্বাধীন। এখানে জিহাদের আলোচনা কিংবা ট্রেনীং পর্যন্ত প্রকাশ্যে হচ্ছে। জিহাদের কেন্দ্রগুলো খোলা আছে। তা ছাড়া কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই দ্বীনের সকল কাজ করা যাচ্ছে। যদিও মাঝে মাঝে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক মুশকিল বিষয় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণভাবে পাকিস্তানের অবস্থা পর্যালোচনা করলে একথা বুঝে আসবে, এ মূহুর্তে পাকিস্তানে সশস্ত্র জিহাদ করার দ্বারা লাভের তুলনায় লোকসান অনেক বেশী হবে। ফায়দা খুব কমই হবে ।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, পাকিস্তান এখন সারা দুনিয়াতে ইসলামী জিহাদের জন্য বিশটি ক্যাম্পের ভুমিকা পালন করছে। রাশিয়ার মত পরাশক্তিকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এখন ভারতকে টুকরো টুকরো করার পথে এসেছে। সবকিছু পাকিস্তানের মাধ্যমেই হয়ে আসছে।

যদি এ মূহুর্তে পাকিস্তানে সশস্ত্র জিহাদী আন্দোলন শুরু করা হয় তাহলে কাশ্মীরে জিহাদী আন্দোলনের উপর আনেক খারাপ প্রভাব পড়বে এবং ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এধরনের আরো অনেক বিপদ সামনে রেখে পাকিস্তানে সশস্ত্র জিহাদের পরিবর্তে শুধু জিহাদের দাওয়াত এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে।

সমাধান -৪

সুতরাং যদি কোন রাষ্ট্রের বিবাদমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে শরঈ কল্যাণের ভিত্তিতে সেখানে আপাতত জিহাদ করা না যায় তাহলে এর অর্থ কি এটা যে, অন্য কোন রাষ্ট্রেও যদি জিহাদের প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়, আর সেই প্রয়োজন পূরণের শক্তি-সামর্থ্য আমাদের থাকে তাহলে কি সেখানে জিহাদ করা যাবে না ? এটা লেখকের সময়ের কথা। আর বর্তমানেতো আলহামদুলিল্লাহ! পাকিস্তানেও সশস্ত্র জিহাদ শুরু হয়ে গেছে।

সামান্য অনুভূতিশক্তি যার আছে, দ্বীনের ব্যাপারে দূরে থাক দুনিয়ার ব্যাপারেও সে এরকম ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে রাজী নয়।

আপনি কি কখনো দেখেছেন কিংবা শোনেছেন যে, কোন ব্যক্তি শুধু এই অজুহাত দেখিয়ে চাকুরীর জন্য বিদেশ যায় না যে, আমার দেশেই তো কাজ নেই আবার অন্য দেশে যাবো কেনো?

জিহাদ ব্যতীত দুনিয়ার কোন ব্যাপারে অথবা ইসলামের অন্য কোন বিধানের ব্যাপারে কেউ এ নীতি গ্রহণ করে না। এধরণের কথাও বলে না। কিন্তু জিহাদের প্রতি তার যে অবজ্ঞা এবং বৈরীভাব আছে সেটাতো কোনো একভাবে প্রকাশ করতেই হবে। সুতরাং জিহাদের ক্ষেত্রে এমন কথা বলা জিহাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং বৈরিতার বহি:প্রকাশ ছাড়া আর কি?

একটি তথ্য

কাফেররা যদিও জিহাদের কঠোর বিরোধী এবং জিহাদ নিয়েই তাদের সবচে বেশী মাথাব্যথা তারপরেও তাদের মনোবাসনা হলো; পাকিস্তানী মুজাহিদরা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করুক। তাদের এই মনোভাব ইসলামের প্রতি মুহাব্বত থাকার কারনে নয়; বরং এতে তাদের বড় অর্জন হলো, মুজাহিদরা যেন তাদের নিজ ভূমিতেই জড়িয়ে যায়। আর মুসলমানরা উভয়মুখী ক্ষতির শিকার হয়। মুসলমানদের দেশ যেন ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু সবচে বড় কথা হলো মুজাহিদদের জিহাদী শক্তি যখন নিজ ভূখন্ডেই খর্ব হয়ে যাবে তখন অন্য কোনো কুফরীরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি আর তাদের থাকবে না।

সমাধান -৫

প্রকৃত সত্য ও ইসলামী শরীয়তের মেযাজ হলো এই- একজন মুসলমান সারাটা জীবন দ্বীনের সাথে লেগে থাকবে এবং মৃত্যু অবধি আখেরাতের প্রস্তুতিতে লিপ্ত থাকবে। পরিস্থিতি যেমনই হোক দ্বীনের ফিকির এবং আমল থেকে সে উদাসীন হবে না। এর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে পর্যায়ক্রমে নিজ রাষ্ট্র থেকেই কাজ শুরু করবে। যদি নিজ এলাকা ও রাষ্ট্রের লোকগুলোর মাঝে কাজ চালু করার কোন সম্ভাবনা না দেখা যায় তাহলে তখন অন্য এলাকা ও রাষ্ট্রের অভিমুখী হবে। যুৎসই সময়ও সুযোগের অপেক্ষায় চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এটাই নবুয়াতের মেযাজ, শরীয়তের মেযাজ এবং সাহাবীগণের মেযাজ।

আপনি যদি নববী যুগ ও পরবর্তী যুগের ইসলামী ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে সামনে আসবে। রাসূলে আরাবী ﷺ এর মক্কী জীবন এবং মাদানী জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

সমাধান -৬

যদি নিজের দেশের প্রতি এতটাই দরদ থাকে আর জিহাদের আগ্রহও থাকে তাহলে প্রিয় বন্ধু! এই কাজ নিজেই কেন আঞ্জাম দিচ্ছেন না। হিম্মত করুন। বড় মজা লাগবে। এপথে চলতে গেলে পরিক্ষা আসবেই। এতো ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সংশয়- ৪৩

অনেক সময় কোন কোন মুজাহিদ নিজের অস্ত্রের আঘাতে অথবা অন্য কোন মুজাহিদের অসতর্কতা বসত: তার হাতে আক্রান্ত হয় কিংবা ট্রেনিংয়ের সময় গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়। তখন মুজাহিদরা নিজের দলের শহীদ বাড়ানোর লক্ষে তাকে শহীদদের মাঝে গণ্য করেন। অথচ যে ব্যক্তি কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কাফেরদের হাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে সেইতো প্রকৃত শহীদ।

সমাধান -

এসব প্রশ্ন আমাদের নিতান্ত মূর্খতার প্রমাণ বহন করে হাদীসের কিতাবগুলোতে এমন অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যেখানে কোন কোন সাহাবী নিজের তলোয়ারের আঘাতে নিজেই শহীদ হয়েছেন অথবা অন্য কোন সহযোদ্ধার অস্ত্রের আঘাতে শহীদ হয়েছেন। অথচ রাসূল ﷺ তাদের শহীদদের মাঝে অর্ন্তভূক্ত করেছেন। এখন তাদের প্রকৃত শাহাদাতের ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ আছে?
আপনার কথা অনুসারে শহীদদের সংখ্যা বাড়ানোই কি রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্য ছিলো? নাউযুবিল্লাহ!

এখন আপনি নিজেই আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য রাসূল ﷺ এর আমলই সবচে বড় দলীল-প্রমাণ। নিম্নে কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো-

দলীল-১

বদর যুদ্ধে একজন সাহাবী শহীদ হলে তাঁর মা উম্মে হারেছা রা. রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলে শহীদ হয়েছে, কিন্তু সে অজানা তীরে শহীদ হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য নেই যে, এই তীর কি কফেরের ছিল না মুসলমানের ছিল। যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো অন্যথায় আমি কাঁদবো! তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এসব কি বল? জেনে রেখো! সে জান্নাতে অনেক উচ্চ স্তরে রয়েছে।

وإن ابنك أصاب جنة الفردوس

- صحيح البخارى : ٣٩٤/١ باب من أتاه سهم غرب فقتله. رقم الحديث:٢٨٠٩ - سنن الترمذى : ١٥١/٢ ومن سورة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. رقم الحديث:٣١٩٨ - مسند أحمد : ٣٢٨/١١ رقم الحديث:١٣٩٤٦ ،

"আরে তোমার ছেলে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে গেছে। [বুখারী]

দলীল-২

খায়বার যুদ্ধে ইহুদীদের সরদার বাহাদুর মারহাব উচ্চ আওয়াজে এই কবিতা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানে আসলো।

قد علمت خيبر أني مرحب *
شاكي السلاح بطل مجرب

খায়বার বাসী জানে যে আমার নাম মারহাব। আমি অস্ত্রে সুসজ্জিত অভিজ্ঞ বীর এবং যুদ্ধের সময় আমি গর্জে উঠি। হযরত আমের রা. তার মোকাবেলায় এই কবিতা আবৃত্তি করলেন-

إذا الحروب أقبلت تلهب
شاكى السلاح بطل مغامر

খাইবার বাসী জানে আমার নাম আমের আমি আস্ত্রে সুসজ্জিত প্রাজ্ঞ যোদ্ধা।

হযরত আমের রা. মারহাবের উপর ক্ষীপ্র গতিতে হয়ে হামলা করলেন; সে পিছনে সরে গিয়ে কোন রকম প্রাণে বেঁচে গেলো। কিন্তু হযরত আমেরের

তলোয়ার ছোট বিধায় আঘাতে নিজের হাঁটুতে এসে লাগল। যার কারণে হযরত আমের রা. শহীদ হয়ে গেলেন। তখন কিছু লোক বলতে লাগল কি আশ্চর্য কথা! সে নিজের তলোয়ারেই মারা গেছে। হায় আফসোস! সে যদি কোন কাফেরের তলোয়ারে শহীদ হতো। হযরত আমেরের ভাগিনা বলেন, মানুষ আমার মামার ব্যাপারে যা বলাবলি করছে তা শোনে আমি মর্মাহত হলোম এবং আমি সংশয়ে পড়ে গেলাম যে, বাস্তবেই তাঁর মর্যাদায় কোন ঘাটতি আসবে কিনা?

তাই আমি রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মামা যেভাবে শহীদ হয়েছেন সে ব্যাপারে তো মানুষ বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাঁকে সাধারণ শহীদদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে [এক. শাহাদাতের সওয়াব দুই. তাঁর শাহদাতকে কেন্দ্র করে মানুষ যে সমালোচনা করছে তার সওয়াব।] [বুখারী]

দলীল- ৩

উহুদ প্রান্তরে হযরত মুসআব বিন উমায়ের রা. শহীদ হলেন। যেহেতু তিনি রাসূল ﷺ এর সাদৃশ্য পূর্ণ ছিলেন, এসুযোগে শয়তান রাসূল ﷺ এর শহাদাতের মিথ্যা খবর প্রচার করল। তখন মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তাঁদের হুঁশ অনুভূতি চলে যায়। যার ফলে তাঁরা দোস্ত-দুশমন, আপন-পর চেনার অনুভূতিশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। হযরত ইয়ামান রা. এই বেহুঁশ ও গোলোযোগের মাঝে পড়ে যান। ফলে তিনি মুসলমানদের হাতে শহীদ হন। পরে মুসলমানরা অনেক লজ্জিত হয়ে তাঁর ছেলে হযরত হুজাইফা রা. কে বললেন, আল্লাহর কসম! আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি। হযরত হুজাইফা রা. বললেন, "يغفر الله لكم وهو أرحم الرحمين" 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন তিনি সর্বাধিক দয়ালু।'
তারপর রাসূল ﷺ যখন দিয়ত বা হত্যা জরিমানা দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন হযরত হুজাইফা রা. অস্বীকৃতি জানালেন। যার ফলে রাসূল ﷺ এর কাছে হযরত হুজাইফা রা. এর মর্যাদাও বেড়ে যায়।

দলীল-৪

আফগান মুজাহিদদের প্রশিক্ষক খালিদ বিন ওয়ালিদ নামের এক কমান্ডার পেশওয়ারে অরস্থানরত তাঁর উস্তাদ জামিল ইমরান সাকনা বিন বুজাহ এর সাথে সম্পর্কিত শিয়ালকোটের মুজাহিদরেকে তিনি গ্রেনেড বিষ্ফোরনের প্রশিক্ষণও ট্রেনিং দিতেন। ঘটনাক্রমে তিনি গ্রেনেড বিস্ফোরণে শহীদ হয়ে যান।

প্রত্যক্ষ দর্শীরা বলেন, শহীদ হওয়ার সাথে সাথে সেনা ছাউনি থেকে এক অপূর্ব সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে পাহাড়ের পাদদেশে সেনাছাউনিতেই মসজিদের দক্ষিন পশ্চিম কোণে দাফন করা হয়। তারপর সেখানে দেখা যায় এক কুদরতী করিশমা। কায়েকদিন যাবৎ আকাশ থেকে তাঁর কবর পর্যন্ত লম্বা একটি আলোর ঝলক নেমে আসতো তারপর আবার চলে যেতো।

এটা এমন এক শহীদের কারামত যিনি নিজ গ্রেনেড বিস্ফরণে মারা গিয়েছিলেন। আল্লাহ যেন তাঁর মাক্বাম আরো বাড়িয়ে দেন। উল্লেখিত ঘটনা থেকে আর কিছু বুঝে না আসলেও অন্তত পক্ষে একথা বুঝে আসবে যে, তিনি আল্লাহর দরবারে শহীদ হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

সংশয় -৪৪

যারা দ্বীনের হেফাজত, দ্বীনের বিজয় এবং শরয়ী আইন বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ করেন; তারা নিজেরা যখন কোন বিপদে পড়েন তখন শত্রুর ভয়ে নিজেদের দাড়ি কেটে ফেলেন। যখন দ্বীনের রক্ষক ও দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি সামান্য একটি সুন্নতের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পরল না। তাহলে অন্য ক্ষেত্রে তার থেকে কি আশা করা যায়?

সমাধান -১

শরীয়তের হুকুমসমূহের মধ্যে সবচে বড় হুকুম হলো আল্লাহর উপর সুদৃঢ় ঈমান আনা এবং সবচে বড় গুনাহ হলো কুফুরী করা।

যখন কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের ভয় হয় অথবা শরীরের কোন অঙ্গ পঙ্গুকরে দেয়ার আশংকা হয়। তখন মাসআলা হলো, তার অন্তরে যদি ঈমান পরিপূর্ণ থাকে এবং হৃদয় শান্ত থাকে তাহলে মুখে কুফুরী কালিমা উচ্চারণ করে প্রাণ বাঁচানো জায়েয আছে।

এমনিভাবে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অমার্জনীয় গুনাহ হলো রাসূল ﷺ এর শানে বেয়াদবী মূলকঃ কথাবার্তা বলা এবং গালি দেওয়া। এটা এমন গুনাহ যে এ ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। মক্কা বিজয়ের সময় যেখানে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেখানে। পনেরজন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। এই নির্দেশের আওতায় অনেক মহিলোাও ছিলো। তারা সবাই ছিলো রাসূলের কটুক্তিকারী।
আব্দুল্লাহ বিন খাতালের হত্যার নির্দেশ সে সময়ও বহাল রাখা হয়েছে যখন সে বাইতুল্লাহর গিলাফের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলো এবং হাউমাউ করে ক্রন্দন করছিলো।

কিন্তু যদি প্রাণ নাশের ভয় থাকে অথবা কোন অঙ্গ পঙ্গু করে দেয়ার আশংকা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় কাফেরদের জবরদস্তির কারণে মুখ দিয়ে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করার অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে।

প্রথম দলীল :(এর জন্য অনেক গুলো ঘটনা রয়েছে)
হযরত আম্মার বিন ইয়াছের রা. এর ব্যাপারে তার ছেলে হযরত মুহাম্মদ বিন আম্মার রা. বলেন, আমার পিতা আম্মারকে মুশরিকরা গ্রেফতার করল। রাসূল ﷺ এর শানের খেলাফ কথবার্তাবলা আর তাদের মূর্তির প্রশংসা নাকরা পর্যন্ত তারা আমার আব্বাকে ছাড়েনি। হযরত আম্মার রা. রাসূল ﷺ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলন, তোমার অন্তরের অবস্থা তখন কেমন ছিলো? তিনি বললেন, ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। রাসূল ﷺ বললেন, পূণরায় যদি কাফেররা গ্রেফতার করে তখন তুমিও কৌশল অবলম্বন করে কথা বলে নিজের প্রাণ রক্ষা করবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই আয়াত নযিল হয়-

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورة النحل-١٠٦)

যারা ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করছে আর কুফুরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছে; তাদের উপর আল্লাহর গযব পতিত হবে আর তাদর জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তাদের জন্য নয় যাদেরকে কুফুরীর জন্য বাধ্য করা হয়ছে কিন্তু তাদের হৃদয় ছিলো ঈমানে অবিচল। [সূরা নাহলোঃ১০৬]

২য় দলীল

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কে যখন কা'ব বিন আশরাফকে গুপ্ত হামলায় হত্যা করার দায়িত্ব দেয়া হয় তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বদবখতকে আমার শিকারে আনতে যদি আপনার শানের খেলাফ কোন কটু কথা বলতে হয় তাহলে এর অনুমতি আছে কি না ? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অনুমতি আছে।

৩য় দলীল

এমনিভাবে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো যে, ঈমানের পরে ইসলামে সবচে গুরুত্বপূর্ণ রোকন হলো নামাজ। কিন্তু জিহাদের ময়দানে যদি শত্রু পক্ষ থেকে এমন আশংকা থাকে যে, সাওয়ারী থেকে নেমে নামায পড়লে দুশমন আক্রমণ করে বসবে। তাহলে সাওয়ারীর উপর বসে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

আর যদি সাওয়ারী থেকে নিচে নেমে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়ার কারণে পিছন থেকে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকে তাহলে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে ফিরে নামায আদায় করতে পারবে।

যদি এমন আশংকা থাকে যে, যুদ্ধাবস্থায় নামায পড়লে শত্রু এসে আক্রমন করে কাজ শেষ করে ফেলবে। তখন শরীয়ত এ নির্দেশ দেয় যে, প্রয়োজনে নামায কাযা করবে কিন্তু জিহাদকে পিছানো যাবে না। যেমন খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আসরের নামায এবং কোন কোন বর্ণনা মতে চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়েছিলো।

এমনিভাবে রামাযানের রোযা, যা নামাযের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যদি যুদ্ধের ময়দানে রোযা রাখার কারণে দুর্বলতা এসে যায় এবং শত্রুর মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা হয় তাহলে রোজা কাযা করবার অনুমতি আছে; কিন্তু জিহাদ বিলম্ব করার অনুমতি নেই।

এসব ঘটনা জানার পর এবার আপনারাই একটু চিন্তা করে বলুন, মুখে কুফুরী কালিমা, রাসূলের শানে বেয়াদবী মূলক কথা বার্তা বলা, জিহাদের ময়দানে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে নামায-রোযা কাযা করা যায়। তাহলে নিজের প্রাণকে রক্ষা করার জন্য দাড়ি মুন্ডানো যায়েজ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে?

হ্যাঁ, কোন অবস্থার সম্মুখীন হলে মুজাহিদরা দাড়ি ফেলে দিবে এটা মুজাহিদরাই ঠিক করবে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে রসূল ﷺ এর সুন্নতের সম্মান থাকা জরুরী এবং দাড়ি ফেলে দেয়ার দুঃখ-কষ্টও অন্তরে থাকা জরুরী।

যেমন আমরা কোন কোন আরব মুজাহিদকে দেখছি, যখন তারা আফগান যুদ্ধ শেষে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে লাগলেন। বিশেষ করে মিসরীয় মুজাহিদদের এক মুষ্টি দাড়ি যা তাদের চেহারার সৌন্দর্য এবং নবুয়তের বাগানের ফুলের ন্যায় প্রস্ফুটিত ছিলো করাচি বিমান বন্দরে আসার পর তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, দাড়ি ফেলে দিতে হবে। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তাঁরা একদিকে দাড়ি ফেলে দিচ্ছিলেন। অন্যদিকে তাঁদের চোখ থেকে অনর্গল অশ্রুনদ গড়িয়ে পড়ছিলো। ইন্‌শাআল্লাহ! এই অশ্রুনদ একদিন হোস্‌নি মোবারকের পতন ও ভেসে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [২০১২ সালে মোবারক পতন গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিলো।] আল্লাহ্ আমাদের দ্বীনের হেফাযত করুন। আমীন!

দাড়ি ও মওদুদী মতবাদ

জনসাধারণ মনে করে, দাড়ি রাখা সুন্নত এবং দাড়ি এতটুকু লম্বা রাখাই যথেষ্ট, যে কেউ দেখলেই যেন বলতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির দাড়ি আছে। আর এটাই ছিলো মিস্টার মওদুদীর মতবাদ।

কিন্তু এ মতবাদটি কিছুতেই সঠিক নয়। প্রথম কথা হলো দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দ্বিতীয় কথা হলো, যে দাড়ি এক মুষ্টি থেকে কম হবে তা সেভ করার মতই। হুকুমের ক্ষেত্রে দাড়ি সেভ করা আর এক মুষ্টি থেকে কম রাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এক মুষ্টির চেয়ে কম দাড়িকে সুন্নত মনে করা সেভ করার চেয়েও বড় গুনাহ। কেননা সে এমন দাড়িকে দাড়ি মনে করে যাকে শরীয়ত দাড়ি হিসাবে গণ্য করে না। এর দ্বারা সে শরীয়তের হুকুমকে পরিবর্তন করছে। যার কারণে তার ঈমানে ত্রুটি আছে বলে অনুভব হচ্ছে। আর যে ব্যক্তি গুনাহকে গুনাহ্ মনে করে না এমন ব্যক্তির তাওবাও নছিব হয় না। সে সারাজীবন আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সংশয় -৪৫

মেহমান আগমনে মুজাহিদরা অস্ত্র ও কুচকাওয়াজের মাধ্যমে স্বাগত জানায়। শরীয়তে কি এর কোন ভিত্তি আছে?

সমাধান -১

হ্যাঁ, শরীয়তে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন-

"لما قدم رسو لالله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك ،لعبوا بحرابهم."

- سنن أبي داؤود: ٦٧٤/٢ باب في الغناء . رقم الحديث:٤٩٢٣ -
مسند أحمد ١٢٦٧٠ مسند أنس بن مالك ١٦١/٣

যখন রাসূল ﷺ মদীনায় আগমন করলেন তখন হাবশার লোকেরা খুশিতে তীরান্দাযীর মাধ্যমে মহড়া দেখালেন।

সমাধান -২

এটা সর্ব স্বীকৃত কথা যে, মেহমানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজেদের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটায়। যেমন যদি কোন মাদ্‌রাসায় কোন মেহমান আসে তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত শোনায়। আর যদি কোন ক্লাবে কোন মেহমান আসে তাহলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাগত জানায়। যদি কোন হোটেলে কোন মেহমান আসে তখন সেখানে মূল্যবান খাবার উপস্থাপন করার মাধ্যমে স্বাগত জানায়। এমনিভাবে মুজাহিদরাও নিজেদেও প্রিয় বস্তু অর্থাৎ যুদ্ধের মহড়ার মাধ্যমে মেহমানদের স্বাগত জানায়। এটা সামাজিকভাবে বহুল প্রচলিত এবং জনগণের স্বভাবগত বিষয়। সমাজিক প্রচলন এবং মানুষের প্রকৃতির সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সমাধান -৩

অস্ত্রমহড়ার মাধ্যমে স্বাগত জানানো এটা যেমন মুজাহিদদের আনন্দ দেয় তেমনি কাফেরদের উপরও ভীতির প্রভাব পড়ে। যদিও তারা স্বচক্ষে এই অস্ত্রমহড়া দেখেনা; কিন্তু তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে। আর মুজাহিদদের খুশিতে কাফেররা জ্বলে পুড়ে মরে।

সমাধান -৪

এমনিভাবে অস্ত্রমহড়ার মাধ্যমে অনেক মানুষ অস্ত্রের সাথে পরিচিত হয়ে উঠে। অনেক নতুন উলামায়ে কেরাম যারা অস্ত্র থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে তাদের মধ্যে অস্ত্রভীতি কাজ করে এই মহড়া তাদের অস্ত্রভীতি দূর করে দেয়। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের মাঝে অস্ত্রের ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিন। আমীন!

সংশয় -৪৬

কেউ কেউ এমনো প্রশ্ন করে যে, নিজের জান ও মালের হেফাযত করা যদিওয়াজিবই হয় তাহলে হযরত আদম আ. এর ছেলে হাবিল কেন নিজের আত্মরক্ষা করেননি? কাবিল যখন তার ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা করল তখন হাবিল বললেন-

لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ

'যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না।'

[সূরা মায়েদা:২৮]

সমাধান -১

রঈসূল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমার অন্তরে যদি আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা হয় তারপরও আমি তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা রাখি না। কিন্তু এর দ্বারা এমন ব্যাখ্যা করা যে, 'তুমি যদি আমাকে হত্যা কর আমি প্রতিহতও করবো না।' এটা একেবারেই ভুল।

সমাধান -২

আর যদি এই আয়াতের উদ্দেশ্য এমনটাই হয়, 'তুমি যদি আমাকে হত্যা কর তাহলে আমি প্রতিহতও করবো না।' তাহলে বলবো এটা আগের শরীয়তের বিধান ছিলো; এখন তা রহিত হয়ে গেছে।

বিঃ দ্রঃ হযরত হাবিলকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে। তিনি জাগ্রত থাকলে অবশ্যই তা প্রতিহত করতেন। এ হিসাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর ব্যাখ্যা সবচেয়ে বেশী চকৎকার।

সংশয় -৪৭

অনেক সময় দেখা যায় কোন এলাকায় শহীদদের মৃত দেহ আনা হলে তার শরীর থেকে সুগন্ধি আসে না। তখন কোন কোন মানুষ প্রশ্ন করে বসে যে, উমুক শহীদ নয়। কারণ, সে যদি সত্যিকারার্থে শহীদ হয়ে থাকে তাহলে তার শরীর থেকে সুগন্ধি আসে না কেন?

সমাধান -১

প্রথমে এটা ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, শহীদের শরীর থেকে সুগন্ধি বের হওয়াটা তার কারামাত। আর কারামাত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস যা বান্দার উপর প্রকাশ পায়। এতে বান্দার কোন হস্তক্ষেপ নেই। একারণে কোন শহীদের শরীর থেকে সুগন্ধি না আসা তার শাহাদাতের মধ্যে ক্রটির কারণ নয়। বরং সর্বোচ্চ এটা বলা যেতে পারে যে, এই শহীদ থেকে কোন কারামত প্রকাশ পায়নি। সুতরাং কারামাত প্রকাশ পায়নি শহীদ ও হয়নি একথা একেবারেই অবাস্তব।

সমাধান -২

দ্বিতীয় কথা হলো, শহীদের শরীর থেকে সুগন্ধি আসাটা শাহাদাত কবুল হওয়ার আলামত নয় এবং সুগন্ধি আসাটা জরুরীও নয়। কারণ, কোন হাদীসে শাহাদাতের ফযীলত সম্পর্কে এটা বলা হয়নি যে, শহীদের শরীর থেকে অবশ্যই কোন সুগন্ধি বের হবে।

সমাধান -৩

শহীদের শরীর থেকে সুগন্ধি আসাতো দূরের কথা, তাঁর শরীরটা শাহাদাতের পর অবিকল বাকি থাকা এবং মাটি না খাওয়াও জরুরী নয়। এটা শুধু আম্বিয়া আ. এর বৈশিষ্ট। আম্বিয়া আ. ছাড়া চাই সে শহীদ হোক অথবা সালেহ-নেককার হোক মাটি যদি তার শরীর খেয়ে ফেলে কিংবা শরীর থেকে কোন সুগন্ধি না আসে তাহলে তার শহীদ এবং ওলী হওয়ার ব্যাপারে নেতিবাচক কোন প্রভাব পড়বে না। এসব কারণে কারো শাহাদাতের ব্যাপারে সন্দেহ না করাই উচিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

সংশয় -৪৮

মুজাহিদদের জন্য এমন আইন করা উচিত, তারা যেনো অস্ত্র নিয়ে মসজিদে প্রবেশ না করে। কারণ, এতে মানুষের অস্ত্রের ভয়ে মসজিদে আসা কমে যাবে। আর মানুষ কম আসার কারণে অস্ত্রবহনকারীরা গুনাহগার হবে। এছাড়াও অস্ত্রের কারণে নামাযে খুশুখুজুর মধ্যে সমস্যা হয় এবং মানুষের অন্তর নামায থেকে অস্ত্রের দিকে চলে যায়।এসব কারণে মাসজিদে অস্ত্র অনা সম্পূর্ণ নিষেধ করা উচিত!

সমাধান -১

আল্লাহু আকবার! দ্বীনের ব্যাপারে কত দরদী অথচ অস্ত্রের ব্যাপারে এত ঘৃণা! প্রকৃতপক্ষে আমরা অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত হওয়া ছেড়ে দেয়ার কারণে আমাদের মনে এই প্রশ্ন জেগেছে। অন্যথায় এই কুমন্ত্রনা অন্তরে কখনো আসতো না।

এই কুমন্ত্রনাকে দূর করার লক্ষ্যে অস্ত্রের এমনভাবে ব্যাপকতা লাভ করা উচিত যেন প্রত্যেক নামাযীর কাঁধ অস্ত্রসজ্জিত থাকে। যেমনিভাবে প্রত্যেক নামাযীর সাথে টুপি ও পাগড়ি থাকে তেমনিভাবে প্রত্যেক নামাযীর কাঁধও যেনো অস্ত্রসজ্জিত থাকে।

এভাবে অস্ত্র ব্যাপক হওয়ার দ্বারা অস্ত্রের প্রতি ঘৃণা ও ভয় উভয়টাই কমে যাবে। এরপর কোন নামাযী অস্ত্রের কারণে জামাতে আসা ছাড়বে না এবং তার খুশুখুজুতেও কোন সমস্যা হবে না। কারণ, কোন জিনিস যদি ব্যাপকতা লাভ করে, তার থেকে ঘৃণা ও ভয় দূর হয়ে যায়।

আপনি দেখুন, বর্তমানে পাকিস্তানে বিভিন্ন গোত্রের মানুষের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র আছে। কই তাদের তো জামাতে লোকজন কম হয় না? তাদের খুশুখুজুতেও কোন প্রভাব পড়ে না।

এখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কি মানুষকে অস্ত্রের কারণে সমস্যা হওয়ার কথা বলব? না মানুষকে অস্ত্র নিয়ে নামায পড়তে উৎসাহিত করবো?

একটি উদাহরণ

এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায় যে, মনে করুন আমাদের এলাকায় কোন মাওলানা বা মুজাহিদ আসলেন। তার দাড়ি দেখে বাচ্চারা ভয়ে চিৎকার শুরু করল। এখন এ সমস্যার সমাধান দু'ভাবে হতে পারে। একটাতো নাউজুবিল্লাহ! যা কোন ক্রমেই জায়েয হবে না। সেটা হলো, যাদের দাড়ি আছে তাদের দাড়ি ফেলে দেয়া। দ্বিতীয় সমাধান হলো, এলাকাবাসী সবাই দাঁড়ি রেখে দেয়া। যাতে শিশুরা দাঁড়ি ওয়ালাদের দেখলে ভয়ে চিৎকার না করে।

একটা ঘটনা শুনেছি, এর সত্যতা কতটুকু জানি না। আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এক বৃটিশ খৃষ্টান আফগানিস্তানে আসলে বাচ্চারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। এবং বাচ্চারা তাকে নিয়ে এই বলে দুষ্টামী করতে লাগলো যে, এটা আবার কোন ধরনের প্রাণী! তখন বাচ্চাদের দুষ্টামীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেয় হয়, দুনিয়াতে দাড়িহীন পুরুষ আছে এটা তাদের কল্পনাতেই আসেনি। একারণে তারা তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে তুমি পুরুষও না মহিলোও না। এজন্যই তারা তোমার সাথে একটু দুষ্টমী করেছে।

এখন এ ব্যাপারে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের আমল দেখবো তাহলে আমাদের কাছে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অস্ত্র আনার আদব বর্ণনা করেছেন। হাদীছে শরীফে এসেছে-

سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرفي شيء من مساجدنا أوأسواقنا بنبل فليأخذعلى نصالها لايعقربكفه مسلما.

الصحيح للبخاري: ٦٤/١ -بابالمرور فيالمسجد. رقم الحديث:٤٥٢

- الصحيح لمسلم ٣٢٨/٢ -باب أمرمن مرّبسلاح فى مسجدأوسوق أوْغيرهمامن المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. رقم الحديث:٦٦٢٢ - صحيح ابن حبان: ٥٢٧/٤ باب المساجد. رقم الحديث:١٦٤٩

হযরত আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের কোন মসজিদে আসবে অথবা বাজারে আসবে সে যেন তীরের অগ্রভাগ বেঁধে নেয়। যাতে কোন মুসলমান হতাহত না হয়। [সহীহ বুখারী:১]

সমাধান -৩

এমনকি রাসূল এর পবিত্র যমানায় মসজিদে অস্ত্র দান করা হত।

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها وقال ابن رمح كان يصدق بالنبل .

- صحيح مسلم:٣٢٨/٢ باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها. رقم الحديث:٦٦٢٠

- مسند أحمد : ١٤٧٨١ مسند جابر بن عبد الله . - سنن أبي داؤود : ٣٤٩/١ باب في النبل يدخل به المسجد .

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত জনৈক সাহাবী মসজিদে তীর সদকা করছিলেন। তখন রাসূল বললেন, তার অগ্রভাগ ধরে রেখ যাতে কেউ যখম না হয়। এমনকি রাসূল ঈদুল আযহার খুতবা কামানের উপর ভর করে দিয়েছিলেন।

[মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক-৩]

সমাধান -৪

আরেকটু অগ্রসর হলে আমরা দেখি, রাসূল এর মুবারক সময়ে সাহাবায়ে কিরাম রা. মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. বলেন-

عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير : "أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم ."

- صحيح البخارى: ٦٥/١ باب أصحاب الحراب في المسجد ٦٥/١ رقم الحديث:٤٥٤، ٤٥٤ - مسند أحمد : ٣٦٠/١٧ رقم الحديث: ٢٤٤١٤،

'আমি একদিন দেখলাম, রাসূল ﷺ আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। হবশার লোকেরা মসজিদে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো। আর তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছিলেন।'

সমাধান -৫

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যেসব অঞ্চল জিহাদের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে সেখানের খতিবগণের উচিত তলোয়ার হাতে নিয়ে খুতবা দেওয়া। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, এঅঞ্চল তলোয়ারের মাধ্যমে বিজয় হয়েছে। আর যারা ইসলাম থেকে ফিরে যেতে চায় তারা যেন এই চিন্তা করে যে, মুসলমানদের হাতে এখনো তলোয়ার আছে এবং এই তলোয়ার ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করে দিবে।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরী-খন্ড:১ পৃষ্ঠা:২০৯)

এখন যদি আলেম-উলামা এবং সুলাহাগণ খুতবায় তলোয়ার হাতে নেয়ার স্থলে তলোয়ারকেই ইসলামের জন্য অপমান জনক মনে করেন, তলোয়ারকে আখলাক এবং যুহুদ ও তাক্‌ওয়ার পরিপন্থি ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের জন্য এটাকে প্রতিবন্ধক মনে করেন তাহলে তো পৃথিবীতে কুফুর ও নাস্তিকতার সয়লাব চলতেই থাকবে। এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

সম্মানিত পাঠক! আসুন আমরা চেষ্টা করি, দোয়া করি, আল্লাহ যেন মুসলমানদের অন্তরে অস্ত্রের এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন যেমন জীবিত থাকার জন্য আমাদের মাঝে জীবনের মায়া ও মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমীন!

সংশয় -৪৯

আমরা যদি আমাদের সাথে তলোয়ার নিয়ে চলাফেরা করি তাহলে ইসলামের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে খারাপ চিত্র ফুটে উঠবে এবং ইসলামের ব্যাপারে মানুষের ঘৃণা ও অবহেলো জন্ম নিবে। যার ফলে কাফেররা এটা বলার সুযোগ পাবে যে, ইসলাম একটি সভ্যতাহীন মারামারির ধর্ম? সুতরাং এব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক এবং সাবধান হওয়া উচিত!

সমাধান -১

আমাদের জন্য প্রতিটি বিষয়ে রাসূল ﷺ এবং সাহাবীগণের আমলই প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট। রাসূল ﷺ সর্বাধিক বাহাদুর হওয়া সত্তেও নিজের সাথে অস্ত্র রাখতেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার মদীনাতে রাত্রিবেলা বিকট আওয়াজের কারণে লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আওয়াজের দিকে ছুটতে লাগলো। কিন্তু সেখানে সবার অগ্রে ছিলেন রাসূল ﷺ। তিনি লোকদেরকে শান্তনা বাণী শোনাতে লাগলেন। এসময় রাসূল ﷺ হযরত আবু তালহা রা. এর গদিবিহীন ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। তখন তাঁর গর্দান মোবারকে তলোয়ার ঝুলন্ত ছিলো। [সহীহ বুখারী-১/৪০৭]

এবার আমরা এব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের আমল কি ছিলো তা দেখার চেষ্টা করবো।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. বন্দিবিনিময় চুক্তির ব্যাপারে রোম সম্রাটের নিকটে গেলেন। যখন তিনি সম্রাটের বাসভবনের নিকট পৌছলেন তখন কাফের সেনাপতি বললো, আপনি সম্রাটের বসভবনের নিকট চলে এসেছেন। অতএব আপনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ুন এবং তলোয়ারটি জমা রাখুন। তখন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. উত্তর দিলেন, ঘোড়া থেকে নেমে যাবো; কিন্তু আমরা কখনো তলোয়ার জমা দিতে পারবো না। কেননা তলোয়ারেই রয়েছে আমাদের সম্মান। আর কেনইবা আমরা সেই সম্মানকে অবহেলো করবো যা নিয়ে আমাদের নবী প্রেরিত হয়েছেন?

[ফুতুহুশ শাম]

মিশর বিজেতা হজরত আমর ইবনুল আস রা. যখন তলোয়ার নিয়ে রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করতে লাগলেন তখন নিরাপত্তাকর্মীরা তার গর্দান থেকে তলোয়ার নিয়ে নিতে চেষ্টা করলে তিনি বলেন, আমি এখান থেকে ফেরত যেতে পারবো; কিন্তু তলোয়ার হাতছাড়া করে আন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারব না ।
তোমরা তো জানো না আমরা সে সবলোক যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের মাধ্যমে সন্মান দান করেছেন। ঈমান দ্বারা সাহায্য করেছেন। তলোয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং মজবুত করেছেন। আর এটা হচ্ছে সেই তলোয়ার যার মাধ্যমে আমরা মুশরিক এবং অহংকারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করে থাকি। [ফুতুহুল মিস্‌র]

সমাধান -২

যদি আমরা অস্ত্র ধারণ করা ছেড়ে দেই এবং অস্ত্র ছাড়া চলাফেরা করি তাহলে কাফেরদের মনের আকাংখা ও কামনা-বাসনা পূর্ণ হবে। যেমন কুরআন কারীম আমাদের প্রতিনিয়ত চিৎকার দিয়ে বলছে-

"وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً"

'কাফিররা কামনা করে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে আক্রমণ করবে।'

[সূরায়ে নিসা:১০২]

এ কারণে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

"وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ"

'মুসলমানরা যেন সতর্ক হয় এবং অস্ত্র ধারণ করে।' [সূরায়ে নিসাঃ ১০২]

এখন আমাদের চিন্তা করা দরকার, বর্তমান সময়ে আমরা কি অস্ত্রহীন জীবন-যাপন করে আল্লাহকে খুশী করছি? না কাফেরদের মনের আশা পূরণ করছি? বিষয়টা শুধু এখানেই শেষ নয়। কুরআন কারীম আমাদের বলছে, কাফেররা ততদিন পর্যন্ত তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না যতদিন তোমরা তাদের দ্বীনের অনুসারী না হবে। তাদের ধর্মমত গ্রহণ না করবে।

সমাধান -৩

আমি বলছি, আমাদের মধ্যে কাপুরুষতার রোগ অনেক বেড়ে গেছে। আমরা যদি সত্যিই আমাদের এ রোগ দূর করতাম এবং নিরাপত্তা লাভ করতে চাইতাম তাহলে অবশ্যই আমাদের একমাত্র পথ ছিলো যুদ্ধ-জিহাদের পথ বেছে নেয়া। কেননা বীরত্ব-বাহদুরী যার আছে সে কোন দরবারের দান দক্ষিণাও অনুদানের প্লেট বন্টনের অপেক্ষায় থাকে না। বরং সে নিজেই প্লেট বন্টনকারী হয়ে যায়।

এজন্য মুহতারাম দোস্ত-বুযুর্গ! আসুন আমরা সে পথে ধাবিত হই যে পথের দিশা দিয়েছেন আমাদের প্রাণের নবী রাসূল ﷺ। আল্লাহ আমদের সবাইকে জিহাদে যাওয়ার তাওফীক দিন এবং আমাদের কাপুরুষতা দূর করে দিন। আমীন!

মহা মনীষীদের অমর বাণী

হযরত আমর ইবনে আস রা. বলেছিলেন, তোমরা হয়তো জানো না আমরা সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। ঈমান দ্বারা সাহায্য করেছেন। তলোয়ারের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত এবং মজবুত করেছেন। আর এটা হচ্ছে সেই তলোয়ার যার মাধ্যমে আমরা মুশরিক এবং অহংকারীদের মস্তিষ্ক ঠিক করে থাকি।

➤হযরত আমর ইবনুল আস রা.(ফুতুহুল মিস্‌র)

তোমরা হয়তো জানো না আমরা সেই বাহাদুর জাতি যারা নিজেদের তলোয়ার অন্যদের কাছে হস্তান্তর করি না। তোমরা ভালোভাবে জেনে রেখো! আমাদের নবীকে তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমাদেরকে আমাদের নবী এ তলোয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ আমাদের যে সম্মান দিয়েছেন, আমরা তা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।

➤হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. [ফুতুহুশ শাম]

আমি জানি না ইসলাম তলোয়ারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা হয়েছে নাকি উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে? তবে ইসলাম রক্ষার জন্য আমি তলোয়ার হাতে নেয়া আবশ্যক মনে করি।

➢সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.

সবমানুষের চিন্তাধারা এক নয়। কারো চরিত্র সংশোধনের জন্য আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন। আর কারো চরিত্র সংশোধনের জন্য লোহা-ডান্ডা নাযিল করেছেন।

➢আল্লামা ইদরীস কান্দলভী রহ.

সংযোজিত

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস দুইভাবে লিখা হয়েছে- এক. শহীদের রক্ত দিয়ে দুই. কলমের কালি দিয়ে।

➢শহীদ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.

যদি তোমাদের বাকস্বাধীনতার কোন সীমা না থাকে; তাহলে আমাদের কর্মস্বাধীনতার জন্য তোমাদের বক্ষ উন্মোচন করে দাও।

➢শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

আমেরিকা ততদিন পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না; যতদিন পর্যন্ত আমাদের ফিলিস্তিনী ভাইয়েরা শান্তিতে ঘুমোতে না পারে এবং সকল কুফুরী শক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভূমি [জাযিরাতুল আরব] থেকে বের হয়ে না যায়।

➢শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

যদি সম্পূর্ণ আফগান ভূমিও উল্টে যায়, আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাই, আমার বংশের একটি সন্তানও না বাঁচে; তবুও উসামাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করব না। একজন মুসলিমকে কোন কাফেরের হাতে তুলে দেওয়া আমার আত্মমর্যাদা কখনো বরদাশত করবে না।

➢আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ.

তোমরা আমাকে বল! যদি আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত করেও আমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসে; তবুও কি তাদের শক্তি আল্লাহর শক্তিকে অতিক্রম করতে পারবে? আমরা তো একমাত্র আল্লাহর শক্তিতেই যুদ্ধে বিজয় লাভ করি। বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত, তাবুক থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে এটাই বলে।

➤আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ.

বর্তমান জিহাদ পুনরায় প্রমাণ করে দিলো যে, মুগুর ছাড়া কুকুর দমন করা যায় না: পৃথিবীর বুকে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদের কোনই বিকল্প নেই।

➤আমীরুল হিন্দ মাওলানা আসেম উমর হাফি.

আমেরিকা এবং তাদের অনুগামী মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি! তোমরা আমাদের মুজাহিদ ভাইদের শাহাদাতে খুশি হয়ো না। কারণ, তাদের শাহাদাত অচিরেই এমন আগুন হয়ে প্রকাশ পাবে; যা তোমাদের পুড়িয়ে ভস্ম করে দিবে এবং এমন আলো হয়ে প্রকাশ পাবে; যা আমাদের জন্য বিজয়ের পথ আলোকিত করবে।

➤শহীদ শায়েখ আনীস রহ.

উসামার [রহ.] শাহাদাতে ইতিহাস খতম হয়ে যাবে না। আমেরিকা কালও যালেম ছিলো আজো যালেম। আমেরিকা কালও ঘাতক ছিলো আজো ঘাতক। আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে; যতদিন না আমেরিকা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হতে পারে আমাদের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র নেই; ক্লাশিনকোভ নেই; কিন্তু আমাদের আছে শামেলীর মুজাহিদদের সিনা, আকাবিরে দেওবন্দের সিনা এবং আযাদীর ইতিহাস রচনাকরী বীর পুরুষদের সিনা। শুনে রাখ! তোমাদের অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্র ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু আমাদের সিনা থাকবে চির অক্ষত।

➤মুফতী কিফায়েতুল্লাহ, পাকিস্তান

সংশয় -৫০

অত্যন্ত নির্লজ্জতা এবং হটকারীতার সাথে অনেক সাথীরা এমন বলে যে, আলহামদুল্লিাহ! দুনিয়াতে এখন জিহাদ ছাড়াই ইসলাম প্রচার হচ্ছে। কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করছে। সুতরাং বর্তমানে জিহাদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই; বরং জিহাদই এখন ইসলাম প্রচারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, কাফেররা বলে, ইসলাম অনেক সুন্দর ধর্ম-শান্তির ধর্ম। এতে অনেক সুন্দর সুন্দর বিধান রয়েছে; কিন্তু তার পরেও যুদ্ধ করা এবং মারামারী করা এগুলোতো ঠিক নয়! এগুলোকে আমরা বর্বরতা মনে করি এবং ঘৃণা করি।

সমাধান -১

কিছু মানুষের এককভাবে ইসলাম গ্রহণ করাকে ইসলামের বিজয় নামে অভিহিত করা দূরে থাক এটাকে ইসলামের প্রচারও বলা চলে না। ইসলামের প্রচার ও প্রসার সেটাই যা কুরআনে বর্ণিত আছে-

"إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا"

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে; তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।'

ইসলাম বিজয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা হলো, কুফুর না থাকা। আর যদি কুফুর থাকে, তাহলে কর ও ট্রেক্স দেয়ার মাধ্যমে জীবন ভিক্ষা চেয়ে কাফেররা অপমানের সাথে জীবন-যাপন করবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

"حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ"

'তারা যেন নত স্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া-কর আদায় করে।' [সূরায়ে তাওবা:২৯]

আপনাদের উত্থাপিত প্রশ্নটা ঐ প্রতারক যাকেরীন ফেরকার মতো যারা বলে নামাজের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'য়ালার জিকির করা। আল্লাহকে স্মরণ করা। কারণ, পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

'তোমরা নামায কায়েম কর আমার স্মরণে।' [সূরায়ে ত্বহা:১৪]

সুতরাং যখন নামায ছাড়াই আল্লাহর জিকির হয়ে যায় তাহলে অযু, গোসল, কিয়াম, ক্বিরাত, রুকু, সিজদা এবং ইমামের প্রয়োজন কিসের? এগুলো করা জনগণের অর্থ ও সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এতো কিছু বাদ দিয়ে শুধু জিকির করলেই তো আল্লাহর স্মরণ হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক!

আমরা সেইসব লোকদের কাফের বলি যারা জিহাদকে অস্বীকার করে। কিন্তু যারা জিহাদকে অস্বীকার করে না; বরং বিভিন্ন ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিজেদেরকে দ্বীনের ভালোবাসার দাবিদার ও ঠিকাদার মনে করে, তাহলে প্রতারক যাকেরীন ফেরকার যে হুকুম হবে এমন দ্বীনদারদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে।

সমাধান -২

মূলকথা হলো, শরীয়ত আমাদের উপর জিহাদ কেন ফরয করেছে এবং আমরা কোন দু:খে কাফেরদের সাথে জিহাদ করছি! এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমরা যদি কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের সমন্বয়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করি তাহলে সব প্রশ্নের সঠিক সমাধান পেয়ে যাব ইনশাআল্লাহ!

এ বিষয়ে মাওলানা ফজল মুহাম্মদ রচিত "ফিতনায়ে ইরতিদাদ আওর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" একটি চমৎকার গ্রন্থ। গ্রন্থটির এক জায়গায় তিনি শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে-

কাফেরদের সাথে আমরা কেন জিহাদ করছি?

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার গোলাম আর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মালিক। যে সবমানুষ আল্লাহকে মানে না এবং ইবাদত করে না; বরং প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে, কুফুর-শির্ক এবং নাস্তিকতাকে নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস হিসাবে লালন করে। এসব লোক মানুষের কাতার থেকে পশুর কাতারে চলে যায়। তাই ইরশাদ হয়েছে-

"أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ"

'তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারচেয়ে আরো অধিক নিকৃষ্ট।'[সূরায়ে আরাফ:১৭৯]

অর্থাৎ তারা যেহেতু পশুর চেয়েও অধম হয়ে গিয়েছে তাই আল্লাহর পক্ষ হতে মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- ঐসব খোদাদ্রোহীদের জীবন

হায়ওয়ান-জানোয়ারের মতো হয়ে গেছে। সুতরাং পশু-প্রাণীকে যেমন জবাই করা জায়েয আছে, ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে এবং ঘরের সেবা ও কাজ কর্মে লাগানো জায়েয আছে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'য়ালা ঐসব খোদাদ্রোহীদের জান-মালের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সেই একই রকম অনুমতি দিয়েছেন। এসব লোকেরা আল্লাহদ্রোহী হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হত্যা ছাড়াও গোলাম-বাঁদী হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয করে দিয়েছেন। তাদের সমুদয় সম্পত্তি দখল করে নেয়া বৈধ করে দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো এসব কাজ জিহাদের ঘোষণার মাধ্যমে হতে হবে।

উসূলে ফিকাহবীদরা এই মাসআলাটিকে গোলাম বানানোর কারণসূমহের মধ্যে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ

এর দৃষ্টান্ত হলো, যেমন একটি রাষ্ট্রে বিদ্রোহ হওয়ার পর সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি গ্রুপ সরকারের বিপক্ষে চলে গেলো, আরেকটি গ্রুপ সরকারের আনুগত রয়ে গেলো। তখন সরকার তার পক্ষের সেনাহিনীকে আদেশ দিলো, তোমরা বিদ্রোহীদের হত্যা কর। সবরকমের শাস্তির ব্যাবস্থা কর। তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত কর এবং তাদের নিঃশেষ করে দাও।

এ আদেশের পর সরকারীবাহিনী জীবনবাজী রেখে লড়াই করে যখন বিদ্রোহীদের দূর্গ শেষ করে দেয় তখন পৃথিবীবাসী সেটা সমর্থন করে ও বাহ্‌বাহ্‌ দিয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসলমানরাও আল্লাহর ওয়াফাদার-অনুগত সৈনিক। তাঁদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ রয়েছে, তোমরা আল্লাহদ্রোহী কাফের-মুরতাদদের হত্যা কর। তাদের জান-মাল স্ত্রী-সন্তান তোমাদের জন্য হালাল। তোমরা তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখ। কেননা এরা আমার গোলাম ছিলো; কিন্তু এরা আমার অবাধ্যতা এবং নাফরমানীর কারণে এখন তোমাদের গোলামে পরিণত হবে।

এবার একটু আগের কথায় ফিরে আসি। যদি বিদ্রোহী সেনারা সরকারী সেনাদের হত্যা করে অথবা বন্দি করে তখন তারা একটা জোরালো দাবী উত্থাপন করতে পারে এই বলে যে, আমাদেরকে কেনো মারা হচ্ছে? কিন্তু যদি কাফেরদের হত্যা করা হয়। তাহলে আঈন অনুযায়ী তাদের চিৎকার করার এবং দাবী জানানোর কোন অধিকার নেই। কারণ, আল্লাহদ্রোহী হওয়ার কারণে সেইসব দাবী-দাওয়া উত্থাপন করার অধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছে।

ইমামুল মাকুলাত ওয়াল মানকুলাত, শয়খুত তাফসীর মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. বলেছেন, অবশ্যই উপদেশের একটা প্রভাব আছে। তবে যাদের সুস্থ মস্তিস্ক ও সুস্থ বিবেক রয়েছে তাদের জন্যই উপদেশ ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

কিন্তু বক্র স্বভাবের লোকদের কাছে আপনি যতোই ইখলাস-আন্তরিকতার সাথে দরদমাখা উপদেশ করেন না কেন সেটা কখনো তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলবে না।

মানুষের চিন্তাধারা এক নয়। এজন্য আল্লাহ তা'য়ালা কারো সংশোধনের জন্য কিতাব নযিল করেছেন আর কারো সংশোধনের জন্য লোহা-ডান্ডা নাযিল করেছেন।

সংশয় -৫১

শুধু এই শতাব্দিতে নয় বরং প্রত্যেক শতাব্দিতে ইসলামকে নিয়ে বড় বড় প্রশ্ন গুলোর মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিলো এই- জিহাদের ফলাফলের দিকে তাকালে আমরা দেখি, জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে অপমান করা হয় এবং ব্যক্তি স্বাধিনতা হরণ করা হয়। কারণ, জিহাদের মাধ্যমে পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়ে পশু-প্রাণীর মতো হাঁট-বাজারে বিক্রি করা হয়। তাদের থেকে সেবা নেওয়া হয়। ব্যক্তি স্বাধিনতা শেষ করে দেয়া হয়। মহিলোাদেরকে দাসী ও সেবিকা বানানো হয় এবং বিবাহ ব্যতিত তাদেরকে নিজ নিজ হেরেম ও শয়নকক্ষে রেখে ব্যবহার করা হয়। এগুলোতো মনবতা ও মনুষত্বের অপমান ছাড়া বৈ কিছুই নয়!

সমাধান -

আমি নিজ থেকে কিছু বলার চেয়ে শাইখুল মাকুলাত ওয়াল মানকুলাত শাইখুত তাফসীর মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. এর কিতাব "সীরাতে মুস্তফা" এর ২য় খন্ড থেকে এর উত্তর হুবহু উদ্ধৃত করছি।

ইসলামও গোলামের মাসআলা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সম্মান মানুষকে দিয়েছেন তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেননি। নিজের বিষেশ সিফাতে কামালিয়া, যেমন শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বাকশক্তি, ইচ্ছাশক্তির বহিরপ্রকাশের কেন্দ্র বানিয়েছেন সৃষ্টিজীবকে। মানুষকে

স্বীয় খেলাফত এবং প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। ফেরেস্তাদের সিজদার পাত্র বানিয়েছেন। মোটকথা সমস্ত সৃষ্টিজীব থেকে তাদেরকে অধিক সম্মান দিয়েছেন। এমনকি অভিশপ্ত ইবলিস ও বলেছে- هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ আপনিতো এই আদমকে আমার উপর সম্মানিত বানিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্রপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য।

মানুষকে সৃষ্টি করে সেই স্বাধিনতা ও শাসনক্ষমতা দান করেছেন যে, সারা পৃথীবি তাকে পরিচালনার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রেখে। তাই ইরশাদ হয়েছে-

"هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْض جَمِيعاً"

'তিনি সেই সত্তা যিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যানে-ই সৃষ্টি করেছেন।'
[সূরায়ে বাকারা:২৯]

কিন্তু যখন এই মুর্খ ইনসানগুলো নিজের সৃষ্টি কর্তার ওয়াজিব আনুগত্যকে অস্বিকার করেছে অথবা কুফুরির মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছে এবং নবী-রাসূলদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে যুদ্ধাস্থলে চলে এসেছে তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সৃষ্টিগতভাবে যতটুকু ইজ্জত-সম্মান দিয়েছেন সবটুকু যেন সে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। ফলে যে স্বাধিনতা দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই স্বাধিনতা নিমিশেই তার থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার নেককার বান্দারা যারা তার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছেন তাদের গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে তাদের মালিক বনিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এই অধিকারও দিয়েছেন যেমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তু এবং মালিকানাধীন সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয় করতে পার তেমনিভাবে এদেরকেও ক্রয় বিক্রয় এবং বন্ধক রাখার অনুমতি আছে। এরা তোমাদের অনুমতি ব্যতিত সেচ্ছায় কোন জিনিসে পরিবর্তন করতে পরবে না। এরা তোমাদের গোলাম।

অপরাধ হিসাবেই অপরাধের শাস্তি নির্নয় করা হয়। অপরাধ যে পরিমান হবে শাস্তিও সেই পরিমান হবে।

বর্তমানে যিনা এবং চুরির শাস্তি মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী থাকে। এর পর অপরাধী মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু যে বিদ্রোহ করে; তার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা হয় না। কারণ, সে রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রের অস্বিকারকারী এবং রাষ্ট্রীয় আইন লংঘনকারী। তেমনিভাবে যে আল্লাহদ্রোহী-নাস্তিক তাকেও কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না। এজন্য কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

"إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"

'নিশ্চই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সাথে শিরিক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। আর শির্ক ছাড়া যত গুনাহ আছে, যাকে ইচ্ছা তার সবগুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।'

[সূরায়ে নিসা:৪৮]

কাফের-নাস্তিক এবং অস্বিকারকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্যতা এবং তাঁর নাযিলকৃত আঈন-কানুন ও বিধি-বিধান পালন করাকে আবশ্যক মনে করে না। নিজেদেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে সবীমাবদ্ধ রাখার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এ কারণেই এরা আল্লাহদ্রোহী। এখন যদি স্বভাবজাত ও চারিত্রিক গুণগতভাবে তাদের থেকে এমন কোন আমল প্রকাশ পায়। যা শরীয়তের আওতায় চলে আসে। তবুও এটাকে আনুগত্য এবং অনুসরণ বলা যাবে না। বরং এটা বহ্যিক দৃষ্টিতে শরিয়তের সাথে মিল হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা বিদ্রোহ এবং বিরোধিতার শমিল। এটা সুস্পষ্ট কথা যে অবাধ্যতা এবং আক্বিদাগত ক্রটি বিচ্যুতি থাকার কারণে বাহ্যিকভাবে কোন কিছুর স্বাদৃশ্য হলে ও সেটার কোন গ্রহণ যোগ্যতা থাকে না।

একারণেই ঈমান এবং আত্মসমর্পন ব্যতীত আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়া অসম্বভ। সমস্ত ভালো কাজ, মানবতা এবং উত্তম চরিত্র ঈমান ব্যতীত কোন কাজে আসবে না।

কিন্তু মু'মিন গুনাহগারের ব্যাপারটা ভিন্ন। তার যদিও কোন ক্রটি-বিচ্যুতি থাকে তবে সেটা সম-সাময়িক। কারণ, সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্যকে জরুরী মনে করে। যখন তার থেকে কোন গুনাহ প্রকাশ পেয়ে যায় তখন সে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে নিজের দুর্বলতা এবং অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চায়। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ"

'অবশ্যই একজন মুমিন একজন মুশরিকের চেয়ে অনেক উত্তম। যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। কারণ, এরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে।'

[সূরায়ে বাকারা: ২২১]

একজন নিষ্ঠাবান জীবন কুরবানকারী ও অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিকে বিদ্রোহী এবং গাদ্দারের সমান মনে করা বিবেক-বুদ্ধি, মানবতা এবং রাষ্ট্রিয় আইনগতভাবেও জুলুম। যেই রাষ্ট্রে নিরপরাধ এবং অপরাধীকে একরকম মনে করা হয় সেটা আবার কোন ধরনের সভ্য রাষ্ট্র! আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ"

আমি কি আনুগত্যশীল বান্দাদেরকে পাপী-অপরাধীদের মতো বানিয়ে দিব? তাদের মাঝে কি কোন পার্থক্য হবে না? অবশ্যই হবে। [সূরায়ে কলাম: ৩৫]

সব সরকারই রাষ্ট্রদ্রোহী এবং বিদ্রোহীদের অপরাধের শাস্তি চোর-বদমাশ ও ধোকাবাজদের থেকে একটু বেশীই দিয়ে থাকে।

যার বিরুদ্ধে রাষ্টদ্রোহী অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড কিংবা আজীবন কারাবন্দি। এখানে চোর-ডাকাত এবং রাষ্ট্রদ্রোহী সবাই অপরাধী। সবার মাঝেই যথেষ্ট পরিমান নাফরমানী এবং অবাধ্যতা রয়েছে। কিন্তু তারপরেও রাষ্ট্রদ্রোহীর অপরাধটা যতো বড় চোর-ডাকাতীর অপরাধটা কিন্তু ততো বড় নয়। তার কারণ হলো, চোর-ডাকাতের হস্তক্ষেপটা হয়ে থাকে কারো ব্যক্তিগত সম্পদের উপর। আর রাষ্ট্রদ্রোহীর চিন্তাও পারিকল্পনা হলো পুরো একটা দেশ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এজন্যই পৃথিবীর যে কোন সভ্য সরকারের নজরে রাষ্ট্রদ্রোহীতার চেয়ে আর কোন বড় অপরাধ নেই। রাষ্ট্রদ্রোহীতার তুলনায় তাদের নজরে ডাকাতী যেন অপরাধই না।

এই অনর্থক ও ভিত্তিহীন রাজনীতির অজুহাতে যদি রাষ্ট্র প্রধান বিদ্রোহীদের সব অধিকার হরণ করার অধিকার রাখে তাহলে উভয় জাহানের সৃষ্টিকর্তা মাহান রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত স্বাধীনতা সেই কাফের বিদ্রোহীদের থেকে উঠিয়ে নেয়ার অধিকার থাকবে না কেনো? এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

সারকথা

গোলামী জিবনটা মূলত আল্লাহদ্রোহী এবং কুফুরীর শাস্তি। তাওরাত, ইঞ্জিলেও এর আলোচনা পাওয়া যায়। বরং পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যাতে গোলাম বাঁদীর মাসআলা নেই। এতে বুঝা যায় যে, গোলাম বাঁদীর মাসআলার বিষয়ে সকল ধর্ম ঐক্যমত এবং এটি একটি সর্বজন স্বীকৃত।

গোলাম বাঁদীর মাসআলা যদি 'কবিহ লি যাতিহি' হত তাহলে কোন শরীয়তে এটা জায়েয হতো না। তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে বুঝা যায় হযরত ইবরাহীম আ. থেকে হযরত ঈসা আ. পর্যন্ত সকল নবী গোলাম বাঁদীকে জায়েয রেখেছেন।

নাউযুবিল্লাহ! যদি গোলাম-বাঁদী 'কবিহ লি যাতিহি' হতো, এতে কোন অমানুষত্য থাকত অথবা এটা কোন লজ্জাজনক বিষয় হতো কিংবা ফিতরতের বহির্ভূতকাজ হতো তাহলে রাসূল ﷺ মারিয়া ক্বিবতিয়া রা. কে বাঁদী হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর থেকে হযরত ইবরাহীম রা. জন্ম লাভ করেছেন। তবে কি নাউযুবিল্লাহ! রাসূল ﷺ "কবিহ লি যাতিহী" কাজে লিপ্ত ছিলেন? ফিতরতের বহির্ভূত কাজ করেছেন? কোন রকমভাবে যদি বিষয়টা আমরা মেনেই নিলাম যে, হযরত আম্বিয়া আ. থেকে এগুলো ইজতেহাদি ভুল হয়েছে তাহলে প্রশ্ন জাগে মহাজ্ঞাণী ও সর্বশক্তি মান আল্লাহ তা'য়ালা কেন অহীর মাধ্যমে সতের্ক করেননি।

ইসলামপূর্ব সময়ে কোন জাতী-গোষ্ঠী এমন ছিলো না যাদের মাঝে গোলাম-বাঁদীর প্রথা ছিলো না। ইসলাম এসে গোলাম-বান্দি প্রথাকে বৈধ রেখেছে এবং তাদের সাথে যে সকল অমানুষিক আচরণ করা হতো সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। মালিকদের অধিকারসমূহ নির্ধরণ করে দিয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্নভাবে তাদেরকে আজাদ ও মুক্ত করার পথ বলে দিয়েছে ফিক্বহ ও হাদীসের কিতাবসমূহে।

হ্যাঁ, ইসলাম গোলাম-বাঁদীর প্রথাকে বন্ধ করেনি। কারণ, এটা মূলত আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বিদ্রোহী এবং কুফুরীর শাস্তি। যতদিন এই পৃথিবীতে কুফুরও শির্ক থাকবে ততদিন গোলামের প্রথাও বাকী থাকবে এবং থাকাটাই বাঞ্চনীয়। যেখানে অন্যায় অপরাধ আছে সেখানে শাস্তি কেন থাকবে না? শরীয়ত অসল গোলামীকে বাকী রেখে সকল ক্ষতিকর দিক গুলিকে শুধরিয়ে দিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গোলামী একটি লাঞ্চনার বিষয়। কিন্তু কুফুরও শিরিক এর

থেকেও অনেক বেশী লাঞ্ছনাকর এবং অপমান জনক। প্রত্যেক গুনাহের ক্ষতিকর দিকসমূহ সীমিত। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বিদ্রোহ করা এবং নাফরমানী করার ক্ষয়-ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কোন সীমা-রেখা নেই। এজন্য-ই কুফুরীর শাস্তি চিরস্থায়ী আজাব। আর ঈমানের উপহার চিরস্থায়ী সওয়াব-জান্নাত। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো কুফুরকে লাঞ্ছনা করা।

চুরি ভ্যাবিচারী উদ্দেশ্য হলো লোভ এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আর আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বিদ্রোহীর করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং অহংকার করা। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (سورة البقرة- ٣٤)

'সে অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে তাই সে কাফের হয়ে গেছে।'

[সূরায়ে বাকারা:৩৪]

প্রথমেই এ আলোচনা করা হয়েছে, অপরাধ যে পরিমান হবে শস্তি ও সে পরিমান হবে। তাহলে যার লক্ষ উদ্দেশ্য হলো সত্তাকে অস্বীকার করা এবং অহংকার করা তার শাস্তি হবে একমাত্র লঞ্চনা এবং অপদস্ততা। আর সেই লঞ্চনা এবং অপদস্ততা প্রকাশ পায় গোলামী করার মাধ্যমে। এজন্য খোদাদ্রোহীদের শাস্তি নির্ণয় করা হয়েছে গোলামী। তাই ইরশাদ হয়েছে-

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا

'মন্দ কাজের শাস্তি মন্দকাজের সমপরিমণ।' [সূরায়ে শুরা: ৪০]

আর যে সবলোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর পথে জীবনবাজী রেখে লড়াই করেছে; আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সম্মান বড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদেরকে অহংকারী এবং খোদাদ্রোহীদের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

"وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ"

'সম্মান একমাত্র আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনের জন্যই। কিন্তু মুনাফেকরা সেটা জানে না।'
[সূরায়ে মুনাফিকুন:৮]

যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে ভলো-মন্দ, ঈমান-কুফুর এবং মুমিন-কাফেরের মাঝে প্রার্থক্য করার পক্ষে তার জন্য এসব বিষয়কে মেনে নেয়া সহজ এবং তার মনে কোন রকমের প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি হয় না। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি একেবারেই ভালো-মন্দ, মুমিন ও কাফেরের মাঝে কোন প্রার্থক্য বিশ্বাস করে না তার সাথে আমাদের কোন কথা নেই। সে তো মানুষই না বরং আস্ত একটা হায়ওয়ান-জানোয়ার।

কুরআনের পনের জাগায় বাঁদীর আলোচনা

কোরআনে কারীমে "مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ" বাক্যটি পনের জায়গায় এসেছে। গুনাহের কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ করার কথা কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে এসেছে। এমনিভাবে কোরআনে কারীমে গোলামকে মুকাতাব বানানোর কথাও স্পষ্টভাবে এসেছে। এ ধরণের আয়াতসমূহের দ্বারা গোলাম-বাঁদীর কথা এতো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়; কোন চাক্ষুসমান ও শ্রবণকারীর পক্ষে তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। হাদীস শরীফে এসেছে-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المكاتب عبدمابقي عليه من كتابته درهم " .

- سنن أبي داوود : ٥٤٧/٢ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أويموت - سنن البيهقى الكبرى: ٦٠٢/١٠ باب المكاتب عبدمابقي عليه درهم. رقم الحديث:٢١٦٣٨ - مصنف إبن أبي شيبة: ٦٢١/١٠-٢٢ رقم الحديث:٢٠٩٤٥، ٢٠٩٥٥، ٢٠٩٥٤، ٢٠٩٥٤ ،

হযরত আমর ইবনে শোয়াইব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- 'মুকাতাব যতদিন তার উপর এক দেরহমও বাকি থাকবে সে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে।'

হযরত সা'দ বিন মুআয রা. বনী কুরাইযার ব্যাপারে ফয়সালা করলো-

"تقتل مقاتلهم وتسبى ذريتهم"

'তাদের যোদ্ধা যুবকদের হত্যা করা হবে এবং তাদের সন্তানদের গোলাম বানান হবে।'

তখন রাসূল ﷺ বলেন, "قضيت بحكم الله" হে সা'দ! তুমি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করেছ।

গাযওয়ায়ে আওতাসে গোলামের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে-

"وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"

'যেসব মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এরাও তোমাদের জন্য হারাম। কিন্তু তোমরা যাদের মালিক হয়েছে; এদের স্বামী থাকুক বা না থাকুক এরা তোমাদের জন্য হালাল।

[সূরায়ে নিসা:২৪]

কুরআন-হাদীসে গোলাম-বাঁদীরও বিধান আছে। এটা সূর্য থেকেও বেশী স্পষ্ট।

মূলকথা

মানুষের মধ্যে একটা স্বাধীন সত্তা অছে । স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সত্তাগতভাবে কেউ তার স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীন হতে চায় না। আর সেই স্বাধীনতা অর্জন হয় মালিকানা গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলে। যতক্ষণ সে মালিকানার গুণে গুণান্বিত থাকবে ততক্ষণ তার স্বাধীনতা আছে। আর যখন সে জানোয়ারের গুণে গুণান্বিত হবে তখন স্বাধীনতা একবারেই চলে যাবে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কুফুর এবং শিরক করার কারণে হায়াওয়ান-জানোয়ারের আওতায় চলে আসে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً"

'তারা পশুর মতো; বরং তার চেয়ে আরো অধিক নিকৃষ্ট।' [সূরায়ে ফুরকান:৪৪]

"إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ"

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী তারা, যারা কুফরী করে; ঈমান আনে না।'

[সূরায়ে আনফাল:৫৫]

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ ...(سورة محمد-١٢)

'আর যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে।

আজকাল এই হায়াওয়ানীও চতুষ্পদ জন্তুর সাংস্কৃতি সভ্যতা দুনিয়াতে চর্চা হচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে এ ব্যাপারে আগ থেকে যে খবর দিয়েছেন তার সত্যতা বর্তমান সভ্য দাবীদারদের সভা-সেমিনারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুনিয়ার জ্ঞাণী ব্যক্তিরা যখন চারিত্রিক অপরাধীদেরকে নরাধম ও পশুর থেকেও অধম মনে করে, তাহলে ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদরেকে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট বললে আপত্তি কোথায়?

আসল ব্যখ্যা হলো যেমনিভাবে হায়াওয়ানকে শিকার করা ও ধরার মাধ্যমে হায়াওয়ানের মালিক হয়ে যায় এমনিভাবে আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহকে অস্বীকারকারীদেরকে গ্রেফতার করার দ্বারাও তারা মালিকানাধীন হয়ে যায় । আর যেমনিভাবে পশু শিকার করাটাই মালিকানা সম্পত্তি হওয়ার মূলসূত্র এমনিভাবে কাফের দের উপর বিজয় হওয়া এবং কর্তৃত্ব অর্জন করাটাই গোলাম ও মালিক হওয়ার মূলসূত্র।

মানুষ এবং হায়াওয়ানের মাঝে যে পার্থক্য তা শুধু বিবেক এবং অনুভূতির কারণেই হয়ে থাকে। পশুরা অনুভূতিহীন হওয়ার কারণে জ্ঞাণীদের নিকট বেচা-কেনা শুধু জায়েযই নয় বরং এটাকে জরুরী ও আবশ্যক মনে করা হয়। যেমন-আদালত কোন কোন অপরাধীর ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। তার মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রি করে জনগণের হক পরিশোধ করে। এটাকি তাদের স্বাধীনতার কারণে নয়?

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষকে জন্মগতভাবেই স্বধীনতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা কোন ব্যক্তিসত্তার নেয্যপাওনা ও অধির নয়। ব্যক্তির এই স্বাধীনতা সবসময় বহাল থাকাটা ও জরুরী কোন বিষয় নয়। বরং মানুষ জন্মগতভাবে ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে বিধায় তাকে সেই স্বাধীনতা দান করা হয়। তারপর যখন সে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হড়ে এবং ইসলাম ছেড়ে দেয় তখন তার থেকে সেই অর্পিত স্বাধীনতা তুলে নেয়া হয়। ইসলাম না মানার শাস্তি হিসাবে সে গোলামে পরিণত হয়।

এখন যারা বলে, 'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাদের কথা যদি আমরা কিছু সময়ের জন্য মেনেই নেই নিই তাহলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো, এটা কার প্রদত্ত অধিকার? মানুষকে এই স্বাধীনতা কে দিয়েছেন? তাঁর প্রদত্ত অধিকারটা কি এমন- কেউ যদি কুফরী করে, শিরিক করে, মহান আল্লাহ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁদের অনুসারীদের উপর যুলুম অত্যাচার করে। মোটকথা এধরনের অপরাধ করার পরেও কি তার সেই স্বাধীনাতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না?

খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, আল্লাহ প্রদত্ত পূর্বের সকল আসমানী ধর্মগ্রন্থ একথার উপর ঐক্যমত যে, কুফর এবং শিরকের পর দুনিয়াতে কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার থাকে না। যখন বেঁচে থাকার অধিকারই থাকে না তাহলে আযাদী আর স্বাধীনতার কথা বলে লাভ কি? এমন ব্যক্তির স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই।

যারা রাষ্ট্র সরকারকে মানে না, রাষ্ট্রীয় আঈন মানে না, রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করে. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা বৃষ্টিকরে। এতোকিছু করার পরেও বি সে স্বাধীন থাকে? তার বিরুদ্ধে কোন মামলা হয় না? তাকে বন্দি করা হয় না? তার ধনোসম্পদ কি বাজোয়াপ্ত করা হয় না। তার ব্যাংক একউন্ট কি জবদ্ব করা হয় না? সবকিছুই করা হয়। যখন কেউ রাষ্ট্রদ্রোহী কাজ করে রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে সেই সব শাস্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার সে উপযুক্ত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনসহ তার মৃত্যুদন্ড যেমন নিশ্চিত হয়ে যায়। গুনাহ এবং পাপের কারণে মানুষের জন্মগত অধিকারও তেমন নিঃশেষ হয়ে যায়। তাহলে এবার বলুন, কুফুরীর চেয়ে বড় গুনাহ আর কী হতে পারে?

রাজনৈতিক গোলামীর প্রভাবে হারিয়ে গেছে গোলাম-বাঁদীর প্রথা

ইউরোপীয়ান ফিরিঙ্গীরা ইসলামের মধ্যে গোলামের প্রথাকে সমালোচনা করে কিন্তু তাওরাত এবং বাইবেলে যে গোলাম-বাঁদীর কথা উল্লেখ আছে সেটা নিয়ে তারাসমালোচনা করে না। বরং তারা রাজনৈতিকভাবে গনতন্ত্রের গোলমীকে নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে।

বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা পুরো গোষ্ঠী এবং দেশকে গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। এজন্য রাষ্ট্রিয় সরকারের গোলামী করার কারণে এখন আর মালিকানাধীন গোলামী করার প্রয়োজন হয় না।

আজো এ শতাব্দীতে গনতন্ত্র ও সাম্যবাদে শ্বেতাঙ্গকে কৃষ্ণাঙ্গের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। আমেরিকাতে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের জন্য ভিন্ন আঈন পাশ করা হয়েছে। এটাই কি তথা কথিত সভ্যজাতী (আমেরীকানদের) মানবতা?

সংশয় -৫২

কতিপয় দুর্ভাগা লোক আপত্তি করে আর সরল-সোজা সাধারণ মুমিনরা আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞাসা করে যে, বিবাহ ছাড়া দাসী-বাঁদীর সাথে সঙ্গম করা বৈধ হয় কিভাবে? সঙ্গম তো কেবল বিবাহের মাধ্যমে জায়েয ?

সমাধান -১

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা মুসলমান। আমাদের জন্য প্রমাণ হিসাবে কুরআনে কারীম, হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমলই যথেষ্ট।

কুরআনে কারীমে কয়েক জায়গায় এই মাসয়ালাটি উল্লেখ আছে। সফলকাম মুমিনদের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ"

'তারা নিজের স্ত্রী ও বাঁদীদের ব্যতীত [অন্যস্থানে] নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

[সূরায়ে মুমিনুন:৬,৭]

এই আয়াতে স্ত্রী ও বাঁদীদের আলোচনা পৃথক ভাবে করা হয়েছে যা একথার দলীল যে, বাঁদী স্ত্রী থেকে ভিন্ন। এজন্য বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সঙ্গম বৈধ। কেননা বাঁদীর সাথে যদি বিবাহ হয় তাহলেতো সে আর বাঁদী থাকবে না; বরং স্ত্রী বলেই গণ্য হবে।

তাছাড়া যুদ্ধের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁদীদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া সাহাবায়ে কেরাম বিবাহ ব্যতীত তাদেরকে নিজের ঘরে রাখা একথার দলীল যে, বাঁদীদের সাথে বিবাহ ব্যতীত মিলিত হওয়া বৈধ। যেমনভাবে বিবাহের পর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া বৈধ।

সমাধান -২

এখানেও মূল কথা এটাই যে, আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মাখলূকের অবস্থা সবচেয়ে বেশী ভাল জানেন। সুতরাং তিনি মাখলূকের জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন সেটা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়াই বন্দেগী।

আর আল্লাহর বিধানে খুঁত ধরা- প্রশ্ন করা ঈমান ও ইসলাম বিরোধী কাজ। অতএব বাঁদীকে আল্লাহর নেয়ামত হিসাবে করে কবুল করে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন!

ইরতিদাদ ও ইসলাম ত্যাগের আলোচনা

মুরতাদের পরিচয়

"قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية" কোন কথা কাজ-কর্ম অথবা দৃড় ইচ্ছায় কল্পের কারণে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই ইরতিদাদ।

[রহমাতুল উম্মাহ ফি ইখতিলাফিল আইম্মাহ পৃঃ ২৬৯]

ইরতিদাদ তিন প্রকার

এক. মুসলমান হওয়ার পর পরিপূর্ণভাবে ইসলাম ত্যাগ করা এবং অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করা। যেমন- ইহুদী বা খৃষ্ট মতবাদ গ্রহণ করা।

দুই. ইসলামের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিধান বা রুকন অস্বীকার করা। যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি অস্বীকার করা।

তিন. ইসলামের কোন ফরয, ওয়াজিব-বা সুন্নত বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

মুরতাদের শাস্তি

মুরতাদকে তার অপরাধ বুঝা এবং অপরাধ থেকে ফিরে আসার জন্য তিন দিনের সুযোগ দেওয়া হবে। তারপরেও যদি সে ফিরে আসতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা করার ব্যপারে ফুক্বাহায়ে কেরাম একমত। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. মুরতাদ মহিলোাকে হত্যার পরিবর্তে বন্দি করে রাখার কথা বলেছেন।

মুরদাদের শাস্তিও দলীল সমূহ

দলীল -১

"وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ"

হযরত মূসা আ. স্বীয় ক্বওমকে বললেন; তোমরা বাছুরকে মাবুদ বানিয়ে নিজেদের উপর জুলুম করেছো। তাই তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো।' [সূরায়ে বাকারা: ৫৪]

দলীল -২

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

"من بدل دينه فاقتلوه"

যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে (ইসলামকে) ছেড়ে দিয়েছে তাকে হত্যা করে দাও।'

[বুখারী শরীফ]

দলীল -৩

হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. এর হুকুম এবং সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র আমল ছিল যাকাত অস্বীকারকারী এবং মুসাইলামাতুল কায্যাব, আসওয়াদে আনসী, তুলাইহা ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করা।

দলীল- ৪

এই বিধান শুধু আমাদের শরীয়তেই নয় বরং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের মধ্যে ও এই বিধান ছিল, এবং আজও পরিবর্তীত বাইবেলের পুরনো অধ্যায় ৬-১৬ নং আয়াতে এমন বিধান রয়েছে। হযরত মূসা আ. বনী ইসরাঈলকে এই হেদায়েত দিয়েছেন যে, যদি তোমার ভাই, তোমার মায়ের ছেলে অথবা তোমার সহধর্মীণী বা তোমার প্রিয় বন্ধু যাকে তুমি তোমার প্রাণের মত ভালবাস তোমাকে চুপে চুপে ফুঁসলায় যে, চলো আমরা অন্য দেবতার পূঁজা করি, যে দেবতার ব্যাপারে তোমার বাপ দাদাও অবহিত নন। অর্থাৎ ঐ সকল লোকের দেবতা যারা তোমার আশে পাশে থাকে অথবা দূরে থাকে। তাহলে তুমি এ বিষয়ে তার সাথে রাজি হবে না এবং তার কথাও শুনবে না। তার প্রতি দয়া করবে না তাকে কোন ছাড় দিবে না এবং তার বিষয়টি গোপনও রাখবে না। বরং তুমি অবশ্যই তাকে হত্যা করবে এবং হত্যার সময় তোমার হাত তার উপর পড়বে এবং পুরো কওমের হাত পড়বে। তুমি তাকে প্রস্তরাঘাত করবে যেন সে মারা যায়। কেননা সে তোমাকে তোমার প্রতিপালক যিনি তোমাকে মিশরের রাজত্ব তথা গোলামী থেকে বের করে এনেছেন সেই খোদার বিদ্রোহী বানাতে চেয়েছে। [যদি তুমি তাকে হত্যা করো] তাহলে সকল ইসরাঈলী ভয় পাবে এবং পূণরায় তোমার এমন ক্ষতি করবে না।

ইসলাম ত্যাগের কারণসমূহ

মুরতাদ হওয়ার কারণ সাধারণত এ কয়েকটি হয়ে থাকে। এই মুরতাদ হয়তো অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং বাহ্যিক কোন ফায়দা বা লোভে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর যখনই সে ফায়দা বা মাক্বসাদ পূর্ণ হয়েছে তখন আবার কুফুরীর দিকে ফিরে গেছে।

কিছু লোক ধন-দৌলত অর্জনের জন্য স্বীয় ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে।

কোন যুবক সুন্দরী কাফের যুবতীর প্রেমে পড়ে অথবা কোন মহিলোকে পাওয়ার লোভে ইসলাম থেকে সরে দাঁড়ায়।

কখনো দুর্বল মুসলমান কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জুলুম-অত্যাচারের কবলে পড়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে।

কিছু দুর্ভাগা লোক সামান্য খ্যাতি ও দুনিয়াবী সম্মান ও পদমর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যেও ইসলাম থেকে সরে দাঁড়ায়। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

সংশয় -৫৩

শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মুরতাদের এই শাস্তির ব্যাপারে আপত্তি করে কেউ কেউ বলে যে, এটা তো মানুষের বাকস্বাধীনতা বিরোধী কাজ এর দ্বারা তার উপর একরকম বাড়াবাড়ি ও জোর-জবরদস্তি করা হচ্ছে। অথচ কুরআনে কারীমে আছে- "لا إكراه في الدين" 'ধর্ম গ্রহণে কোন বাড়াবাড়ি নেই। তাহলে আপনারা এতো বাড়াবাড়ি করছেন কেন?

সমাধান -১

বাস্তবেই কাউকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয় না। বরং ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, আজ পর্যন্ত যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন সবাই সানন্দে ইসলামের প্রতি আগ্রহী এবং অনুরক্ত হয়েই করেছেন।

সত্য ধর্ম কাউকে বাধ্য করেনা কভু
সানন্দে মুসলমান হয় লোকেরা তবু
দুনিয়ার আইনেও শাস্তি তার মওত
জেনে বুঝে করে যে অন্যের সাথে বাগাওত

এজন্য সাহাবায়ে কেরামের উজ্জল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন! তাঁরা সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন যখন ইসলাম গ্রহণ করা, আল্লাহকে এক মানা হাতের মুঠে কয়লা রাখার মতোই কঠিন কাজ ছিল। বরং বাস্তবেও আগুনের কয়লার উপর তাঁদেরকে চিৎকরে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও আরো অনেক বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও যখন কুফুরীর জন্য তাঁদের উপর জোর-জবরদস্তি করা হয়েছে তখন ইসলাম ছাড়েননি।

সমাধান -২

জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করলে তা গ্রহণ যোগ্যই হয় না। বরং নিজ ইচ্ছা ও খুশিতে ইসলাম কবুল করলে তা গ্রহণ যোগ্য হয়। আর অন্তরে ইসলাম কবুল না করে বাহ্যিকভাবে তা মুখে প্রকাশ করা; এটা মুনাফিকী এবং কপটতা।

সমাধান -৩

জোরপূর্বক কাউকে মুখে ইসলাম কবুল করার জন্য কালিমা উচ্চারণ করানো গেলেও অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করানো যায় না। তাই মুসলামনরা কখনো কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেনি, জোর করেনি। বরং প্রকাশ্যভাবে অনুমতি দিয়েছে যার ইচ্ছা ইসলাম গ্রহণ করবে, যার ইচ্ছা করবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাস

ইসলামের বিধান হলো, যদি কোন অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের বিধি-বিধান মেনে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে চায় তাহলে তার জন্য নিজ ধর্মের বিধান মানা, ইবাদত করা এবং নিজেদের রুসুম-রেওয়াজের জন্য উপাসনালয় বানানো এবং একটি সীমার মধ্যে থেকে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করার অনুমতি রয়েছে। এটা ইসলামের বিধান।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক রা. একবার একজন গভর্ণরকে শুধু এ কারণে অপসারণ করেছেন যে, সে একটি খৃষ্টান পরিবারকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জোর করেছিল। তবে মনে রাখবেন, ইসলাম গ্রহণের পর তা ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তার উদাহরণ হলো, যেমন এক ব্যক্তি কোন দেশের নাগরিক নয় সে দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু সে যদি নিজেই ঐ দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করে নাগরিকত্ব লাভ করে তাহলে ঐ দেশের আইন-কানুন মেনে চলা ও সম্মান করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। কোন আইন অমান্য করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। তার কোন কিছু বলার অধিকার থাকে না।

আর যদি সে ঐ দেশের আইনের বিরোধীতা করে কোন আইন বানিয়ে তা চালানোর প্রচেষ্টা করে তাহলে তাকে ফাঁসি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। পৃথিবীর কোন দর্শন এবং আইন-কানুন স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধীতা বিদ্রোহ করার সুযোগ দেয় না।

পার্থক্য একটাই যে, দুনিয়াতে এই বিধানকে শুধু সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। আর ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম শুধু প্রথাগত ধর্মের মর্যাদা পায় না; বরং তা রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও অথরিটির মর্যাদা লাভ করে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের পূর্ণ ভিত্তি ইসলামের উপরই হয়ে থাকে। এজন্য যেমনিভাবে অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন-কানুন, সংবিধান, ধর্ম এবং অথরিটির বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তেমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় আইন সংবিধান ও অথরিটির বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

যদি অস্বীকার করে কেউ রাষ্ট্রীয় আইনের

কেন অভিযোগ আসবে না তার উপর বিদ্রোহের।

শাস্তি তার মৃত্যুদণ্ড যে ইসলামকে ছেড়ে দেয়

মনে রেখ বন্ধু! এটাই বিধান ইসলামের।

সংশয় -৫৪

মুসলমানদের পক্ষ থেকেই একটি প্রশ্ন করা হয়, যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষকে খৃষ্টবাদের প্রচারের অনুমতি প্রদান না করি এবং যেসব খৃষ্টান, ইহুদী ও হিন্দুরা আছে আমরা তাদের হত্যা করে ফেলি। তাহলে তো কাফেররাও আমাদেরকে তাদের রাষ্ট্রে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিবে না।

সমাধান -১

এই প্রশ্নের মূল কারণ তো আমাদের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশ। আমাদের ভাগ্য খারাপ যে, জিহাদ ও খেলাফত না থাকার কারণে মুসলমানগণ অবনতি ও হীনতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। আর এটা দূরের কথা নয় যে, যখন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা মজবুত করার পর মুসলিম মুজাহিদগণ কাফেরদের রাষ্ট্রকে খেলাফতের অধিনস্ত করার প্রাণপন চেষ্টা চালিয়ে যাবেন; [আল্লাহ এ অবস্থা পূণরায় দান করুন। আমীন!] তখন এরকম হাঁটুভাঙ্গা প্রশ্ন আসবেই না এবং কোন কাফিরের এমন দুঃসাহস হবে না যে, আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে বাধা দিবে।

সমাধান -২

আসল কথা এটাই যা ইতোপূর্বে আমি বলেছি, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রীয় বিধান ও আইনের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এজন্য কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম থেকে সরে যাওয়ার নীতি রাষ্ট্রীয় সংবিধানের বিদ্রোহ করার শামিল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু কুফুরী রাষ্ট্রে ধর্মকে শুধু প্রথাগত অবস্থানে রাখা হয়েছে। সেখানে যেহেতু ধর্ম রাষ্ট্রিয় মর্যাদা পায় না তাই ধর্ম ত্যাগ করাটাও বিধান মতো অপরাধ নয়। সুতরাং তাদের সংবিধান অনুযায়ী তারা আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া থেকে বাধা ও দিতে পারে না। তবে যদি কাফেরদের রাজত্বে ধর্মকে রাষ্ট্রিয় সংবিধানের মর্যাদা দেয়া হয় এবং ধর্ম ত্যাগ করা রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহের অর্ন্তভুক্ত করা হয় তাহলে তখন অবস্থাও ভিন্ন রকম হবে । তখন তাদের আইন রক্ষার্থে আমাদের জন্য ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অনুমতিও থাকবে না। তাদের দেশে সফর করতে হলে তাদের আইন মেনে করতে হবে যেমন অন্যান্য আইনসমূহ মেনে চলা হয়।

একটি চিন্তার বিষয়

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর দয়ায় বর্তমানে একটি জামাত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান জিহাদ থেকে দূরে থেকে দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত। তবে তারা মুজাহিদ ভাইদের মুহাব্বত করে, তাদের জন্য দোয়া করে, সাধ্যানুযায়ী সহযোগীতাও করে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেই অনেক লোক এমনও আছে যারা জিহাদের ব্যাপারে শুধু গাফেলই নয়; বরং তারা জিহাদ না করার সাথে সাথে জিহাদকে ভাল মনে করে না। তারা মুজাহিদদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জিহাদের অর্থ বিকৃত করে ও অনর্থক ব্যাখ্যা করে। এমনকি জিহাদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে সাধারণ মুসলমান ও মুজাহিদদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের অন্তরের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। এজন্য আমি সে সকল ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, তারা যেন একটু চিন্তা করে যে, তারা ইসলামের কোন খেদমতটি আঞ্জাম দিচ্ছে ? তারা কোন কাতারে শামিল ? তারা হাশরের মাঠে কাদের সাথে দাঁড়াতে চায়? মুসলামান মুজাহিদদের সাথে নাকি মুসলমান মুজাহিদদের সহযোগীতাকারীদের সাথে? জিহাদ অস্বীকারকারী কাফেরদের সাথে নাকি জিহাদের অপব্যাখ্যাকারী মুনাফিকদের সাথে ? কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন-

"من تشبه بقوم فهو منهم"

'যে ব্যক্তি কোন কওমের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।'

"من كثر سواد قوم فهو منهم"-مسند أبي يعلي

'যে ব্যক্তি কোন কওমের জামাতকে বড় করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

হে আল্লাহ! হাশরের মাঠে তুমি আমাদেরকে মুজাহিদদের কাতারে শামিল করো। আমীন!

হাদীসের ব্যাখ্যা জিহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে

حدثنا مسلم بن إبراهيم .... " إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع " .

- سنن أبي داؤود : ٦٧٤/٢ باب كراهية الغناء والزمر.

- سنن البيهقى: ٤٢٠/١٠ رقم الحديث:٢١٠٠٧،٢١٠٠٦، ٢١٠٠٨،

'গান-বাদ্য অন্তরে নেফাকী সৃষ্টি করে যেমন পানি শস্য উৎপন্ন করে।'

এক. যেহেতু গান-বাদ্যের কারণে অন্তরে নেফাকী সৃষ্টি হয় তাই জিহাদ থেকে দূরে থাকাটা আমাদের স্বভাবগত বিষয় হয়ে গেছে। কারণ, জিহাদ ও নেফাকী কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই মুনাফেকরা যেহেতু রাসূল ﷺ এর সাথে মিলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেনি তাহলে এরা উম্মতের সাথে মিলে কীভাবে জিহাদ করবে?

এখন কারো অন্তরে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূল ﷺ এর যুগে মুনাফেকরা ছিল মূলত কাফের বিশ্বাসগতভাবে ছিল মুনাফেক তাহলে গান-বাদ্যের কারণে যে নেফাকী সৃষ্টি হয় সেটার প্রভাব শুধু আমলের ক্ষেত্রে আকীদার ক্ষেত্রে নয়! সুতরাং দুটি উদাহরণকে একরকম মনে করা ঠিক নয়। উভয়ের মাঝে আছে আকাশ যমীন পার্থক্য?

তার জবাব হলো, রাসূলের ﷺ যুগে মুনাফেকরা যেহেতু কাফের ছিল তাই তারা জিহাদ বিরোধী ও বিদ্রোহী ছিল। কিন্তু মুসলামানদের মাঝে আজকাল গান-বাদ্যের কারণে যে নেফাকী সৃষ্টি হয় তার প্রভাব শুধু আমলের মধ্যেই সীমিত।

যেহেতু সে মুসলমান তাই সে আকীদাগতভাবে তো জিহাদের পক্ষেই কিন্তু কার্যত সে জিহাদ থেকে দূরে সরে আছে।

মোটকথা, নবীযুগে মুনাফেকরা অন্তরে ও কাজে উভয় ভাবে জিহাদ বিরোধী ছিল। কারণ, তারা আকীদাগতভাবে মুনাফেক ছিল। আর বর্তমানে লোকেরা আকীদাগতভাবে জিহাদের পক্ষে তবে কাজকর্মে জিহাদের বিপরীত। এজন্য তারা কাজকর্মে মুনাফেকের সাদৃশ হলেও আকীদাগতভাবে মুনাফেক নয়।

দুই. গান-বাদ্য অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি নিজেই টিভি , ভিসি , ডিশ , সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিদিন ইজ্জত নষ্ট করা ও ইজ্জত-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দৃশ্য দেখে; বরং যে নিজেও ইজ্জতের ক্ষতি করে সে ব্যক্তি অন্যের ইজ্জত কীভাবে রক্ষা করবে? আজকে আমাদের মাঝে ইজ্জতের গুরুত্ব না থাকার এটাও অন্যতম কারণ। একারণেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যদিও জালেম ছিল কিন্তু এক মুসলিম বোনের ফরিয়াদ তাকে অস্থির করে দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে আত্মমর্যাদার গুরুত্ব নেই। ঘরে ঘরে মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে। তাই যখন কোন কাফের মুসলমান মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে, সে যখন আর্তনাদ করে; তখন কোন মুসলিম যুবকের মাঝে এর কোন প্রভাবই পড়ে না। সে নির্বিকার থাকে। বার্মা, কাশ্মীর, ফিলিস্তিনে আজ এমনই নির্যাতন চলছে। তবুও আমরা চেতনাহীন ও স্থবীর হয়ে পড়ে আছি। হায়! আল্লাহ যদি আমাদের বুঝ দান করতেরন।

উলামায়ে কেরামের জিহাদ এবং খতমে নবুয়ত

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"لاتقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأن اخاتم النبيين لا نبي بعدي"

- سنن الترمذي:٤٥/٢ رقم الحديث:٢٢١٧ - سنن أبيداؤود:٥٨٤/٢ رقم الحديث:٤٢٥٢ - مجمع الزوائد:٤٥٣/٧ رقم الحديث:١٢٤٨١

হযরত ছাওবান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- 'কিয়ামত কায়েম হবে না যেযাবৎ আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিক না হবে এবং মূর্তিপূজা না করবে। অচিরেই আমার উম্মতের তেত্রিশজন মিথ্যুক; নবুয়তের দাবী করবে। আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পর আর কোন নবী আসবে না।'

"والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،"

- سنن أبي داوٗد: ٣٤٢/١ باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:٢٥٣٢ - سنن البيهقى الكبرى : ٢٩٢/٩ باب في الغزو مع أئمة الجور. رقم الحديث:١٨٤٨٠

রাসূল সা. ইরশাদ করেন-'আল্লাহ্ আমাকে যখন নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন তখন থেকেই জিহাদ চালু হয়েছে আর এই উম্মতের সর্বশেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করা পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে। কোন যালিমের যুলুম এবং ন্যায়-ইনসাফকারীর ন্যায়-ইনসাফও জিহাদকে থামিয়ে রাখতে পারবে না।'

"أقرب الناس من درجة لنبوة أهل الجهاد وأهل العلم لأن أهل الجهاد يجاهدو على ماجاءت به الرسل ،وأماأهل العلم فدلوا النا س على ماجاءت به الأنبياء."

- كنز العمال: ١٠٦٤٧ أورده أيضاً : الذهبى فى السير (٥٢٤/١٨) . وعزاه العجلونى (٨٣/٢) لأبى نعيم بسند ضعيف عن ابن عبا س

মানুষের মধ্য হতে নবুয়তের মর্যাদার সবচেয়ে নিকবর্তী হলো মুজাহিদ ও আলেমগণ। কারণ, মুজাহিদগণ রাসূলের আনিত দ্বীনের জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেন। আর আলেমগণ স্বীয় ইলমের মাধ্যমে মানুষকে নবীগণের আনিত বিধানের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।'

এই তিন হাদীস থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবুয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হওয়ার পর রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতকে অভিভাবকহীন ছেড়ে দেননি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজত এবং

দ্বীনকে বুলন্দ করার দায়িত্ব আলেম ও মুজাহিদগণের উপর ন্যাস্ত করেছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত নবী ﷺ যে কাজ করতেন তা ইলম ও জিহাদে মাধ্যমে আদায় হবে। সত্যিই বড় ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ইলম এবং জিহাদ উভয় নেয়ামত দান করেছেন।

একটি কথা

"الجهاد ماض إلى يوم القيامة"

'কিয়ামত অবধি জিহাদ চলমান থাকবে।'

যদিও এটা সহীহ্ হাদীস হিসাবে প্রমাণিত নয়; কিন্তু এর বিষয়বস্তু একেবারে সঠিক। সুতরাং বুঝানোর জন্য এ বর্ণনাটিকে হুবহু এ শব্দমালা দ্বারা বলতে কোন অসুবিধা নেই। তারপরেও উলামায়ে কেরামের জিহাদ ও খতমে নবুয়াতের শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত সহীহ্ হাদীসগুলোই বর্ণনা করা উচিত।

একটি উপদেশ

যেমনি খতমে নবুয়তের বিষয়ে ছায়া নবী ও বুরুজে নবীতে ভাগ করা অবৈধ তেমনি জিহাদের ব্যপারে কোন ধরনের অপব্যাখ্যা করা এবং আকীদাগতভাবে কোন ধরনের পরিবর্তন আনাও অবৈধ।

'আমি কিছু মুজাহিদ ভাইদের বলতে শোনেছি যে, তারা এ হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে বর্ণনা করেন, "জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে' এর অর্থ হলো, এমন কোন সময় আসবে না যে পৃথিবীর কোন প্রান্তে জিহাদ হচ্ছে না। অর্থাৎ পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে জিহাদ সবসময় চলবেই চলবে। তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়; বরং হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হলো, "জিহাদের হুকুম কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে" তাই পৃথিবীতে যদি এমন সময় অতিবাহিত হয় যখন কোথাও জিহাদ হচ্ছে না এবং উম্মত জিহাদের আমল ছেড়ে দিচ্ছে তাহলে সেটা এ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

ফিতনা নির্মূলে জিহাদের অবদান

এ উম্মতের ফেরাউন এবং নববী যুগের সবচে বড় ফিতনা ছিলো আবু জাহেলো। এ ফিতনার কবররচিত হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে। নববী যুগের। পরবর্তী সময়ে

এ উম্মতের জন্য সবচে বড় চ্যালেঞ্জ ওফিতনা ছিল যাকাত অস্বীকার এবং ইরতিদাদের ফিতনা এটারও আবসান হয়েছে জিহাদের মাধ্যমে। মুসাইলামাতুল কায্যাবকে জিহাদের মাধ্যমে শেষ করে তার ফিতনা নির্মূল করা হয়েছে। আর উম্মতের শেষ পরীক্ষা হবে দাজ্জালের ফিতনা। সেটাও জিহাদের মাধ্যমে নির্মূল করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ!

সবচে বড় নেককাজ

ফিক্‌হ শাস্ত্রে একটি মাসআলা রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি তার সম্পদকে নেককাজ সমূহের মধ্যে সবচে ফযীলতপূর্ণ নেককাজের জন্য ওয়াকফ্ করে অথবা কেউ মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করে গেল যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্পদ যেন সর্বাধিক পূণ্যের কজে ব্যায় করা হয়। তাহলে তার সম্পদগুলো জিহাদের সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে।

খলীফা নির্বাচনে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

খলীফা নির্বাচন করা ফরয। মুসলমানদের খলীফা এবং শরয়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সকল মুসলমানদের উপর ফরয। কোন মুসলমান এ থেকে দায়মুক্ত হতে পারে না। কারণ,শরীয়াতের উপর আমল করা প্রত্যেকের উপর ফরয। আর অনেক শরয়ী হুকুম রয়েছে যা ইসলামিক রাষ্ট্র ও খলীফাতুল মুসলিমীন ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। যেমন: শরীয়তের দন্ডবিধি বাস্তবায়ন করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রতিরক্ষা , ইসলামী সৈন্য বাহিনীকে জিহাদের জন্য প্রেরণ করা, যাকাত ও সদকা উসূল করা, রাষ্ট্রদ্রোহী, চোর-ডাকাতকে নির্মূল করা, ঈদ এবং জুমার নামায কায়েম করা, মানুষের বিবাদ নিরসন করা, বান্দার হক্কের ব্যাপারে সাক্ষী গ্রহণ করত: তার বিচার কার্য সম্পাদন করা, পিতা-মাতাহীন বাচ্চাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের সঠিক বণ্টন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। [শরহে আকাইদ ১০৬]

হযরত আমের রা. থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

"من مات وليست عليه طاعة مات ميتة جاهلية فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله تبارك وتعالى وليست له حجة"

'কোন ব্যক্তি যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, সে কোন আমীরের বাইআত গ্রহণ করেনি, তাহলে সে যেন জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু পেল। আর যে ব্যক্তি বাইআতের পরে আনুগত্য করেনি; সে কেয়ামতের দিন কোন সাহায্য সহায়তা ও ভরসা ছাড়াই আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।' [মুসনাদে আহমদ:৫/৪৪৫]

সাহাবায়ে কেরাম রা. খলীফা নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাফনের চেয়েও তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকল ইমামগণ একমত যে, খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচন করা ওয়াজিব। [শরহে আকাইদ]

খলীফা হবে মাত্র একজন

মূলনীতি এটাই যে, সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের খলীফা হবে মাত্র একজন আর বাকী সব মুসলমান ঐ খলীফার আনুগত্য গ্রহণ করবে। কিন্তু এ ধারাবাহিকতায় যদি ব্যাঘাত ঘটে অথবা তা মুশকিল হয়ে পড়ে তাহলে এমন অপারগতার সময় ঐ রাষ্ট্রে ইসলামী সূরা ভিত্তিক জাতির কর্ণধারগণ একজন আমীর নির্বাচন করে নিবেন। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে মুসলমানদের থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেদের আমীর নির্বাচন করে নিবে এবং তার আনুগত্যে জীবন কাটিয়ে দিবে।

খলীফার শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া।
২. জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং পুরুষ হওয়া।
৩. স্বাধীন হওয়া।
৪. ইলমে দ্বীন থাকা বা দ্বীনী বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া।
৫. আল্লাহভীরু ও দ্বীনদার হওয়া।
৬. নববী রাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করা। [প্রচলিত তন্ত্র-মন্ত্র নয়]
৭. বীরপুরুষ হওয়া।
৮. সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান এবং সুচিন্তার অধিকারী হওয়া। রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য হওয়া।
৯. শারিরীকভাবে এমন কোন সমস্যা না থাকা যা খেলাফত পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটায়।

১০. কোন কোন ফুকাহায়ে কেরামের মতে কুরাইশী হওয়া। [অর্থাৎ কুরাইশ বংশীয় হওয়া।]

ইসলামী খেলাফত আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত

ইসলামী খেলাফত ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা যে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সে কথার বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখুন।

১. হযরত শামওয়ীল আ. এর নিকট যখন তার সম্প্রদায় একজন বাদশাহ চাইল তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন-

"إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا"

'নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালূতকে বাদশাহ রূপে প্রেরণ করেছেন।'

[সূরায়ে বাকারা:২৪৭]

২. হযরত দাউদ আ. এর উপর অনুগ্রহের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'য়ালাই ইরশাদ করেন-

"وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ"

'হযরত দাউদ আ. জালূতকে হত্যা করেছেন এবং আল্লাহ তাঁকে হিকমত ও রাজত্ব দান করেছেন।' [সূরায়ে বাকারা: ২৫১]

৩. হযরত ইবরাহীম আ. এর পরিবারের উপর পুরস্কারের আলোচনা এভাবে করেন-

"وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا"

'আর আমি তাদেরকে দান করেছি বিশাল রাজত্ব।'

৪. হযরত মুসা আ. স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে নেয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

"وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا"

'স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন মুসা আ. তাঁর স্বজাতিকে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদের মধ্যে নবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে বাদশাহ বনিয়েছেন।'

৫. হযরত ইউসুফ আ. এই নেয়ামতের আলোচনা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

'হে আমার রব! নিশ্চই তুমি আমাকে বাদশাহী দান করেছো।'

৬. আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে খেলাফত, হুকুমত এবং শাসন ক্ষমতা প্রদান করাকে তাঁর অনুগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন এভাবে-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

'তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর শাসক বানাবেন যেমন তাদের ইতিপূর্বেও শাসক বানিয়েছেন।'

৭. হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহ তা'য়ালার কাছে এ নেয়ামত পাওয়ার জন্য দোয়া করেছেন এভাবে-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

'হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাকে এমন এক রাজা দান করো যার উপযুক্ত আমি ছাড়া কেউ যেন না হয়।'

খেলাফত ব্যবস্থা

১. এটি এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতাসীন খলীফাকেও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়।
২. এখানে সর্বদা মাজলুমের অশ্রু মোছা হয়।
৩. এখানে রাজা-প্রজা সবার জন্য আইন-কানুন সমান ও অভিন্ন।
৪. এখানে গভর্ণরের অপরাধী ছেলেকেও জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করা হয়।
৫. এখানে একমাত্র আল্লাহর হুকুম এবং অনুশাসনই পরিচালনা করা হয়।
৬. এখানে মা-বোনদের সতীত্ব রক্ষা করা হয় এবং তার জন্য জীবনবাজী রাখা হয়।

[নিদায়ে মিম্বর ওয়া মিহরাব- খ:৫]

আমাদের কাজ পাঁচটি

ইমাম আব্দুর রহমান আওযায়ী রহ. বলেন-

পাঁচটি বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা. সম্মিলিত ও সমভাবে সকলে অংশীদার ছিলেন।

১.ঐক্য ও সংঘবদ্ধ হওয়া।
২.সুন্নতের অনুসরণ করা।
৩.মসজিদ নির্মাণ করা।
৪.কুরআন তিলাওয়াত করা।
৫.জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ করা।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া:১০/১১৭]

থেকে ৭ই অক্টোবর ২০০২ সাল পর্যন্ত জেলহাম, ভাওয়ালপুর এবং রাউল পিন্ডির বিভিন্ন জেলে বন্দি জীবন কাটান। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস একবছর যেতে না যেতেই ২০০৩ সালের ১৭ই অক্টোবর থেকে ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত এক মাস যাবৎ তাঁকে সারগোধার ডিষ্ট্রিক জেলে নজরবন্দি করে রাখা হয়। তারপর আবার ২০০৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯ শে এপ্রিল পর্যন্ত দুই মাস ২৬ দিন বন্দি জীবন শেষ করে সারগোধা ডিষ্ট্রিক জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

পদবী

একসময় তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের হরকাতুল আনসারের সাবেক আমীর ছিলেন এবং পাকিস্তান হরকতুল মুজাহিদীনের সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তাবলীগী সফর: আযাদ কাশ্মীর, সাউদ আফ্রিকা, মালাবী, জাম্বিয়া, কেনিয়া, সিঙ্গাপুর, সাউদি আরবসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের সফর করেন। বর্তমানে তিনি সারগোধা মারকাজে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব-দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন। এছাড়াও তিনি মারকাজে ইসলাহুন নিসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

রচনাবলী

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ পর এ'তেরাযাত কা ইলমী জায়েযা, যুবদাতুশ শামায়েল [শামায়েলে তিরমিযীর শরাহ],ক্বয়দীকে তারানে, সাত নাম্বার সহ বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

বায়আত ও খিলাফত: আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মোহাম্মদ আখতার সাহেব রহ. এর কাছে বায়আত গ্রহণ করত খেলাফত লাভ করেন। মানুষের ইসলাহ এবং সংশোধনের জন্য খানকায়ে আশরাফিয়া আখতারিয়া নামে ৮৭ দক্ষিণ সারগোধায় একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

রুচিশীল প্রকাশনার অনান্য প্রতিষ্ঠ্যান
৫২/এ, বাংলাবাজার, ঢাকা।